স্বামী ব্রহ্মানন্দ

উদ্বোধন কার্য্যালয়
বাগবাজার, কলিকাতা

সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত

তিন টাকা

নিবেদন

ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেবের মানসপুত্র পূজ্যপাদ ব্রহ্মানন্দ স্বামীর প্রকৃত জীবনী লিপিবদ্ধ করা সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার জীবনের সাধনা, দৈনন্দিন সংগ্রাম ও প্রচেষ্টার ইতিবৃত্ত জানিবার উপায় নাই। শ্রুত, দৃষ্ট ও কতিপয় লিপিবদ্ধ ঘটনা গ্রথিত করিয়া এই পুস্তক প্রকাশিত হইল। জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তিসমন্বিত আদর্শ অধ্যাত্মজীবন যে প্রেমধারায় প্রবাহিত হইয়াছিল তাহার কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র ইহাতে পাওয়া যাইতে পারে। পুণ্য কাহিনীর আলোচনা সর্ব্বতঃ কল্যাণপ্রদ। অনুরাগ ও ব্যাকুলতা সহায়ে মানব জীবনের যথার্থ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়—ইহা তিনি অপার প্রেমে, আকুল অনুনয়ে ও প্রদীপ্ত তেজপূর্ণস্বরে আজীবন ঘোষণা করিয়াছেন। পাঠকবর্গ এই অনুরাগ ও ব্যাকুলতা আশ্রয়ে ইহজীবনে শান্তি ও আনন্দ লাভ করুন ইহাই প্রার্থনা। ইতি—

ফাল্গুন, ১৩৪৮
শুক্লাদ্বিতীয়া

প্রকাশক

সূচীপত্র

স্বামী ব্রহ্মানন্দ

বেনারসে গৃহীত ফটো

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাল্য জীবন

যাঁহার আজন্ম বিশুদ্ধ পবিত্র জীবন, অনন্যসাধারণ কৃচ্ছ্র সাধনা, অলৌকিক ত্যাগ, মহান্ কর্ম্মশক্তি এবং বিরাট আধ্যাত্মিক জ্যোতিঃ বর্ত্তমান জগতের গৌরবস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে, যুগাবতার ভগবান্ শ্রীরামকৃষ্ণের মানসপুত্র, লীলাসহচর এবং প্রিয়তম অন্তরঙ্গ পার্ষদরূপে লোককল্যাণার্থ মহাশক্তির আহ্বানে যাঁহার আবির্ভাব হইয়াছিল, যাঁহার প্রদীপ্ত ব্রহ্মদীপ্তিতে দিগ্‌দিগন্ত উদ্ভাসিত হইত, যাঁহার স্নিগ্ধ গম্ভীর প্রশান্ত অপূর্ব্ব বালসুলভ মৃদুহাস্য ও করুণাদৃষ্টিতে শত শত নরনারীর হৃদয় শান্তির সুষমায় ভরিয়া উঠিত, যাঁহার শ্রীচরণতলে বসিয়া শত শত ত্যাগী সাধু ভক্ত ও ত্রিতাপক্লিষ্ট জীব সমভাবে আনন্দময় অমৃতলোকের সন্ধান পাইত, তাঁহার পুণ্য কাহিনী আলোচনা করিয়া মানুষ যে কৃতার্থ ও ধন্য হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। আদর্শ আচার্য্য, আদর্শ গুরু ও আদর্শ নেতারূপে যিনি শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের শীর্ষস্থানে অবস্থিত থাকিয়া "শ্রীশ্রীমহারাজ" আখ্যায় ভূষিত ছিলেন, যিনি শ্রীরামকৃষ্ণকর্ত্তৃক "রাখালরাজ" ও শ্রীবিবেকানন্দ প্রমুখ গুরুভ্রাতাগণের দ্বারা "রাজা" সংজ্ঞায় অভিহিত হইতেন, যিনি শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সভাপতিরূপে "ব্রহ্মানন্দ স্বামী" নামে জনসাধারণের নিকট পরিচিত ছিলেন,—তিনি যে ধর্ম্মকর্ম্মসমন্বিত অভূতপূর্ব্ব ত্যাগোজ্জ্বল মহিমামণ্ডিত জীবন যাপন

করিয়া গিয়াছেন সেই অসামান্য ভাব-রত্ন-মাণিক্য-খচিত সনাতন আদর্শই ভাবী জগতের অতুল বিভব ও অমূল্য সম্পদ।

জগতে দুই শ্রেণীর মানুষ আছে। এক গতানুগতিক অপর পারমার্থিক। যিনি পারমার্থিক তিনিই নরোত্তম ও লোকপূজ্য মহাপুরুষ। যিনি পারমার্থিক তিনি অন্তরলোকে বাস করেন—অন্তরলোকের মন লইয়া তাঁহার কারবার—সেইখানে তাঁহার সাধনা ও বিস্তৃত কর্ম্মক্ষেত্র। সাধারণ লোক বহির্জগতের বিষয়-ব্যাপারে ব্যস্ত,—স্বার্থ, দ্বেষ, আসক্তি, প্রতিষ্ঠা, যশঃ ও কর্ম্ম-চঞ্চলতায় তাহার সুখ-দুঃখের অনুভূতি। পরমার্থ তাহার নিকট একটা দুষ্প্রাপ্য আদর্শ। কিন্তু যিনি প্রকৃত পারমার্থিক তাঁহার মনুষ্যত্বের বিকাশ হয় ত্যাগের অমৃতময় পথে। সত্য, বিবেক, বৈরাগ্য, পবিত্রতা, নিঃস্বার্থতা, প্রেম ও অনাসক্তি তাঁহার আশ্রয় এবং তাঁহার চরম লক্ষ্য ব্রহ্মানুভূতি বা ব্রহ্মানন্দ। অন্তরে ভূমাকে স্বীকার করিলেও তাহা জীবনে উপলব্ধি করিবার জন্য গতানুগতিক লোকের সেরূপ ব্যাকুলতা বা দৃঢ় আকাঙ্ক্ষা নাই কিম্বা সাধনার প্রবল প্রবৃত্তি থাকে না। তাহারা জানে—ইহলোকে বাহ্যজগতের ভোগলিপ্সা, স্বার্থসুখ এবং আসক্তির উদ্দাম অনুরাগ। স্বীয় জীবনে ভূমাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে, কঠোর সাধনার উন্মত্ত আবেগে ও কর্ম্মের কুশলতায় তাঁহাকে একান্তভাবে পাওয়া এবং তাঁহাকে লাভ করিয়া প্রতি নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসে নিবিড় আনন্দরসে নিমগ্ন হওয়া পারমার্থিক মানুষের লক্ষ্য।

বাস্তবিক পারমার্থিক মানুষই ইহ জগতের শ্রেষ্ঠ ও প্রকৃত বীর। এই জগতে তিনিই যথার্থ বীর যিনি ক্ষণিক তুচ্ছ ব্যাপারের

অন্তরালে অধিকাংশ লোকচক্ষুর অগোচরে অবস্থিত শাশ্বত, দিব্য ও অনন্ত সত্যকে অবলম্বন করিয়া বিষয়-বস্তুর অন্তররাজ্যে বাস করেন ; সেই অন্তরলোকই তাঁহার সত্তা, কর্ম্মে বা বাক্যে যেরূপেই হউক, বাহিরে নিজ সত্তার বিকাশে তিনি সেই অন্তরলোককেই বহির্জগতে প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই অন্তরলোকে ব্রহ্মানন্দ ছিলেন নিঃসঙ্গতার একমূর্ত্তি—শান্ত, সমাহিত, শুদ্ধ ও আনন্দঘন। এই সত্যের আলোকে তাঁহাকে দেখিলে এবং তাঁহার পূতজীবন-কাহিনী আলোচনা করিলে তাঁহার স্বরূপের আভাস কতকটা উপলব্ধি করিতে পারা যাইবে।

জেলা ২৪ পরগণার অধীন বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত শিকরা একটি প্রাচীন গণ্ডগ্রাম। প্রবাদ আছে যে, আদিশূর আনীত মকরন্দ ঘোষের বংশধরেরা বর্দ্ধমান জেলায় আকনা গ্রামে বাস করিতেন। এই আকনার ঘোষ-বংশের সদানন্দ ঘোষ শিকরায় আসিয়া বসবাস করিতে লাগিলেন। বহু কুলীন কায়স্থের বসতি থাকায় লোকে গ্রামের এই অংশকে শিকরা কুলীনপাড়া বলিত। কালে লোকমুখে ইহার স্থায়ী নামকরণ হয় শিকরা কুলীনগ্রাম। সদানন্দের অধস্তন তৃতীয় পুরুষ মনোহর ঘোষের পুত্র ছিলেন কালীপ্রসাদ ঘোষ। তিনি প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিয়া সুবৃহৎ ঠাকুর দালান ও চক-মিলান অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। কালীপ্রসাদের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রেরা আর একান্নভুক্ত থাকিলেন না। কালীপ্রসাদের পাঁচ পুত্রের অংশানুসারে বাড়ীটিও বিভক্ত হইল। জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠানুসারে প্রতিবেশীরা বাড়ীর নির্দ্দেশ করিত। কালীপ্রসাদের মধ্যম পুত্র হরিশ্চন্দ্র যে অংশে বাস করিতেন

তাহা মেজবাড়ী বলিয়া পরিচিত ছিল। হরিশ্চন্দ্রের তিন পুত্র—জ্যেষ্ঠ প্যারীমোহন, মধ্যম আনন্দমোহন এবং কনিষ্ঠ শ্রীমোহন। বসিরহাটের সন্নিকটে ট্যাটরা গ্রামের ভবানীচরণ গায়েনের কন্যা কৈলাসকামিনীর সহিত আনন্দমোহনের প্রথম পরিণয় হইয়াছিল। কৈলাসকামিনী সামান্য লেখাপড়া জানিতেন। শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক গ্রন্থাদি তিনি ভক্তির সহিত একাগ্রমনে পাঠ করিতেন। পুত্রলাভের পূর্ব্বে তিনি তপস্বিনীর মত কৃষ্ণারাধনায় সর্ব্বদা নিরত থাকিতেন। নাম, জপ ও পূজাপাঠে তিনি অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন।

বাংলা সন ১২৬৯ সালে (ইংরাজী ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ, ২১শে জানুয়ারী) ৮ই মাঘ মঙ্গলবার শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে কৈলাসকামিনী একটী পুত্র সন্তান প্রসব করেন। গৃহে আনন্দোৎসবের ধুম পড়িয়া গেল। মাতা একান্ত কৃষ্ণানুরাগিণী ছিলেন বলিয়াই বোধ হয় পুত্রের নাম রাখিলেন রাখালচন্দ্র। এই রাখালচন্দ্রই উত্তরকালে ব্রহ্মানন্দ স্বামী নামে জগতে পরিচিত হন।

রাখালচন্দ্রের পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রমকালে তাঁহার স্নেহময়ী জননী ইহলোক ত্যাগ করেন। এককালীন চারিটি সন্তান প্রসব করিয়া কৈলাসকামিনী মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া পড়েন। ইহার অত্যল্প পরেই নবজাত চারিটি শিশুর মৃত্যু হয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই প্রসূতিরও প্রাণবিয়োগ ঘটে।

আনন্দমোহন আবার দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন। দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী হেমাঙ্গিনীর উপর রাখালের প্রতিপালনের ভার ন্যস্ত হইল। আনন্দমোহন নিশ্চিন্ত মনে বিষয়কার্য্যে মনোযোগী হইলেন।

বাল্য জীবন

বাল্যকালে রাখালের মূর্ত্তি অতীব কমনীয় ছিল। তাঁহার সেই সৌম্য সুন্দর কোমল মাধুর্য্যপূর্ণ আকৃতি দেখিলে লোকে আকৃষ্ট হইত। বয়স হিসাবে তাঁহার শরীরে বেশ সামর্থ্য ছিল। শারীরিক বলে সঙ্গী বালকেরা কেহই তাঁহাকে পরাস্ত করিতে পারিত না। সমবয়স্ক যে কোন বালককে রাখাল এমনি কৌশল ও তৎপরতার সহিত বেষ্টন করিয়া ঘুরাইয়া মাথার উপর তুলিয়া ধরিতেন যে লোকে দেখিয়া অবাক হইত। টুকপাটি, নাদন প্রভৃতি গ্রাম্য খেলায় তাঁহার বিশেষ প্রীতি ছিল। সাধারণ বালকদের মত রাখাল কেবল খেলাধূলায় মত্ত থাকিতেন না। শক্তি-উপাসক ঘোষেদের সুবৃহৎ অট্টালিকার প্রবেশ পথে পুষ্করিণীর তীরে একটি মৃন্ময়ী কালীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই কালী মন্দিরের নিকটেই বোধনতলা। বাল্যকালে এই স্থান তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। দিবাভাগে অধিকাংশ সময় রাখাল এইখানেই অতিবাহিত করিতেন। কখনও কখনও বালক সঙ্গীদিগকে লইয়া কালীপূজা-খেলায় মত্ত থাকিতেন। মৃত্তিকা লইয়া বালক রাখাল স্বহস্তে শ্যামার সুন্দর মূর্ত্তি গড়িতেন। আবার সেই মূর্ত্তির সম্মুখে পুরোহিতবেশে তন্ময়ভাবে তিনি পূজায় বসিতেন। কোন কোন ক্রীড়াসঙ্গী তাঁহার উপদেশ মত কলার বা কচুর ডাঁটা লইয়া বলি দিত। কখনও কখনও সঙ্গীদের মধ্যে কাহাকেও পুরোহিতের আসনে বসাইয়া পূজা করিতে বলিতেন এবং তিনি নিজে কামার সাজিয়া "জয় মা" বলিয়া প্রতিমার সম্মুখে বলি দিতেন। দেবদেবীর প্রতি বালক বয়সেই রাখালের অসাধারণ ভক্তি ও অনুরাগ ছিল। বাড়ীতে দুর্গাপূজার সময় মণ্ডপমধ্যে পুরোহিতের ঠিক পশ্চাতেই

বালক রাখাল একটি আসন সংগ্রহ করিয়া স্থিরভাবে বসিতেন এবং পূজা দেখিতে দেখিতে একেবারে তন্ময় হইয়া পড়িতেন। তৎকালে তাঁহাকে দেখিলে স্বতঃই মনে হইত যেন একটি ধ্যানমগ্ন বালযোগী বসিয়া রহিয়াছেন। আবার সন্ধ্যায় দেবীর যখন আরতি হইত বালক রাখাল তখন ভক্তিরসাপ্লুতচিত্তে অপলক দৃষ্টিতে তন্ময় হইয়া তাহা দর্শন করিতেন।

পুত্রের পাঠের সুবিধার জন্য আনন্দমোহন তাঁহার বসতবাটীর সন্নিকটে একটি অবৈতনিক পাঠশালা স্থাপন করেন। ইহাতে গ্রামের অনেক দরিদ্র অনাথ বালক বিনা বেতনে সেই পাঠশালায় শিক্ষা-লাভের সুযোগ পাইল। প্রসন্ন সরকার নামক জনৈক শিক্ষকের উপর এই পাঠশালার পরিচালনার ভার অর্পিত হয়। রাখাল এই পাঠশালার শিক্ষকদের বিশেষ প্রিয় ছাত্র ছিলেন। প্রিয়দর্শন বালকটির কোমল অন্তঃকরণে আঘাত করিতে কোন শিক্ষকের ইচ্ছা হইত না। সে যুগে ছাত্রশাসনের জন্য পাঠশালার শিক্ষকগণ প্রধানতঃ বেত্রদণ্ড ব্যবহার করিতেন। শিক্ষকেরা লক্ষ্য করিলেন যে, কোন সহপাঠী বালককে আঘাত করিলেই রাখালের চক্ষু অশ্রুসিক্ত এবং মুখমণ্ডল ব্যথায় ম্লান হইত। এই প্রিয় ছাত্রের ঈদৃশ ভাব দেখিয়া অগত্যা তাঁহারা বেত্রদণ্ড ত্যাগ করিলেন। বাল্যকালে পড়াশুনায় রাখালের বেশ অনুরাগ দেখা যাইত।

ফল-ফুলের বাগানের প্রতি আনন্দমোহনের বিশেষ সখ ও যত্ন ছিল। পিতার দেখাদেখি রাখালও গাছপালার প্রতি দৃষ্টি রাখিতে শিখিলেন। কোন্ বৃক্ষ বা লতাকে কি

ভাবে যত্ন করিতে হইবে তাহা বাল্যকালেই রাখাল শিখিয়াছিলেন। গ্রামের বড় বড় পুকুরে মাছ ধরিবার জন্য তাঁহার প্রবল আগ্রহ ছিল। পুকুরের পারে ছিপ্ হাতে করিয়া তিনি একাগ্র চিত্তে বসিয়া থাকিতেন। এই দুইটি সখ তাঁহার প্রায় আজীবন ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

বাল্যকাল হইতেই রাখালের সঙ্গীতের প্রতি একটা প্রবল অনুরাগ ছিল। বৈষ্ণব ভিখারী কৃষ্ণলীলা গান করিলে তিনি আবিষ্টভাবে তাহা শুনিতেন। কেহ শ্যামাসঙ্গীত বা রামপ্রসাদের "মালসী" গাহিলে তিনি উৎকর্ণ হইয়া তন্ময়ভাবে তাহা শুনিয়া শিখিয়া লইতে চেষ্টা করিতেন। শ্যামাসঙ্গীতের প্রতি বাল্যকালেই তাঁহার বিশেষ আকর্ষণ ছিল। গ্রামের দক্ষিণে দিগ্ দিগন্তবিস্তৃত উন্মুক্ত প্রান্তরে পীরের একটি দরগা ছিল। এইস্থান চারিপাশের জমি হইতে কতকটা উঁচু এবং ইহার চারিদিকে তাল, কাঁটাল খেজুর, বট ও আম্র বৃক্ষের সারি ছিল। বাল্যসঙ্গীদের লইয়া রাখাল প্রায়ই এইস্থানে আসিতেন এবং সকলে মিলিতকণ্ঠে শ্যামাসঙ্গীত গাহিতেন। গাহিতে গাহিতে তিনি ভাবে তন্ময় হইয়া যাইতেন, এমন কি কখন কখন তাঁহার বাহ্য সংজ্ঞাও থাকিত না। তাঁহাকে তৎকালে দেখিলে মনে হইত তাঁহার মন যেন কোন অতীন্দ্রিয় ভাবসৌন্দর্যে ও অপার্থিব বিমল আনন্দে মগ্ন হইয়া গিয়াছে। বাল্যকালেও বালক রাখাল সাধারণ বালকের মত ছিলেন না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কৈশোর

দেখিতে দেখিতে রাখাল দ্বাদশবর্ষে উপনীত হইলেন। পাঠশালার বিদ্যা সমাপ্ত হইলে আনন্দমোহন বুঝিলেন যে পুত্রকে উপযুক্তরূপে বিদ্যাশিক্ষা দিতে হইলে গ্রামে রাখিলে আর চলিবে না। তখনকার যুগে কলিকাতাই ইংরাজী শিক্ষার কেন্দ্র ছিল। কলিকাতা শিকরা কুলীনগ্রামের নিকটবর্ত্তী, সুতরাং যাতায়াতেরও বিশেষ কোন অসুবিধা নাই। তাঁহার আত্মীয়স্বজন অনেকেই জীবিকার জন্য কলিকাতায় বাস করিতেন। কার্য্যব্যপদেশে বসিরহাটের এবং উক্ত গ্রামের অনেকেই কলিকাতায় প্রায়ই যাতায়াত করিতেন। ইহা ব্যতীত আনন্দমোহনের দ্বিতীয় পক্ষের শ্বশুর-গৃহ কলিকাতার বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীটে অবস্থিত ছিল। এক্ষেত্রে কলিকাতায় পুত্রকে রাখিলে সর্ব্বদা তাহার সংবাদ পাইতে কোন অসুবিধা বা উদ্বেগের সম্ভাবনা নাই। এই সকল সুযোগ-সুবিধা চিন্তা করিয়া আনন্দমোহন শুভদিনে পুত্রসহ কলিকাতায় যাত্রা করিলেন।

আনন্দমোহনের দ্বিতীয়া পত্নী হেমাঙ্গিনীর একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, রাখাল তাঁহার পিতৃগৃহে থাকিয়া অধ্যয়ন করে। কারণ তাঁহার পিতা শ্যামলাল সেন মহাশয় একজন সম্পন্ন গৃহস্থ এবং দেব-দ্বিজে ভক্তিমান ছিলেন। তাঁহার নিকটে থাকিলে বালক রাখালের কোন অসুবিধা হইবে না, বরং সে স্নেহ-যত্নের আবেষ্টনেই প্রতিপালিত

হইবে এবং তাহার স্বাস্থ্য ও শিক্ষা বিষয়ে তাঁহারা নিরুদ্বেগে ও নিশ্চিন্ত মনে থাকিতে পারিবেন। পাঁচ বৎসর বয়ঃক্রম হইতে বার বৎসর পর্য্যন্ত যে বালককে তিনি স্বীয় পুত্রের ন্যায় স্বহস্তে লালন-পালন করিয়াছেন, বিবাহের পরে স্বামিগৃহে আসিয়াই তিনি যে মাতৃহীন বালকের জননীস্বরূপা হইয়াছিলেন, প্রসূতি না হইয়াও যে বালককে আশ্রয় করিয়া তাঁহার মাতৃহৃদয়ের সকল মাধুর্য্য বিকাশ পাইয়াছিল সেই স্নেহের নিধিকে অপর কোথাও রাখিতে তাঁহার মন চাহিল না। এই বিষয়ে আনন্দমোহনেরও ভিন্ন মত ছিল না। সুতরাং শ্বশুরগৃহের সন্নিকট ট্রেনিং একাডেমিতে পুত্রকে ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া আনন্দমোহন স্বগ্রামে প্রত্যাগমন করিলেন।

কলিকাতার বিদ্যালয়ে সমবয়স্ক সঙ্গীর অভাব নাই কিন্তু রাখাল কেমন যেন তাহাদের সহিত মন খুলিয়া মিশিতে পারিতেন না। ট্রেনিং একাডেমির সংলগ্ন ব্যায়ামাগার দেখিয়া রাখালের ব্যায়াম করিবার বিশেষ ইচ্ছা হইল। এইস্থানে পল্লীর যুবকেরা ও স্কুলের ছাত্রেরা সমবেত হইয়া উপযুক্ত শিক্ষকের অধীনে ব্যায়াম অভ্যাস করিত। কাঁসারীপাড়া ও শিমলা প্রায় এক পল্লী বলিলেই হয়; এই সব পল্লীর ছেলেদের নেতা ছিলেন কিশোর বালক নরেন্দ্রনাথ। নরেন্দ্রনাথ ও রাখালচন্দ্র প্রায় সমবয়স্ক ছিলেন; বয়ঃক্রম হিসাবে উভয়ের মধ্যে মাত্র নয় দিনের ব্যবধান। বিদ্যালয়ে রাখাল নরেন্দ্রনাথ অপেক্ষা তিন চারি শ্রেণী নীচে পড়িতেন। নরেন্দ্রনাথ ছিলেন দীপ্ত-পাবক স্ফুলিঙ্গ। তাঁহার উজ্জ্বল বিশাল নেত্র, সুগঠিত দেহ, পৌরুষব্যঞ্জক ভাব, তীক্ষ্ণ মেধাশক্তি, ক্ষুরধার বুদ্ধি, সুমধুর

কণ্ঠস্বর ও অসামান্য লাবণ্য সকলকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিত। সহপাঠী বা সমবয়স্ক বালকেরা তাঁহার নেতৃত্বে ও ইচ্ছাধীনে পরিচালিত হইত। স্বভাবকোমল, সরল বালক রাখালচন্দ্র নরেন্দ্রনাথের সঙ্গ ও বন্ধুত্ব লাভের জন্য লালায়িত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের উভয়ের পরিচয় এই কিশোর বয়সেই ঘটে। পল্লীর সমবয়স্ক বালক বলিয়াই হউক অথবা কোন অজ্ঞাত আত্মীয়তাসূত্রেই হউক, নরেন্দ্রনাথের সহিত রাখালচন্দ্রের এই সময়েই মিলন হয়। উত্তরকালে শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীচরণতলে বসিয়া উভয়ে আজীবন বিমল বন্ধুত্বের অবিচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ হন। বাস্তবিকই এই দুই জনের মনেই বালক বয়স হইতে আধ্যাত্মিকতার প্রবল বহ্নি দীপ্যমান ছিল। দুই জনই সঙ্গীতানুরাগী ও ধ্যানপরায়ণ; শ্রীশ্রীঠাকুরের কথায় বলিতে গেলে দুই জনই ঈশ্বর-কোটী নিত্যসিদ্ধ ও বিশেষ অন্তরঙ্গ। একজন সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঋষি সাক্ষাৎ নরনারায়ণ—অপর ব্রজমণ্ডলের ক্রীড়া-সঙ্গী কৃষ্ণ-সখা।

ইংরাজী শিক্ষা ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সঙ্গে সঙ্গে বাংলার ধর্ম্ম, সমাজ, আচার ব্যবহার এবং বেশভূষার বিপুল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। ইংরাজী শিক্ষার প্রথম মোহ-মাদকতা ও উচ্ছৃঙ্খলতার ঘোর কাটিয়া গেলে ধ্বংস ও গঠনমূলক সংস্কারকের দল বাংলার ধর্ম্ম ও সমাজের আমূল পরিবর্ত্তন করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। রাজা রামমোহন "বেদান্ত-প্রতিপাদিত সত্য ধর্ম্ম" প্রচারের উদ্দেশ্যে যে ব্রহ্মসভা স্থাপন করিয়াছিলেন মহর্ষি আচার্য্য দেবেন্দ্রনাথের উদ্যম ও সাধনায় তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজে পরিণত হইল। বাংলার তৎকালীন শ্রেষ্ঠ মনীষী ও প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিরা ইহার পতাকাতলে দাঁড়াইয়া পাশ্চাত্য সংস্কৃতির আলোকে নবভাবে নবযুগ প্রবর্ত্তন করিতে প্রয়াসী

হইলেন। এই আন্দোলনের প্রচণ্ড তরঙ্গ তুলিলেন আচার্য্য শ্রীকেশব চন্দ্র। তাঁহারই নেতৃত্বে ভারতে, বিশেষতঃ বাংলায় সাকার উপাসনা ও প্রতিমা পূজার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন ব্রাহ্মসমাজ। রামপ্রসাদের "মালসী", কমলাকান্তের শ্যামাসঙ্গীত, বৈষ্ণব পদাবলী ও কীর্ত্তন গানের পরিবর্ত্তে "ব্রহ্মসঙ্গীত" রচিত, গীত ও প্রচারিত হইল। নিরাকার উপাসনার জন্য উপনিষদ্ হইতে বাছিয়া বাছিয়া মন্ত্র আবৃত্তি হইতে লাগিল এবং খৃষ্টীয় উপাসনার ধারায় সমবেতভাবে প্রার্থনা ও উপাসনা ব্রাহ্মধর্ম্মের সাধনায় বিশেষ স্থান অধিকার করিল। নীতি, পবিত্রতা, সত্যনিষ্ঠা ও পরোপকারের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত তরুণ যুবকগণ কেশবের অপূর্ব্ব বাগ্মিতায় ও ধর্ম্মজীবনে মুগ্ধ হইয়া দলে দলে ব্রাহ্মসমাজভুক্ত হইতে লাগিল।

কিশোর বয়সেই নরেন্দ্রনাথ ও রাখাল এই তরঙ্গে আন্দোলিত হইলেন। তাঁহারা উভয়ে মিলিয়া ব্রাহ্মসমাজের অধিবেশনে নিয়মিত-ভাবে যোগদান করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রনাথের উন্নত সঙ্গ ও উপদেশে এবং তাঁহার অপূর্ব্ব প্রভাবে রাখালও তদ্ভাবে অনুরঞ্জিত হইলেন।

ছাত্রজীবনে রাখাল ভগবদ্ধ্যানে ও ধর্ম্মচিন্তায় অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। বিদ্যালয়ে বিদ্যার্জ্জনে তাঁহার আর তাদৃশ আগ্রহ বা যত্ন ছিল না। জন্মগত সংস্কারবশেই হউক বা সরল পবিত্র বিশুদ্ধ চরিত্র বশতঃই হউক কিশোর রাখাল ব্রহ্মবিদ্যালাভের জন্যই ব্যাকুল হইলেন। তাঁহার মনে স্বাভাবিকভাবেই উদয় হইত যে একমাত্র ব্রহ্মবিদ্যাই বিদ্যা। যে বিদ্যায় মানবজীবনে ব্রহ্মবস্তু লাভ হয়, যে বিদ্যায় হৃদয় নির্ম্মল হইয়া শরীর ও মন সতেজ ও

পবিত্র হয়, যে বিদ্যায় মানুষ অনন্ত জ্ঞান ও অনন্ত প্রেমের অধিকারী হইতে পারে—সেই বিদ্যাই শ্রেষ্ঠ। সেই বিদ্যার্জ্জনেই রাখালের এখন ব্যাকুলতা। বাস্তবিকই তাঁহার তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও মেধাশক্তি, তন্ময়তা ও একাগ্রচিত্ততা সমবয়স্ক কোন বালকের অপেক্ষা বিশেষ কম ছিল না। গতানুগতিকভাবে সাধারণ মানুষের মত তাঁহার মনের গঠন না থাকাতেই তিনি অপরা বিদ্যার আলোচনায় মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই। ঈশ্বর লাভ করাই তাঁহার জীবনের চরম লক্ষ্য ছিল এবং কিশোর বয়স হইতেই তাঁহার জীবনের গতি সেই দিকেই ধাবিত হইয়াছিল। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে নরেন্দ্রনাথ রায়পুরে গমন করেন। পরে কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন। এই নিঃসঙ্গ অবস্থায় রাখাল নিয়মিত ব্যায়াম অভ্যাস, বিদ্যালয়ের পাঠ ও ঈশ্বর চিন্তা করিতেন। তাঁহার মনের সহজ গতি ছিল ঈশ্বরাভিমুখী। ব্রাহ্মসমাজে যে সব ভগবদ্‌প্রসঙ্গ শুনিতেন তাহা তিনি নির্জ্জনে একাকী চিন্তা করিতেন। রাখাল ব্রাহ্মসমাজে শুনিয়াছেন যে ব্রহ্ম—অখণ্ড, অনন্ত, নিরাকার ও জ্যোতিঃস্বরূপ। তিনিই একমাত্র জীবজগতের প্রাণ—তিনি সকলের ত্রাতা ও পিতা। "ওঁ পিতা নোঽসি"—ইহাই বেদমন্ত্র; তিনি আমাদের পিতা—আমরা তাঁহার পুত্র। তাই নির্জ্জনে বসিয়া তাঁহার মনে হইত যে পরমেশ্বরই সকলের প্রকৃত পিতা, সকল জীবের পালয়িতা ও পরিত্রাতা—পরম কারুণিক ও পরম প্রেমিক! সেই পিতার দর্শন কি মানুষ পাইতে পারে না? "ওঁ পিতা নোঽসি" তিনি আমাদের পিতা। তাঁহাকে কি সত্য সত্যই আমাদের এই পার্থিব পিতার ন্যায় প্রকৃতভাবে দেখা যায়? তাঁহার বাণী কর্ণে

শুনা যায়? তাঁহার অপার স্নেহবারিধির পীযূষধারায় স্নাত হওয়া যায়? তাঁহার করুণার অমৃতবারি পান করা যায়? রাখাল নির্জ্জনে বসিয়া একান্ত ব্যাকুলচিত্তে ভাবিতেন, হায়! এই রহস্য কে তাঁহাকে বলিয়া দিবে? তিনি বাহিরে কোন চাঞ্চল্য প্রকাশ করিতেন না,—নিভৃতে এই চিন্তায় বিভোর থাকিতেন। ছাত্র জীবনেও তাঁহার গম্ভীর প্রকৃতি মহাসাগরের মতই শান্ত ছিল। তাঁহার অন্তরে যে উদ্বেল তরঙ্গ প্রবাহিত হইত বাহিরে তাহার প্রকাশ ছিল না। পারমার্থিক রাখাল পরমার্থ লাভের আশায় ব্যাকুল ছিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরিণয়

কিশোর বয়স উত্তীর্ণ হইয়া রাখাল এখন সবেমাত্র যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন। যে সময়ে মানুষের মনে ভোগ-লালসার প্রবল তৃষ্ণা জাগিয়া উঠে, যে সময়ে ইন্দ্রিয়গ্রাম দুর্ব্বার ও অসংযত হইতে প্রয়াস পায়, যে সময়ে চক্ষুতে বহু ভাব ও বর্ণের সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে, সেই সময়ে এই অদ্ভুত যুবকের চিত্ত নিবৃত্তির পথে ধাবিত হয়,—সংযম ও ব্রহ্মচর্য্য সহায়ে উদ্দাম ইন্দ্রিয়বৃত্তিসমূহকে সংযত রাখিতে প্রযত্ন করে; চক্ষু জগতের অসীম সৌন্দর্য্য দেখিয়া ঈশ্বরের সৃষ্টিচাতুর্য্য স্মরণ করিয়া বিমুগ্ধ হয়, এবং তাঁহার মন শুধু চিরসুন্দর, চিরমঙ্গলময় এবং নিত্যবস্তু ভগবল্লাভের আকাঙ্ক্ষায় নিমগ্ন থাকে। এই অদ্ভুত বালক যৌবনে পদার্পণ করিয়াও ক্ষুদ্র বালকের মত সরল লাবণ্যপূর্ণ। বালকের মতই তাঁহার নির্ম্মল শুভ্র হাসি, বালকের মতই তাঁহার কোমল অন্তর।

১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে রায়পুর হইতে নরেন্দ্রনাথ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলে দুই বন্ধু পুনরায় মিলিত হইলেন। নরেন্দ্রনাথের প্রতি সহজেই তাঁহার আকর্ষণ ছিল—কারণ তাঁহার অপূর্ব্ব পবিত্রতা, জ্বলন্ত উৎসাহ, তেজোগর্ভ বাণী, প্রেমপূর্ণ হৃদয় এবং ঈশ্বরানুরাগ রাখালকে মুগ্ধ করিয়া ফেলিত। নরেন্দ্রনাথ তখন তাঁহার বয়স্যবর্গের মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিসাধনের জন্য তাঁহাদিগকে লইয়া

ব্রাহ্ম সমাজের আদর্শে সহরের নানা স্থানে প্রার্থনা ও আলোচনা সমিতি গঠন করিতে লাগিলেন। ১৮৮১ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভেই একদিন নরেন্দ্রনাথ নিরাকার অদ্বিতীয় ঈশ্বরে বিশ্বাসবান্ হইয়া কেবলমাত্র তাঁহারই উপাসনা ও ধ্যানধারণা করিবেন এই মর্ম্মে সহসা ব্রাহ্ম সমাজের অঙ্গীকার পত্রে স্বাক্ষর করেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গে লিখিত আছে—"শ্রীযুত রাখাল এই কালের পূর্ব্ব হইতেই নরেন্দ্রনাথের সহিত পরিচিত ছিলেন এবং অনেক সময় তাঁহার সহিত অতিবাহিত করিতেন। শিশুর ন্যায় কোমলপ্রকৃতি-সম্পন্ন নির্ভরশীল রাখালচন্দ্র যে নরেন্দ্রনাথের সপ্রেম ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারা সর্ব্ব বিষয়ে নিয়ন্ত্রিত হইবেন ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। সুতরাং নরেন্দ্রনাথের পরামর্শে তিনিও ঐ সময়ে পূর্ব্বোক্ত প্রকার অঙ্গীকার-পত্রে সহি করেন।" এই সময়ে নরেন্দ্রনাথ ধর্ম্মভাবের তীব্র প্রেরণায় অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য পালনে ও কঠোর তপস্যায় নিরত ছিলেন। লীলাপ্রসঙ্গে উল্লিখিত আছে, "তিনি নিরামিষভোজী হইয়া ভূমি অথবা কম্বল শয্যায় রাত্রি যাপন করিতেছিলেন।" রাখাল নরেন্দ্রনাথের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার অনুগমন করিতেন। দুইজনে ব্রহ্মচর্য্য পালনোদ্দেশ্যে ও শারীরিক বলসঞ্চয় করিতে সচেষ্ট হইয়া মসজিদবাড়ী ষ্ট্রীটে অম্বিকাচরণ গুহ মহাশয়ের কুস্তির আখড়ায় নিয়মিতভাবে ব্যায়াম শিক্ষা আরম্ভ করিলেন। এইরূপে কি ধর্ম্মে, কি কর্ম্মে, কি আধ্যাত্মিক ভাব-বিকাশে যাহাতে একরূপে গঠিত হইতে পারেন তজ্জন্য ইঁহারা চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

অভিভাবক শ্যামলাল সেন মহাশয় রাখালের সুন্দর বিনয়-নম্র

ব্যবহার, ধর্ম্মপ্রাণতা এবং নানাবিধ সদ্‌গুণরাশিতে মুগ্ধ হইলেও তাঁহার অধ্যয়নে উদাসীনতা দেখিয়া বিশেষ ক্ষোভ প্রকাশ করিতেন। কিন্তু যখন তিনি দেখিলেন যে, রাখাল বিদ্যালয়ে নিয়মিতভাবে গেলেও বার্ষিক পরীক্ষায় তেমন কৃতী ছাত্ররূপে পরিগণিত হইতে পারিতেছেন না এবং পড়াশুনা অপেক্ষা ব্রাহ্মসমাজে, ধর্ম্মালোচনায় ও ব্যায়াম-অভ্যাসে অধিকাংশ সময় যাপন করিতেছেন তখন তিনি অগত্যা তাঁহার জামাতা আনন্দমোহনকে রাখালের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ জানাইলেন। আনন্দমোহন পুত্রের পাঠে ঔদাসীন্য ও প্রবল ধর্ম্মানুরাগের কথা ইতিপূর্ব্বেই লোকপরম্পরায় শুনিয়াছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে পুত্রকে দেখিতেও আসিতেন। কিন্তু পুত্রের নির্ম্মল আদর্শ চরিত্র, সদ্‌বুদ্ধি, ধর্ম্মপ্রাণতা ও সরলতা দেখিয়া মনে মনে বিশেষ আনন্দবোধ করিতেন। পুত্রকে সাদরে নিকটে আহ্বান করিয়া সুমিষ্ট বচনে নানা সদুপদেশ প্রদান করিতেন এবং তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করাইয়া দিতেন যে ছাত্রজীবনে অধ্যয়নই একমাত্র ধর্ম্ম। পুত্রের ব্রাহ্মসমাজে যোগদান কিম্বা নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে নানাস্থানে ধর্ম্মালোচনার জন্য গমনাগমনে আনন্দমোহন কোনরূপ তিরস্কার করিতেন না। এই সব আন্দোলনে অধিক সময় নষ্ট না করিয়া যাহাতে রাখাল পড়াশুনায় মনোনিবেশ করেন, তৎপ্রতি তিনি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেন। পিতার উপদেশ শ্রবণ করিয়াও তিনি একাগ্র মনে পাঠে মনোনিবেশ করিতে পারিতেন না। ধর্ম্মানুভূতির প্রবল আগ্রহে ছাত্রজীবনের কর্ত্তব্যবুদ্ধি যেন কোথায় ভাসিয়া যাইত। জ্ঞানার্জ্জনের জন্য অধ্যয়ন করা যে প্রয়োজন এবং বিদ্যালয়ে কৃতিত্ব লাভ করিতে পারিলে যে যশ, সুখ্যাতি ও আত্মতৃপ্তি

আছে তাহা অন্তরে বুঝিতে পারিলেও রাখালের মনের স্বাভাবিক উচ্চ ভাবভূমিতে তাহা যেন স্থান পাইত না। পরমার্থলাভের ধ্যানই রাখালের নিকট শ্বাস-প্রশ্বাসের ন্যায় স্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত হইত। ছাত্রজীবনে জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহা বা অন্য কোন বুদ্ধি ও আকাঙ্ক্ষা সেই স্বাভাবিক গতিকে ব্যাহত করিতে পারে নাই।

রাখাল ব্রাহ্ম-সমাজের উপাসনায় নিয়মিতভাবে যোগদান করিতেন। আচার্য্যের মুখে ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান ও প্রার্থনা শুনিয়া তিনি ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে গৃহে প্রত্যাগত হইতেন। কিন্তু যখন রাখাল নির্জ্জনে একাকী প্রার্থনা ও উপাসনা করিতে বসিতেন তখন তাঁহার মনে হইত যে, এই বিশ্বের স্রষ্টা যেমন আদি-অন্তহীন তাঁহার ধ্যান ও চিন্তা তেমনি আদি-অন্তহীন। গভীর কল্পনায় কখন কখন তাঁহার মনে সংশয়ের প্রবল ঝঞ্ঝা বহিত, ক্ষণে ক্ষণে নিরাশার ঘোরান্ধকার দেখা দিত, কখন আশার বিজলী খেলিয়া যাইত আবার কখন তাঁহার চিত্তপটে কত সৌন্দর্য্য-সমুদ্রের তরঙ্গ, অনন্ত জ্ঞানের অভ্রভেদী শৃঙ্গ, কত মাধুর্য্য ও বিবস্বান জ্যোতিঃ ভাসিয়া উঠিত। মনের এই বিচিত্র চঞ্চল রূপ নিরীক্ষণ করিয়া রাখাল অত্যন্ত বিস্মিত হইতেন। সংশয়াচ্ছন্ন চিত্তে তিনি ভাবিতেন, এই তো মন! এই মনে কি তাঁহাকে পাওয়া যায়? সেই সত্যজ্ঞান অনন্তস্বরূপ অদ্বিতীয় নিরাকার পরব্রহ্মকে কি এই মন ধারণা করিতে পারে? কে আছে, যাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহার এই সকল সংশয় তিরোহিত হয়? এইরূপ চিন্তাসঙ্কুল মনে রাখাল সর্ব্বদা অন্যমনস্ক থাকিতেন। পাঠে তাঁহার মন কিছুতেই রীতিমতভাবে নিবিষ্ট হইত না।

আনন্দমোহন দেখিতে পাইলেন যে রাখাল পাঠে অমনোযোগী।

তিনি মাঝে মাঝে পুত্রকে ভৎর্সনা ও শাসনের ভয় দেখাইতেন। গুরুজন ও আত্মীয়-স্বজনেরাও রাখালকে পড়াশুনায় মনোনিবেশ করিতে কত সদুপদেশ দিতেন। কিন্তু তাঁহার পূর্ব্বভাবের কোন পরিবর্ত্তন হইল না। আনন্দমোহন চিন্তিত হইলেন। একমাত্র পাঠে অবহেলা ছাড়া তাঁহার বিরুদ্ধে আর কিছু অভিযোগ করিবার ছিল না। রাখাল এখন ষোড়শবর্ষ অতিক্রম করিয়া সপ্তদশবর্ষে উপনীত হইয়াছেন। ক্ষুদ্র বালক হইলে তাঁহাকে শাসন করা যাইত—কিন্তু এ যে যুবক। এদিকে আনন্দমোহনের শ্বশুর শ্যামলাল প্রমুখ আত্মীয়-স্বজনেরা রাখালের ব্রাহ্মধর্ম্মে অনুরাগ ও পাঠে নিয়ত অবহেলা দেখিয়া অবিলম্বে পুত্রের বিবাহ দিতে তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন। গতানুগতিক লোকেরা সাধারণতঃ যেরূপ মনে করিয়া থাকে তাঁহারাও রাখালকে সেইরূপ ভাবে বুঝিলেন। আধ্যাত্মিকতার গভীরতা ও তীব্রতা তাঁহারা কেহই লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। ঘটনাক্রমে এই সময়ে একটি মনোমত পাত্রীর সহিত বিবাহের প্রস্তাবও উত্থাপিত হইল। কাঁসারীপাড়ার সন্নিকটস্থ পল্লীতেই তখন শ্রীযুক্ত মনোমোহন মিত্র কর্ম্মোপলক্ষে বাস করিতেন। তিনি গভর্ণমেণ্ট সেক্রেটারীয়েটে কাজ করিতেন। বিশ্বেশ্বরী নামে মনোমোহনের একটি অবিবাহিতা ভগ্নী ছিল। বালিকার বয়স তখন প্রায় একাদশবর্ষ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে সুতরাং তাঁহার অভিভাবকেরা তাঁহাকে সৎপাত্রে অর্পণ করিতে চারিদিকে পাত্রের সন্ধান করিতেছিলেন। রাখালের মত নির্ম্মল-চরিত্র সম্ভ্রান্ত যুবকের সহিত সেই ভগ্নীর যাহাতে বিবাহ হয় তদ্বিষয়ে মনোমোহনের বিশেষ চেষ্টা ছিল। মনোমোহনের ধর্ম্মশীলা মাতা রাখালের মত ধার্ম্মিক জামাতা পাইবার আশায় পুত্রকে এই বিষয়ে

বিশেষ যত্নবান হইতে আদেশ করিলেন। যখন মনোমোহন শুনিতে পাইলেন যে রাখালের অভিভাবকেরা একটি মনোমত বয়স্কা সুন্দরী পাত্রীর সন্ধান করিতেছেন, তখন তিনি সে সুযোগ ত্যাগ করিলেন না। পূর্ব্ব হইতেই শ্যামলালের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল। শ্যামলাল জানিতেন যে মনোমোহন সরকারী কাজ করেন এবং পল্লীর মধ্যে অমায়িক, সজ্জন ও ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি বলিয়া তাঁহার সকলের নিকট বিশেষ সম্মান ও প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় ভুবনমোহন সরকারী ডাক্তার ছিলেন। ইঁহারা কোন্নগরের মিত্রবংশ—কায়স্থসমাজে সম্ভ্রান্ত কুলীন বলিয়া খ্যাত। পল্লীর মধ্যে রাখালের বালসুলভ কমনীয় মূর্ত্তি অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। তাঁহার সৌষ্ঠবমণ্ডিত দৃঢ় মাংসপেশী-সমন্বিত অবয়ব ও স্বাস্থ্যপূর্ণ দেহের প্রতি অনেকেই চাহিয়া থাকিত। বিশেষতঃ রাখালের পবিত্র চরিত্র ও সদ্‌গুণরাশির কথা পল্লীর কাহারও অপরিজ্ঞাত ছিল না। এইরূপ সম্ভ্রান্ত-কুলসম্ভূত নবীন যুবককে জামাতৃপদে বরণ করিতে যে অনেকেই লালায়িত হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? মনোমোহনের ভগ্নীর সহিত সম্বন্ধের প্রস্তাব অনুমোদন করিয়া শ্যামলাল আনন্দমোহনের নিকট উহা উত্থাপিত করিলেন। আনন্দমোহনও মনোমত পাত্রী এবং সম্ভ্রান্ত বংশের কন্যা পাইয়া শ্বশুরের উক্ত প্রস্তাবে সানন্দে স্বীকৃত হইলেন। তিনি ভাবিলেন যে পুত্রের বিবাহ দিলে তাঁহার মনের ঔদাসীন্য কাটিয়া যাইবে। বিষয়-বুদ্ধি-সম্পন্ন আনন্দমোহন পুত্রের বিষয়ানুরক্তির আশায় তাঁহাকে অবিলম্বে দাম্পত্য-বন্ধনে আবদ্ধ করাই যুক্তিসঙ্গত বোধ করিলেন। তিনি দেখিলেন যে তাঁহার পুত্র কি বুদ্ধিমত্তায়, কি নৈতিক চরিত্রে,

কি ধীরতায় কাহারও অপেক্ষা ন্যূন নহেন। কৃতী ছাত্র বলিয়া বিদ্যালয়ে যশস্বী না হইলেও ক্লাশের পরীক্ষায় কোন দিন অকৃতকার্য্য হন নাই, সুতরাং বিবাহ দিলে রাখালের পাঠেও হয়ত অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতে পারে।

রাখালের মন এই সময়ে দ্বন্দ্ব-সঙ্কুল ছিল। পার্থিব সুখ-সম্ভোগে তাঁহার স্পৃহা ছিল না। তাঁহার দৃষ্টি তখন ভূমার দিকে। কৈশোর হইতেই ব্রাহ্মসমাজের সংস্পর্শে আসিয়া রাখাল বৈরাগ্যের উপদেশ কখনও পান নাই; পরিণয়-বন্ধন যে তাঁহার অভীষ্টলাভের অন্তরায় হইতে পারে, ভগবানকে লাভ করিতে হইলে যে তাঁহাকে সর্ব্বাগ্রে সংসার ত্যাগ করিতে হইবে, রাখালের ঈশ্বর-লুব্ধচিত্তে ঈদৃশ জটিল প্রশ্ন আদৌ উদিত হয় নাই। বালকের মত সরল রাখাল সাধারণ কর্ত্তব্যবুদ্ধিতেই বুঝিলেন যে সংসারে সকলেই বিবাহ করিয়া থাকে, তাঁহাকেও করিতে হইবে; তাঁহার পিতা ও অন্যান্য গুরুজনদের ইচ্ছা পূর্ণ করাই তাঁহার সর্ব্বপ্রধান কর্ত্তব্য। কিন্তু রাখালের বৈরাগ্য প্রকৃতি-সিদ্ধ। তাঁহার লক্ষ্য পরম পিতার প্রেম, তাঁহার মন ব্রহ্ম-চিন্তায় মগ্ন, তাঁহার প্রকৃতি সতত ধ্যান-পরায়ণ, তাঁহার বৈরাগ্য অন্তঃসলিলা ফল্গুনদীর ন্যায় সর্ব্বদাই প্রবাহিত হইত, বহিঃপ্রকাশ না থাকিলেও তাহা অন্তরে আজন্ম বিদ্যমান ছিল।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে শুভদিনে শুভলগ্নে শ্রীমতী বিশ্বেশ্বরীর সহিত রাখালের পরিণয়কার্য্য সম্পন্ন হইল। কিন্তু তখন কে জানিত যে, এই বিবাহবন্ধনই তাঁহার সকল প্রকার জাগতিক বন্ধনের মুক্তির কারণস্বরূপ হইবে? কে জানিত যে, মহামায়া কোন অপরিজ্ঞাত

কৌশলে তাঁহার প্রকৃতিসুলভ বৈরাগ্য-মূর্ত্তিকে অধ্যাত্ম-দীপ্তিতে সমধিক উজ্জ্বল করিয়া দিবেন? কে জানিত এই বিবাহের ফলে রাখাল দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পাদমূলে উপনীত হইয়া তাঁহার চির-ঈপ্সিত, অনন্তমাধুর্য্যপূর্ণ স্নেহরসের পীযূষধারা পান করিয়া সন্তানভাবে বিহ্বল ও আত্মহারা হইবেন?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণ

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে বাংলার যুবকবৃন্দ ভারতের প্রাচীন আদর্শ ও সংস্কৃতির প্রতি শ্রদ্ধা হারাইতে লাগিল। তাহারা নবাগত পাশ্চাত্য জাতির আদর্শে নূতন ভাবে জাতীয় জীবন সংগঠনে ব্রতী হইল। ইংরাজী বিদ্যা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে 'ইয়ং-বেঙ্গলের' উদ্ভব; যুবকবৃন্দ স্বাধীন চিন্তা ও স্বাধীন যুক্তিবাদের নামে উচ্ছৃঙ্খলতার মাদকতায় মাতিয়া উঠিল। ধীর, মনস্বী ও প্রতিভাশালী ব্যক্তিরা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সমন্বয় ঘটাইতে গিয়া পুরাতনকে একেবারে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নূতন আকারে গঠন করিতে প্রয়াসী হইলেন। রাজা রামমোহনের নব আলোক-সম্পাতে মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর শিক্ষাসংস্কারে প্রবৃত্ত হইলেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্মে শাস্ত্রাদি অপেক্ষা 'আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধোজ্জ্বল' সিদ্ধান্তকে উচ্চতর স্থান দিয়া যুবক-সম্প্রদায়কে আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। ইহার অব্যবহিত পরেই যুবক কেশবচন্দ্র তাঁহার অগ্নিগর্ভ বিদ্রোহের বাণীতে যুবকবৃন্দকে প্রাচীনতার বিরুদ্ধে বিপ্লবের অভিযানে নিয়োজিত করিলেন। মাতা-পিতা, স্ত্রী-পুত্র ও আত্মীয়-স্বজনের মমতা-বন্ধন উপেক্ষা করিয়া সত্যান্বেষী ও দেশের মঙ্গলকামী যুবকের দল ব্রাহ্মসমাজের পতাকার তলে সমবেত হইয়া কেশবচন্দ্রের প্রচারিত জ্বলন্ত আদর্শে তাহাদের স্ব স্ব জীবন আহুতি-প্রদানে

প্রবৃত্ত হইল। যখন সমগ্র বাংলায় এইরূপ সামাজিক ও আধ্যাত্মিক বিপ্লব চলিতেছিল, তখন কলিকাতার অদূরে গঙ্গাকূলে দক্ষিণেশ্বরস্থ রাণী রাসমণির প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীভবতারিণীর মন্দিরে এক নিরক্ষর, দীনহীন পূজক ব্রাহ্মণ জগতে যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তন ও মহাশক্তির উদ্বোধন করিবার জন্য অলৌকিক কঠোর সাধনায় মগ্ন ছিলেন।

যুগে যুগে যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের অভ্যুত্থান হয়, যখন শাশ্বত সত্যের বিরাট মূর্ত্তি মিথ্যাচার ও আবর্জ্জনার জীর্ণ-স্তূপে আচ্ছাদিত হয়, যখন সমগ্র মনুষ্যজাতি দিগ্‌ভ্রান্ত পথিকের মত আকুল আগ্রহে সত্য পথের জন্য চঞ্চল উৎকণ্ঠায় ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায়, তখন অপার করুণায় শান্তির অমৃতপাত্র হস্তে যুগপ্রবর্ত্তক সনাতন বেদমূর্ত্তি মহাপুরুষ জীবজগতের কল্যাণার্থে আবির্ভূত হন। ইহাই ধর্ম্মক্ষেত্র পুণ্যভূমি ভারতের আধ্যাত্মিক শক্তির ইতিহাস।

শ্রীরামকৃষ্ণ কঠোর সাধনার ফলে ভাবময় চক্ষে যে অখিল রসামৃত-সিন্ধুর দর্শন পাইয়াছিলেন তাহার সন্ধান দিতে ও জীবের মুক্তির জন্য যে মহারত্ন আহরণ করিয়াছিলেন তাহাই জগতে বিতরণ করিতে ব্যাকুল হইলেন। শ্রীশ্রীজগদম্বা তাঁহাকে বলিলেন— "তুই আর আমি এক। তুই ভক্তি নিয়ে থাক—জীবের মঙ্গলের জন্য। ভক্তেরা সকলে আসবে। তোর তখন কেবল বিষয়ীদের দেখতে হবে না; অনেক শুদ্ধ ও কামনাশূন্য ভক্ত আছে—তারা আসবে।" অতঃপর মন্দিরে আরতির সময় কাঁসর-ঘণ্টা যখন বাজিয়া উঠিত, তখন ভাববিহ্বল শ্রীরামকৃষ্ণ কুঠির উপর হইতে দাঁড়াইয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতেন, "ওরে, তোরা কে কোথায় আছিস্

শীগগির আয়।" তাঁহার সেই ব্যাকুল আহ্বান বায়ুস্তরে মিশিয়া অনন্তের বক্ষে স্পন্দন উৎপাদন করিত কি না—কে জানে! কে জানে তাহা অলক্ষ্যে ভক্তহৃদয়ে আঘাত করিয়া ভক্তকে তাঁহার নিকট আকর্ষণ করিত কি না!

কেশবচন্দ্রের আগমনের পর হইতেই কলিকাতা ও বিভিন্ন স্থান হইতে দলে দলে লোক আধ্যাত্মিক পিপাসা-শান্তির জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট আসিতে লাগিল। ভাগীরথী তীরে পঞ্চবটী-মূলে তিনি এখন নির্ব্বিকল্প সমাধিতে লীন নহেন। সমাধি হইতে ব্যুত্থিত শ্রীরামকৃষ্ণ এখন মাঝে মাঝে পিপাসু ভক্তগণে পরিবৃত হইয়া পঞ্চবটীতলে বসিয়া ধর্ম্মপ্রসঙ্গে নিমগ্ন থাকেন। কখনও তাঁহার বসিবার ও শয়নের ঘর, কখনও তৎসংলগ্ন বারান্দা লোকে লোকারণ্য হয়। তিনি তাঁহাদের সম্মুখে বসিয়া কখনও ঈশ্বরপ্রসঙ্গে বিভোর, কখনও সমাধিস্থ, কখনও স্বাভাবিক ঊর্দ্ধগামী মনের গতিকে লোক-কল্যাণের জন্য সংযত করিবার চেষ্টা করিতেছেন, আবার কখনও বা এই আনন্দময় পুরুষ রঙ্গহাস্যে ও সরস বাক্যে আনন্দের তরঙ্গ বহাইয়া দিতেছেন। যাঁহারা আসিতেছেন তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ নিজ নিজ অধিকার অনুযায়ী সাধনার ইঙ্গিত পাইতেছেন, আবার কেহ কেহ সংশয়-তিমির হইতে উদ্ধার পাইয়া সত্যের উজ্জ্বল আলোক দর্শনে কৃতার্থ হইতেছেন। কেহই রিক্তহস্তে প্রত্যাখ্যাত হইতেন না। পাপী তাপী, সাধু পুণ্যবান, পতিত ও উন্নত—তাঁহার নিকটে সকলেই সমভাবে সমাদৃত। প্রাতঃকাল হইতে গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত লোকসমাগমের অন্ত নাই এবং তাঁহাদের কল্যাণের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণেরও বিন্দুমাত্র ক্লান্তি নাই। সকলেরই অবারিত দ্বার।

অহর্নিশি ঈশ্বর-প্রসঙ্গে ও ভাবসমাধিতে তিনি মগ্ন হইয়া রহিয়াছেন। অপূর্ব্ব স্থান, অপূর্ব্ব দৃশ্য এবং সর্ব্বোপরি এই অপূর্ব্ব মহাপুরুষ!

জগন্মাতার আদেশে শ্রীরামকৃষ্ণ সর্ব্বদা ভাবমুখে থাকিতেন। একদিন তিনি ব্যাকুল অন্তরে তাঁহাকে প্রার্থনা করিয়া জানাইলেন, "বিষয়ী সংসারী লোকদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে জিভ জ্বলে গেল।" জগন্মাতা বলিলেন, "ভয় নাই, ত্যাগী শুদ্ধসত্ত্ব ভক্তেরা আসিতেছে।" শ্রীরামকৃষ্ণ জানাইলেন, "মা, একজনকে সঙ্গী করে দাও—আমার মত।" আবার ব্যাকুলভাবে মাকে বলিলেন, "মা, আমার তো সন্তান হবে না, কিন্তু ইচ্ছা করে একটি শুদ্ধসত্ত্ব ছেলে আমার সঙ্গে সর্ব্বদা থাকে। সেইরূপ একটি ছেলে আমায় দাও।" শ্রীশ্রীজগন্মাতা তাঁহার প্রার্থনা শুনিলেন।

ইহার কিছুদিন পরে শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন ভাবচক্ষে দেখিলেন বটতলায় একটি ছেলে দাঁড়াইয়া আছে। তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "এ কি দেখিলাম! বটতলায় একটি বালকের দর্শন কেন হইল? ইহার কারণ কি?" বালস্বভাব সরল মহাপুরুষ তাঁহার ভাগিনেয় হৃদয়কে এই দর্শনের কথা বলিলেন। হৃদয় আনন্দে বলিয়া উঠিলেন, "মামা, তোমার একটি ছেলে হবে, তাই দেখেছ!" শ্রীরামকৃষ্ণ চমকিয়া বলিলেন, "সে কিরে? আমার যে মাতৃযোনি! আমার ছেলে হবে কেমন করে?" কিন্তু তাঁহার এই প্রশ্নের উত্তর দিলেন একদিন স্বয়ং শ্রীজগন্মাতা। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গে আছে, "শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন, 'রাখাল আসিবার কয়েকদিন পূর্ব্বে দেখিতেছি মা (শ্রীশ্রীজগদম্বা) একটি বালককে সহসা আমার ক্রোড়ে বসাইয়া দিয়া বলিতেছেন, "এইটি তোমার

পুত্র”—শুনিয়া আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিয়া বলিলাম—সে কি?—আমার আবার ছেলে? তিনি তাহাতে হাসিয়া বুঝাইয়া দিলেন; সাধারণ সংসারিভাবে ছেলে নহে, ত্যাগী মানসপুত্র। তখন আশ্বস্ত হই'।”

সেই শুদ্ধসত্ত্ব বালকের আগমন-প্রতীক্ষায় যখন শ্রীরামকৃষ্ণ উন্মুখ হইয়া রহিয়াছেন তখন তিনি একদিন ভাবচক্ষে দেখিলেন যেন গঙ্গাবক্ষে সহসা একটি শতদল কমল প্রস্ফুটিত হইল—তাহার দলে দলে অপূর্ব্ব শোভা! চির-কিশোর রাখালরাজ শ্রীকৃষ্ণের কর ধারণ করিয়া নূপুর পায়ে অপরূপ একটি সমবয়সী কিশোর বালক সেই শতদলের উপর নৃত্য করিতেছে। কি মনোরম নৃত্য! নৃত্যের প্রতি ভঙ্গীতে মাধুর্য্য-সিন্ধু যেন উথলিয়া উঠিতেছে। দেখিতে দেখিতে শ্রীরামকৃষ্ণ আত্মহারা হইলেন। ঠিক সেই সময়ে কোন্নগর হইতে নৌকাযোগে গঙ্গা পার হইয়া মনোমোহনের সঙ্গে আসিয়া উপনীত হইলেন—রাখালচন্দ্র। শ্রীরামকৃষ্ণ সবিস্ময়ে, ভাববিহ্বলচিত্তে রাখালের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। একি! এ যে তাঁহার পূর্ব্বদৃষ্ট বটতলার বালক—জগদম্বার কথিত ত্যাগী মানসপুত্র—কমলদলে নৃত্যরত ব্রজকিশোর রাখালরাজ শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যসখা! এ যে জগদম্বার নিকট তাঁহারই প্রার্থিত সঙ্গী—শুদ্ধসত্ত্ব বালক!

রাখালের শ্যালক মনোমোহন ও তাঁহার ভক্তিমতী জননী শ্যামাসুন্দরী পূর্ব্ব হইতেই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি পরম অনুরক্ত ছিলেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে মনোমোহন “সুলভসমাচারে” শ্রীরামকৃষ্ণের কথা পাঠ করিয়া দক্ষিণেশ্বরে তাঁহাকে দর্শন করিতে যান। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে সাদরে ও পরম স্নেহে নিকটে বসাইয়া আধ্যাত্মিক

কথাপ্রসঙ্গে ও দিব্যভাবে তাঁহার মনের সমুদয় জটিল প্রশ্ন সমাধান করিয়া দেন। তদবধি তিনি সুযোগ মত প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতেন। পুত্রের নিকট তাঁহার মাতা শ্রীরামকৃষ্ণের আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত শুনিয়া বলিলেন, "ইনি ত সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীশ্রীনবদ্বীপচন্দ্র দক্ষিণেশ্বরে লীলা করিতেছেন।" তাঁহার মাতাও প্রায়ই তাঁহাকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বরে যাইতেন। মনোমোহনও শ্রীরামকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ ভগবান্ শ্রীগৌরচন্দ্র জ্ঞানে ভক্তি করিতেন। সুতরাং বলিতে গেলে মনোমোহনের সমগ্র পরিবার শ্রীরামকৃষ্ণের পরম অনুরাগী ভক্ত ছিলেন। দৈবযোগে এই ভক্তপরিবারের সহিত রাখাল পরিণয়সূত্রে মিলিত হইলেন। রাখাল যখন বিবাহের অব্যবহিত পর প্রথম শ্বশুরালয়ে গেলেন, তখন ভক্ত মনোমোহন কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনকালে নূতন জামাতা রাখালচন্দ্রকে শ্রীরাম-কৃষ্ণের আশীর্ব্বাদলাভ ও তাঁহার সঙ্গে পরিচয় করাইবার জন্য সঙ্গে লইয়া দক্ষিণেশ্বরে গমন করেন। শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন করিয়াই রাখালের হৃদয়ে বিদ্যুৎচমকের মত একটা অভূতপূর্ব্ব নিবিড় আকর্ষণের দীপ্তিলেখা খেলিয়া গেল। রাখাল ও মনোমোহন উভয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের পাদমূলে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণত হইলেন। মনোমোহন ধীরে ধীরে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট রাখালের পরিচয় দিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ স্থির দৃষ্টিতে তাকাইয়া রাখালকে দেখিয়া শ্রীশ্রীজগদম্বার দান বলিয়া চিনিতে পারিলেন কিন্তু বাহিরে মনোমোহনের সমক্ষে তাহা কিছুমাত্র প্রকাশ করিলেন না কিম্বা কোনরূপ আবেগ উচ্ছ্বাসও দেখাইলেন না। কিয়ৎক্ষণ গম্ভীরভাবে রাখালের দিকে তাকাইয়া থাকিবার পর

শ্রীরামকৃষ্ণ মনোমোহনকে সহাস্যে বলিলেন, "সুন্দর আধার।" অনন্তর তিনি রাখালের সঙ্গে এমন ভাবে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন যেন তিনি তাঁহার কত দিনের পরিচিত। রাখাল শ্রীরামকৃষ্ণের এইরূপ সস্নেহ ব্যবহার দেখিয়া মনে মনে বিস্মিত হইতে লাগিলেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে এইরূপ সরল স্নেহ-সম্ভাষণ এবং মধুর ব্যবহার জীবনে কখনও উপলব্ধি করেন নাই।

অনন্তর শ্রীরামকৃষ্ণ রাখালের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তোমার নামটি কি?" নবাগত উত্তর করিলেন—"শ্রীরাখালচন্দ্র ঘোষ।" "রাখাল" শব্দ শুনিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণ আবার ভাবাবিষ্ট হইয়া গদগদকণ্ঠে আপন মনে অস্ফুটস্বরে বলিতে লাগিলেন, "সেই নাম! রাখাল—ব্রজের রাখাল!" ভাবাবেশ প্রশমিত হইলে তিনি সস্নেহে মধুরকণ্ঠে তাঁহাকে বলিলেন—"এখানে আবার এসো।" এদিকে আত্ম-বিস্মৃত রাখাল মৌনভাবে বসিয়া বিভোর হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব্ব দিব্যমাধুরী অনিমেষ লোচনে দেখিতেছিলেন। তাঁহার মনে হইল—"ইনি কে? এই সৌম্য মহাপুরুষ কে? ইনি কি পরম পিতার কথা বলিয়া দিতে পারেন?" শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়া রাখালের হৃদয়ে সহসা জাগিয়া উঠিল বিশ্বস্রষ্টার পিতৃত্ব। কলিকাতায় ফিরিবার পথে তাঁহার মনে কেবল এই প্রশ্ন উদিত হইতে লাগিল—"সেই পরম পিতা কি সত্য সত্যই প্রত্যক্ষীভূত হন? এই মহাপুরুষ কি তাঁহাকে সাক্ষাৎ অনুভব করিয়াছেন?" পথে যাইতে যাইতে তাঁহার কর্ণে

শ্রীরামকৃষ্ণের সেই প্রেমপূর্ণ বাণী সুমধুর কোমলস্বরে পুনঃ পুনঃ ধ্বনিত হইতে লাগিল—"এখানে আবার এসো।"

ব্রাহ্মসমাজে আধ্যাত্মিক সাধনায় রাখাল নিরাকার ব্রহ্মকে পরম-পিতারূপে পিতৃভাবের উপাসনা করিতে শুনিয়াছেন এবং কিশোর বয়স হইতে উক্ত ভাবে দৃঢ় বিশ্বাস করিয়া স্বীয় জীবনে তাহা উপলব্ধি করিবার প্রয়াস করিতেছিলেন। তাঁহার বিশুদ্ধ সত্তায় যে সন্তান-ভাব বীজাকারে অন্তর্নিহিত ছিল বয়সের সঙ্গে সঙ্গে দিন দিন অন্তরে অন্তরে তাহা পুষ্ট হইলেও উপযুক্ত সুযোগ-অভাবে তাহা অঙ্কুরিত হইতে পারে নাই। সংসারে সেই শুদ্ধ সুনির্মল আশ্রয় দুর্লভ। শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিয়াই যেন তাঁহার সেই অনুদগত সন্তানভাব সহসা বিকাশ পাইতে চাহিল। তাই মনোমোহনের সঙ্গে গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেও তাঁহার মন পড়িয়া থাকিল দক্ষিণেশ্বরে। শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব্ব স্নেহময় মাধুর্য্যমণ্ডিত মূর্ত্তি তাঁহার স্মৃতিপথে যেন স্বতঃই পুনঃ পুনঃ উদিত হইতে লাগিল। তাঁহার পুণ্যসঙ্গ লাভ করিবার জন্য তিনি ব্যাকুল হইলেন। তাঁহার মনে হইতে লাগিল—আবার কখন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের সমীপবর্ত্তী হইবেন, কখন তাঁহার অপার্থিব স্নেহের পীযূষধারা পান করিয়া তাঁহার অতৃপ্ত পিপাসা মিটাইবেন, আবার কখন তাঁহার সান্নিধ্যলাভে হৃদয়ের সমগ্র উদ্বেল তরঙ্গ শান্ত হইবে? কে এই মহাপুরুষ—যাঁহাকে দেখিলে মনে হয় যেন তিনি আপনার হইতেও আপনার, অনন্ত স্নেহের আধার! কে এই অদ্ভুত পুরুষ—যাঁহাকে দেখিলে প্রাণ জুড়াইয়া যায়, যাঁহার নিকট মনের সকল কথা অকপটে খুলিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়, যাঁহাকে স্পর্শ করিলে শরীর মন যেন স্নিগ্ধ ও পবিত্র হইয়া উঠে!

কে এই সৌম্য পুরুষ যাঁহাকে দেখিতে দেখিতে চক্ষু মুগ্ধ হয়, যাঁহার কথা শুনিলে অন্তরের অন্তর্বীণায় মধুর ঝঙ্কার তুলিয়া দেয়, যাঁহার ভাববিহ্বল মূর্ত্তি দেখিলে সকল পার্থিব স্মৃতি বিলুপ্ত হইয়া যায়! রাখাল মনে মনে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি একটা প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিলেন।

এইরূপ আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়াই রাখাল একদিন বিদ্যালয়ের ছুটির পর একাকী দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া তিনি সস্নেহে বলিলেন, "তোর এখানে আস্‌তে এত দেরী হল কেন?" রাখাল এই প্রশ্নের আর কি উত্তর দিবেন? তিনি মৌনভাবে অবাক হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিলেন। দেখিতে দেখিতে তিনি যেন কোন অতীন্দ্রিয় ভাবরাজ্যে চলিয়া গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্য স্নেহস্পর্শে আত্মবিস্মৃত রাখাল গভীর ভাবে মগ্ন। ভাবের গভীরতা প্রশান্ত মহাসাগরের ন্যায় শান্ত; কিন্তু যখন প্রবল বায়ুর তাড়নে তরঙ্গ উত্থিত হয় তখন সে প্রবল জলোচ্ছ্বাস ও ভীষণ তরঙ্গ কে রোধ করিতে পারে? এক্ষেত্রে তাহাই ঘটিল।

দুইজন দুইজনকে দেখিয়া ভাবে উন্মত্ত। শ্রীরামকৃষ্ণ দেখিতেছেন, রাখাল আকারে বলিষ্ঠ যুবার ন্যায় হইলেও ভাবে যেন তিন চারি বৎসরের বালক। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গে সারদানন্দ স্বামিজী লিখিয়াছেন, "শ্রীযুত রাখালের সম্বন্ধে অন্য এক সময়ে ঠাকুর আমাদিগকে বলিয়াছিলেন, 'তখন রাখালের এমন ভাব ছিল— ঠিক যেন তিন চারি বৎসরের ছেলে! আমাকে ঠিক মাতার ন্যায় দেখিত। থাকিত থাকিত, সহসা দৌড়িয়া আসিয়া ক্রোড়ে বসিয়া

পড়িত এবং মনের আনন্দে নিঃসঙ্কোচে স্তনপান করিত। বাড়ী ত দূরের কথা, এখান হইতে কোথাও এক পাও নড়িতে চাহিত না।"

আজন্ম ভাবঘনমূর্ত্তি রাখাল অনন্ত ভাবসিন্ধু শ্রীরামকৃষ্ণের সান্নিধ্যে আসিলেই তাঁহার প্রকৃতিসিদ্ধ অন্তর্নিহিত বালসত্তা ফুটিয়া উঠিত। আবার রাখালকে দেখিয়া নর ও নারী প্রকৃতির অপূর্ব্ব সম্মিলিত মূর্ত্তি শ্রীরামকৃষ্ণের হৃদয়ে বাৎসল্যরসের তরঙ্গ উথলিয়া পড়িত। শুদ্ধ, পবিত্র রসমাধুর্য্যের ইহা এক অপূর্ব্ব ছবি! শ্রীরামকৃষ্ণ কখনও রাখালকে ক্রোড়ে বসাইয়া স্তনপান করাইতেছেন, কখনও "গোপাল," "গোপাল" বলিয়া আদরে সস্নেহে তাঁহার অঙ্গে হাত বুলাইতেছেন, কখনও আনন্দে তাঁহাকে স্কন্ধে বসাইয়া নৃত্য করিতেছেন, আবার কখনও রাখালের অদর্শনে বৎসহারা গাভীর মত "রাখাল", "রাখাল" বলিয়া আকুলি বিকুলি করিতেছেন। রাখাল যেন তাঁহার নয়নের মণি, তাঁহার অঞ্চলের নিধি। রাখালও শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিল এবং তাঁহার সন্নিধানে আসিলে মনে করিতেন যেন তিনিই তাঁহার ঈপ্সিত বস্তু,—চির-আকাঙ্ক্ষার ধন। রাখাল যখন দক্ষিণেশ্বরে যান তখন তাঁহার অন্য সব চিন্তা, সকল সাংসারিক স্মৃতি মুছিয়া যায়, তাঁহার নাম, ধাম, গৃহ, পরিজন সব ভুল হইয়া যায়; শুধু জাগিয়া উঠে তাঁহার সেই নিত্য বালসত্তা—শ্রীরামকৃষ্ণ যেন তাঁহার চির স্নেহময় পিতা। সন্তানভাবের আরও ঘনীভূত অবস্থায় রাখাল স্নেহময়ী জননী-জ্ঞানে তাঁহার স্তন্যপীযুষধারা-আস্বাদনে উন্মুখ হইয়া উঠিতেন। কখনও কখনও রাখালের মনে হইত তিনি যেন শ্রীরামকৃষ্ণের নিত্যসহচর, শ্রীরামকৃষ্ণ যেন তাঁহার প্রাণের একমাত্র সুহৃদ্ ও সখা। আবার কখনও তাঁহার মনে উদয় হইত শ্রীরামকৃষ্ণ যেন তাঁহার নিত্যপ্রভু,

তিনি তাঁহার নিত্যদাস, নিত্যসেবক! রাখাল আবার কখন ভাবিতেন, তিনি যেন অপার করুণাময়, তরঙ্গসঙ্কুল সংসারবারিধির একমাত্র কর্ণধার, বিমল ব্রহ্মানন্দে মাতোয়ারা সাক্ষাৎ জগদ্গুরু শ্রীগুরু।

শ্রীরামকৃষ্ণ কখনও মা-যশোদার মত রাখালকে দেখিয়া "গোপাল," "গোপাল" বলিয়া স্নেহভরে তাঁহার শিরে, চিবুকে, বক্ষে ও পৃষ্ঠে হাত বুলাইতেন, আবার কখনও পিতার মত বালকের সঙ্গে ক্রীড়ায় রত হইতেন। বাস্তবিক তাঁহাদের উভয়ের এই সম্বন্ধ দেখিয়া বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার অমর মধুর কাহিনীই স্মৃতিপথে উদিত হয়। শ্রীকৃষ্ণের মধুর মুরলীধ্বনিতে যমুনা উজান বহিত, ঊর্দ্ধমুখে ধবলী-শ্যামলী গাভীর দল হাম্বা হাম্বা রবে ডাকিয়া উঠিত, গোপগোপী উন্মাদের মত "কৃষ্ণ", "কৃষ্ণ" বলিয়া ছুটিয়া আসিত, ভাববিহ্বল কৃষ্ণ-সখা সুবল সুদাম উচ্ছিষ্ট ফল শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের অধরে তুলিয়া দিত, শ্রীকৃষ্ণ পরমানন্দে তাহা খাইতেন। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনিতে মা যশোদা পথপানে চাহিয়া থাকিতেন, ভাবিতেন বুঝি তাঁহার "গোপাল" আসিতেছে। রাখালের ও শ্রীরামকৃষ্ণের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণও ব্রজলীলার এই বংশীধ্বনির মতই মধুর! উদ্ভিন্ন-যৌবন, বলিষ্ঠ, ব্যায়ামবীর রাখাল কোন্ মাধুর্য্যের রস-আস্বাদনে তিন চারি বৎসরের বালকের মত হইয়া যাইতেন? কোন্ অমৃতধারা-আস্বাদনের তৃষ্ণায় তিনি শিশুর মত শ্রীরামকৃষ্ণকে জননীজ্ঞানে তাঁহার স্তন পান করিতেন? কোন্ মাধুর্য্যঘন ভাব-বিহ্বলতায় অদ্বৈত-ভাবভূমিতে অবস্থিত মুহুর্মুহুঃ সমাধিমগ্ন শ্রীরামকৃষ্ণ নির্ব্বিকল্প সমাধিলাভের পরে আনন্দমাধুর্য্যে মগ্ন হইয়া বালভাবাপন্ন যুবককে সন্তানজ্ঞানে মাতার ন্যায় স্নেহ ও আদর যত্ন করিতেন, আবার

তাঁহাকে স্কন্ধে লইয়া নৃত্য করিতেন ? কেবলমাত্র পবিত্র তপস্তাপূত চিত্তই এই অপূর্ব্ব রসমাধুর্য্যের লীলা সম্যক্ ধারণা করিতে সক্ষম। একদিকে উদ্ভিন্ন-যৌবন সদ্যঃপরিণীত বলিষ্ঠকায় রাখালের আত্মহারা শিশুভাব—অপর দিকে অহর্নিশ সমাধিমগ্ন, দেহভাববিস্মৃত অতিক্রান্ত-প্রৌঢ় শ্রীরামকৃষ্ণের রাখালকে দেখিয়া নন্দরাণী যশোদার ভাবে বাৎসল্যরসের স্ফুরণ—অপূর্ব্ব রসপ্রবাহ ! জগতের আধ্যাত্মিক ইতিহাসে ইহা সম্পূর্ণ নূতন এক অমৃতময় আলেখ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণের বাৎসল্যভাবে সাধনার কথা আলোচনা করিলে দেখা যায় যে ইংরাজী ১৮৬২-৬৩ খৃষ্টাব্দে রাখাল ও নরেন্দ্রনাথ প্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদেরা জন্মগ্রহণ করেন এবং সেই বৎসরেই শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশে মথুরামোহন দক্ষিণেশ্বরে সাধুসেবার বিপুল আয়োজন করিয়াছিলেন। সর্ব্বসম্প্রদায়ের সাধকাগ্রণিগণ দলে দলে দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়ীতে আগমন করিতে লাগিলেন। এই সকল সমাগত সাধুসম্প্রদায়ের মধ্যে "জটাধারী" নামক জনৈক রামাইৎ সাধুর নিকট শ্রীরামকৃষ্ণ রামমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া বাৎসল্যভাবে তাঁহার রামলালা বিগ্রহের সেবা করিতে লাগিলেন। জটাধারীর সহিত সাক্ষাতের পূর্ব্বে শ্রীরামকৃষ্ণ সমগ্র তন্ত্রোক্ত সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া আপনাকে শ্রীশ্রীজগন্মাতার নিত্যসঙ্গিনীজ্ঞানে অনেক সময়ে স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া থাকিতেন। কখনও তিনি ফুলের মালা গাঁথিয়া নানাবিধ ফুলের অলঙ্কারে মাভবতারিণীর বিগ্রহকে সাজাইতেন, কখনও সখীভাবে চামর ব্যজন করিতেন, কখন মথুরের সাহায্যে নূতন নূতন ভূষণে মাকে ভূষিত করিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিতেন ; আবার কখন ভাবোন্মত্ততায় আনন্দময়ী শ্রীজগদম্বার সম্মুখে নৃত্যগীত

করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইতেন। প্রকৃতিভাবের সাধনায় নারীসুলভ কোমল বৃত্তিগুলি তাঁহার চরিত্রে বিকাশ পাইতে লাগিল। এই সময়ে রামলালা বিগ্রহ পাইয়া তাঁহার অপূর্ব্ব বাৎসল্যরসের সঞ্চার হয়। রামলালা তাঁহার নিকট শুধু জড়পিত্তলের মূর্ত্তি নয়—সত্য সত্য প্রত্যক্ষ জীবন্ত বাল-রামচন্দ্র। মা-কৌশল্যার ভাবে বিভোর হইয়া তিনি দেখিতেন, বালক কখন তাঁহার অগ্রে কখন পশ্চাতে নাচিতে নাচিতে চলিতেছে। কখনও দৌড়াদৌড়ি করিতেছে, কখন কোলে উঠিতেছে। স্নান করাইবার সময় সে গঙ্গায় ঝাঁপাইতেছে, কোন কথা শোনে না। রামলালার দুরন্তপনা দেখিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ মাতার ন্যায় কখন তিরস্কার বা শাসন করিতেছেন।

প্রকৃতিভাবের পরিপূর্ণতা মাতৃত্বে। শ্রীরামকৃষ্ণেরও প্রকৃতিভাবের সাধনায় ফুটিয়া উঠিয়াছিল এই মাতৃভাব। সন্তানভাবে তিনি বিশ্বজননী মহাশক্তির যে বিরাট মাতৃমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া অন্তরে অনন্ত বাৎসল্যরসের মাধুর্য্য আস্বাদন করিতেন, যে মাতৃমূর্ত্তি মাতা কৌশল্যায় বা মা-যশোদায় প্রতিফলিত—সেই মাতৃমূর্ত্তিই শ্রীরাম-কৃষ্ণের অন্তর সাধনার চিত্তপটে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল রামলালা বিগ্রহের সেবায় এবং শুদ্ধসত্ত্ব বালক রাখালের দর্শনে। তাই মাতা কৌশল্যার আদর্শে শ্রীরামকৃষ্ণের যে বাৎসল্যভাব অঙ্কুরিত হইয়াছিল অষ্টধাতুনির্ম্মিত রামলালা বিগ্রহে—তাহারই পূর্ণ পরিণতি হইয়াছিল মা-যশোদার ভাবস্ফূর্ত্তিতে জীবন্ত মানুষ-রাখালের সংস্পর্শে। শ্রীশ্রীজগদম্বার এই চিহ্নিত সন্তান নিত্যবালক শ্রীরামকৃষ্ণ আবার স্বয়ং জননীস্বরূপে সন্তানবাৎসল্যের মাধুর্য্য আস্বাদন করিতেছেন—অনন্তভাবসমুদ্রের ইহাও এক অপূর্ব্ব তরঙ্গ!

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

দক্ষিণেশ্বরে রাখাল

শ্রীরামকৃষ্ণকে প্রথম দর্শন করিয়া রাখাল মনে মনে এরূপ প্রবল আকর্ষণ অনুভব করিতেন যে সুযোগ বা সুবিধা পাইলেই তিনি একাকী দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া যাইতেন। কখনও কখনও তিনি একাদিক্রমে কয়েকদিন তথায় অবস্থান করিতেন। উত্তর-কালে এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার অন্তরঙ্গগণের মধ্যে কাহাকে কাহাকেও বলিয়াছিলেন,—"আমাকে পাইলে আত্মহারা হইয়া রাখালের ভিতর যে কিরূপ বালকভাবের আবেশ হইত তাহা বলিয়া বুঝাইবার নহে। তখন যে-ই তাহাকে ঐরূপ দেখিত সে-ই অবাক হইয়া যাইত। আমিও ভাবাবিষ্ট হইয়া তাহাকে ক্ষীর, ননী খাওয়াইতাম, খেলা দিতাম। কত সময়ে কাঁধেও উঠাইয়াছি! তাহাতে তাহার বিন্দুমাত্র সঙ্কোচের ভাব আসিত না!" শ্রীরাম-কৃষ্ণের সহিত রাখালের এই বালকবৎ ব্যবহারে মনে হইত যে মাতৃহারা সন্তান যেন আবার তাহার স্নেহময়ী জননীর দর্শন পাইয়াছে। নিরুদ্ধ প্রেমনির্ঝর যেন সহসা উৎসারিত হইয়া প্রবল বেগে ধাবিত হইল অনন্ত সমুদ্রের দিকে। অন্য কোনদিকে তাঁহার আর দৃষ্টি ছিল না। কখনও বিদ্যালয় হইতে, কখনও বা কলিকাতার বাসগৃহ হইতে ব্যাকুলচিত্তে রাখাল দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া যাইতেন। তিনি যে বিবাহিত ও দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন যুবক,

তিনি যে বিদ্যালয়ের ছাত্র ও সম্ভ্রান্ত জমিদার-বংশের সন্তান, শ্রীরাম-কৃষ্ণের মূর্তি মনে উদিত হইলে তাঁহার ঐ সমুদয় স্মৃতি বিলুপ্ত হইত এবং ভাবে আবিষ্ট হইয়া তিনি তাঁহার দিব্য শিশু-সত্তায় মগ্ন হইতেন। এই দিব্য বালক দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেন যে শ্রীরাম-কৃষ্ণ তাঁহার অনন্তস্নেহরূপিণী জননী, অনন্ত পীযূষধারায় তাঁহাকে সিক্ত করিতেছেন। মাতা ও পুত্র—এই সত্তাই যেন একমাত্র সত্য, জগতে আর কিছুরই অস্তিত্ব নাই, এই ভাবাবেশেই দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হইতে রাখালের আর কোথাও যাইবার সামর্থ্য ছিল না। এমন কি তাঁহার মনে অন্য কোন স্মৃতিরও উদয় হইত না।

এইরূপে তিনি আবিষ্ট হইয়া দক্ষিণেশ্বরে প্রায়ই বাস করিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার কলিকাতার অভিভাবক শ্যামলাল সেন মহাশয় বিশেষ উদ্বিগ্ন হইলেন। তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া রাখালের প্রায়ই বিদ্যালয়ে ও গৃহে অনুপস্থিতি এবং দক্ষিণেশ্বরে ধারা-বাহিকভাবে অবস্থিতির কথা আনন্দমোহনকে সবিস্তারে জানাইয়া দিলেন। সেই সংবাদ পাইয়া রাখালের পিতা ত্বরায় কলিকাতায় চলিয়া আসিলেন। তিনি আসিয়া রাখালকে অত্যন্ত তিরস্কার করিলেন বটে কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হইল না। রাখালের এখন অন্য সঙ্গী বা আত্মীয়-পরিজন ভাল লাগিত না। গৃহে সাংসারিক আবহাওয়ায় তাঁহার প্রাণ অতিষ্ঠ হইয়া উঠিত। শ্রীরামকৃষ্ণের মধুর মূর্তি, তাঁহার অপার্থিব অসীম স্নেহ, তাঁহার অলৌকিক দিব্য ভাবরাশি রাখালের হৃদয় জুড়িয়া থাকিত। রাখালের অন্তরের সকল পিপাসা, সকল ক্ষুধা এবং সকল আকাঙ্ক্ষাই পরিতৃপ্ত হয় শ্রীরামকৃষ্ণের অভয় ক্রোড়ে ও শান্তিময় আশ্রয়ে। সেইভাবেই আবিষ্ট হইয়া তিনি

পূর্ব্ববৎ দক্ষিণেশ্বরে গিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। পিতার ক্রোধ ও আরক্তচক্ষু বা কঠোর শাসনবাক্য তাঁহাকে কিছুমাত্র বিচলিত করিতে পারিল না।

আনন্দমোহন রাখালের ঈদৃশ আচরণে বিশেষ ক্ষুব্ধ ও উদ্বিগ্ন হইলেন। তাঁহার আত্মীয়-বান্ধবেরা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিতে লাগিলেন যে রাখাল পড়াশুনায় একেবারে অমনোযোগী—বিদ্যালয়ে প্রায়ই অনুপস্থিত থাকে এবং অভিভাবক বা গুরুজনদিগকে অণুমাত্র সমীহ করে না। ইহার শাসন আবশ্যক। আনন্দমোহন এইসব শুনিয়াও মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন—"তাই ত, রাখালের একি বিসদৃশ ব্যবহার! আমার আদেশ পালন করা দূরে থাক্—আমার নিষেধ ও শাসনবাক্য সে অনায়াসে উপেক্ষা করতে সাহসী হয়! একি অস্বাভাবিক ব্যাপার! সদ্যবিবাহিত যুবক কোথায় শ্বশুর বাড়ীতে গিয়ে আমোদ-আহ্লাদ করবে, নিজের সুন্দরী যুবতী স্ত্রীর প্রতি প্রবল আকর্ষণ থাকবে—এই ত সচরাচর সংসারে স্বভাবতঃ ঘটে থাকে। আমার অদৃষ্টে একি জঞ্জাল উপস্থিত হল? কোনদিকে লক্ষ্য নেই—আমি এসেছি আমাকেও গ্রাহ্য নেই—শুধু দক্ষিণেশ্বরের দেবালয়ে নিরক্ষর একজন পরমহংসের কাছে রাতদিন পড়ে রয়েছে! রাখালের বুদ্ধিশুদ্ধি কি একেবারে লোপ পেয়েছে? যদি এখন এর প্রতিরোধ না করা যায় তবে ছেলেটা একেবারে উচ্ছন্ন যাবে। লেখাপড়া ত শিখতেই পারবে না, হয়ত বিবাগী হয়ে অবশেষে সারা-জীবন দুঃখকষ্টে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে বেড়াবে। এই দুর্ম্মতির দমন একান্ত আবশ্যক।" আবার তিনি ভাবিতে লাগিলেন—"এদিকে ত দেখছি রাখাল চরিত্রবান শান্ত ও নিরীহ। কথাবার্ত্তায় আদৌ

উদ্ধত বা দুর্বিনীত নয়। পোষাক-পরিচ্ছদে কোনরূপ বিলাসিতা নেই এবং যতদূর সন্ধান করে জেনেছি—তাতে সে কোন কুসঙ্গে মেলামেশা করে না। 'ধর্ম্ম' 'ধর্ম্ম' করেই তার এই সাময়িক উন্মাদনা বা বিভ্রম হয়েছে। কিছুদিন তাকে দক্ষিণেশ্বরে বা অন্য কোথাও যেতে না দিলেই আবার তার স্বাভাবিক বুদ্ধি ফিরে আসবে।" তাই আনন্দমোহন স্থির করিলেন যে পুত্রকে কয়েক দিন গৃহে আবদ্ধ রাখিবেন এবং সদুপদেশ দ্বারা তাহার এই দুর্ম্মতির পরিবর্ত্তন করাইবেন। রাখাল দক্ষিণেশ্বর হইতে ফিরিয়া আসিলে আনন্দমোহন কর্কশবাক্যে তাহাকে কঠোর শাসন করিয়া অবিলম্বে গৃহমধ্যে আবদ্ধ করিলেন।

পিতার রুদ্ধকক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের কথা স্মরণ হইলেই রাখাল বিষণ্ণ ও বিহ্বল হইয়া পড়িতেন। তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিত এবং মনে মনে একটা তীব্র আকর্ষণ অনুভব করিতে লাগিলেন। কিন্তু নিরুপায়! এদিকে শ্রীরামকৃষ্ণও তাঁহার স্নেহের গোপালকে না দেখিয়া বৎসহারা গাভীর ন্যায় ব্যাকুল হইলেন। অবশেষে একদিন তিনি অশ্রুপূর্ণনেত্রে ভবতারিণীর মন্দিরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া শ্রীশ্রীজগন্মাতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—"মা, রাখালকে না দেখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। মা, আমার রাখালকে এনে দাও।" জগন্মাতা আত্মভোলা দুলালের প্রার্থনা পূর্ণ করিলেন।

একদিন আনন্দমোহন স্বীয় কক্ষে বসিয়া বিষয়সংক্রান্ত মকদ্দমার কাগজপত্র মনোনিবেশ করিয়া দেখিতেছেন, সম্মুখে রাখালকে বন্দীর মত বসাইয়া রাখিয়াছেন। আবদ্ধ রাখাল হঠাৎ পিতার দিকে তাকাইয়া দেখিলেন যে তাঁহার পিতা কাগজপত্র দেখিতে দেখিতে

একেবারে নিবিষ্ট, আর কোন দিকে লক্ষ্য নাই। রাখাল বুঝিলেন যে পলাইবার এই উত্তম সুযোগ। তিনি অতি ধীরে মৃদুপদসঞ্চারে গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। আনন্দমোহন পুত্রের বহির্গমনের কথা জানিতে পারিলেন না। রাখালও আর মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব না করিয়া একেবারে দক্ষিণেশ্বরের দিকে ধাবিত হইলেন। তথায় গিয়া রাখাল দেখিলেন যে শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যাকুলভাবে উদ্বিগ্নচিত্তে তাঁহার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। হর্ষ-বিহ্বলচিত্তে মিলিত হইয়া উভয়ের অন্তরের রুদ্ধভাবস্রোত প্রবাহিত হইল।

আনন্দমোহন মকদ্দমায় বিশেষ ব্যস্ত থাকায় অবিলম্বে পুত্রের সন্ধান লইতে পারিলেন না। যে মকদ্দমা লইয়া তিনি এত ব্যস্ত ছিলেন তাহাতে জয়লাভের কোন সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু দৈবক্রমে অপ্রত্যাশিতভাবে তাঁহার জয় হইল। তখন তাঁহার খেয়াল হইল যে রাখালকে দক্ষিণেশ্বর হইতে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। তিনি পথে যাইতে যাইতে ভাবিলেন—হয়ত পুত্রের সাধুসঙ্গের ফলে তাঁহার মকদ্দমায় জয়লাভ হইয়াছে। পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিলে পিতা কি তাহার ফলভাগী হয় না? রাখালের সৌম্যমধুর মূর্ত্তি পিতৃহৃদয়ে ক্ষণে ক্ষণে উদিত হইতে লাগিল। তিনি ভাবিলেন যে, "আহা! রাখাল যে আজন্ম কত স্নেহে, কত আদর যত্নে ও ভোগবিলাসে বর্দ্ধিত হয়েছে! সে যে তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর জীবন্ত স্মৃতি। না জানি রাসমণির দেবালয়ে সাধুর নিকটে সে কত কষ্ট পাচ্ছে! সেখানে কে তাহার যত্ন করবে? তার ভবিষ্যজীবনের উন্নতির অন্তরায়—তার ভাবী সংসারের প্রতিবন্ধক—এই ধর্ম্মোন্মত্ততা! তাকে দক্ষিণেশ্বর হতে ফিরিয়ে এনে যে প্রকারেই হোক তার মনের গতি পরিবর্ত্তন করতে হবে।"

দূর হইতে আনন্দমোহনকে দেখিয়াই শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝিতে পারিলেন যে আগন্তুক রাখালের পিতা। তিনি রাখালকে ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে রাখাল, ঐ তোর বাপ আসছে বুঝি—দেখ দেখি।" রাখাল সম্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলেন যে সত্যই তাঁহার পিতা এতদিন পরে আসিতেছেন। তিনি ভীত ও আতঙ্কিত হইলেন পাছে তাঁহাকে গৃহে ফিরিয়া যাইতে হয়। রাখাল কোথাও লুকাইয়া থাকিতে চাহিলেন। রাখালের মনোভাব লক্ষ্য করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে অভয় দিয়া বলিলেন, "ভয় কি? বাপ-মা প্রত্যক্ষ দেবতা। তোর বাপ এলে তুই বেশ ভক্তি করে প্রণাম করবি। মার ইচ্ছা হলে কি না হতে পারে?" এই কথা বলিতে না বলিতে আনন্দমোহন তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপনীত হইলেন। শ্রীরামকৃষ্ণও পরম সমাদরে তাঁহাকে নিকটে বসাইলেন। ঠাকুরের নির্দ্দেশমত রাখালও শ্রদ্ধা-সহকারে পিতার পদধূলি গ্রহণ করিলেন। পুত্রের বিনীতভাব দেখিয়া আনন্দমোহনের পিতৃহৃদয় বিগলিত হইল। তিনি পরম স্নেহপূর্ণ নয়নে পুত্রকে দেখিতে লাগিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার নিকট রাখালের অজস্র প্রশংসা করিলেন। আনন্দমোহন মন্ত্রমুগ্ধবৎ তাঁহার কথামৃত পান করিয়া আত্মহারা হইয়া পড়িলেন এবং রাখালের প্রতি শ্রীরাম-কৃষ্ণের অগাধ স্নেহ ভালবাসা ও আদর যত্ন দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। এই অদ্ভুত মহাপুরুষের নিকট হইতে বলপূর্ব্বক পুত্রকে ফিরাইয়া লইয়া যাইতে তাঁহার সাহস হইল না। রাখালের উৎফুল্ল মুখ, প্রীতি-পূর্ণ হাসি এবং বিনয়নম্র ব্যবহার দেখিয়া তিনি বুঝিলেন রাখাল পুত্রাধিক আদর যত্নে এখানে রহিয়াছে। শুধু প্রত্যাগমনকালে আনন্দমোহন শ্রীরামকৃষ্ণকে মিনতিপূর্ব্বক প্রার্থনা জানাইলেন যে

রাখালকে যেন তাঁহার নিজ ইচ্ছানুযায়ী বাড়ীতে পাঠাইয়া দেন। বিষয়ী ও সংসারী আনন্দমোহন ভাবিলেন যে এইরূপ অলৌকিক শক্তিশালী সাধুর আশীর্ব্বাদে তাঁহার পুত্রের ও বংশের সম্যক্ কল্যাণ হইবে। বিশেষতঃ তাঁহার ধারণা হইল যে এই মহাপুরুষের কৃপাতেই সম্প্রতি তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে মকদ্দমা জিতিয়াছেন। ঈদৃশ মহাত্মার বিরাগভাজন হওয়া বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নয়। তিনি নিশ্চিত-ভাবে ও প্রশান্তহৃদয়ে কলিকাতায় একাকী ফিরিয়া আসিলেন। পিতা চলিয়া গেলে রাখাল বিস্ময়-বিহ্বলচিত্তে আনন্দসাগরে ভাসমান হইলেন। রাখালের দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে মাঝে মাঝে গৃহে পাঠাইয়া দিতেন। রাখাল সেই সময়ে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে তিনি পিতার ভুক্তাবশেষপাত্রে বা পিতার উচ্ছিষ্ট কি খাইতে পারেন? শ্রীরামকৃষ্ণ অমনি তাঁহাকে বলিয়া-ছিলেন—"সে কি রে? তোর কি হয়েছে যে তোর বাবার পাতে খাবি না? মা-বাপ কি কম জিনিষ! তাঁরা প্রসন্ন না হলে ধর্ম্মটর্ম্ম কিছুই হয় না। চৈতন্যদেব ত প্রেমে উন্মত্ত, তবু সন্ন্যাসের আগে কতদিন ধরে মাকে বোঝান। বল্লেন—মা, আমি মাঝে মাঝে এসে তোমাকে দেখা দিব।"

শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশে রাখাল মাঝে মাঝে বাড়ীতে গেলে আনন্দ-মোহন তাঁহাকে কৌশলে সংসারে আবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেন। পড়াশুনা ত্যাগ করিয়া রাখাল দিনরাত্রি দক্ষিণেশ্বরে থাকিবে, ইহা আনন্দমোহনের আদৌ মনঃপূত নহে। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "রাখালের বাপ পাছে এখানে না আসিতে দেয়, সেজন্য কত বলিয়া বুঝাইয়া রাখালকে এক একবার বাড়ীতে পাঠাইতাম।

বাপ জমিদার—অগাধ পয়সা, কিন্তু বড় কৃপণ ছিল; প্রথম প্রথম নানারূপ চেষ্টা করিয়াছিল যাহাতে ছেলে এখানে আর না আসে; পরে যখন দেখিল, এখানে ধনী, বিদ্বান লোক সব আসে, তখন আর ছেলের আসায় আপত্তি করিত না। ছেলের জন্য কখন কখন এখানে আসিয়াও উপস্থিত হইয়াছিল। তখন রাখালের জন্য তাহাকে বিশেষ আদর-যত্ন করিয়া সন্তুষ্ট করিয়া দিয়াছিলাম।"

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে রাখালের শ্বশুরবাড়ী ঠাকুরের ভক্ত পরিবার। মনোমোহন, তাঁহার মাতা, স্ত্রী ও ভগ্নীরা মাঝে মাঝে ঠাকুরকে দর্শন করিতে দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতেন। রাখাল ঠাকুরের নিকট দিনরাত্রি যাপন করিতেন শুনিয়া তাঁহারা কোন আপত্তি করিতেন না। কিন্তু কয়েকদিন পরে মনোমোহনের মাতা রাখালের বালিকা-বধূকে সঙ্গে লইয়া দক্ষিণেশ্বরে গমন করেন। রাখালকে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার কোন গোপন অভিপ্রায় ছিল কিনা তাহা কে বলিবে? কিন্তু সেদিন ঠাকুরের মনে সহসা এক প্রশ্ন উদয় হইল—"বধূর সংস্পর্শে আমার রাখালের ঈশ্বরভক্তির হানি হবে না ত?" এই সংশয়ের নিরসনকল্পে তিনি সেই বালিকাবধূকে নিজের কাছে আনাইয়া আপাদমস্তক, কেশরাশি ও শারীরিক গঠনভঙ্গী তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতে লাগিলেন। ঠাকুর সকল লক্ষণ পরীক্ষা করিয়া বুঝিলেন, "ভয়ের কোন কারণ নেই—দেবীশক্তি। স্বামীর ধর্ম্মপথের অন্তরায় কখনও হবে না।" তখন হৃষ্টচিত্তে ঠাকুর নহবতে শ্রীশ্রীমাতা-ঠাকুরাণীকে বলিয়া পাঠাইলেন, "টাকা দিয়ে যেন পুত্রবধূর মুখ দেখে।"

দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে রাখালের প্রধান কাজ ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা। তিনি কখনও তাঁহার পদসেবা করিতেন, কখনও স্নানার্থে

তৈলমর্দ্দন করিয়া দিতেন, পরিধেয় বস্ত্রাদি গুছাইয়া রাখিতেন এবং তাঁহার সমাধিমগ্নাবস্থায় সযত্নে তাঁহার দেহ রক্ষা করিতেন। আবার শ্রীরামকৃষ্ণের প্রমত্তভাবে বিচরণকালে তাঁহার অঙ্গধারণ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া দিতেন, "ঐখানে সিঁড়ি", "এইখানে উঁচু", "ঐখানটায় নীচু" এবং ঠাকুরও তাঁহার নির্দ্দেশমত পদক্ষেপ করিয়া গম্যস্থানে চলিয়া যাইতেন। ভাবনিধি ঠাকুরের শ্রীঅঙ্গে যাহাতে কোন আঘাত না লাগে তাহার প্রতি রাখালকে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইত। তাঁহার ত্যাগী অন্তরঙ্গ ভক্তদের মধ্যে রাখালই সর্ব্বপ্রথম দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট থাকিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। রাখালের দক্ষিণেশ্বরে অনুপস্থিতিকালে তাঁহার বাল্যবন্ধু বাবুরাম মধ্যে মধ্যে ঠাকুরের সেবা করিতেন।

রাখাল যখন শ্যামপুকুরে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত "মেট্রোপলিটান" শাখা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেন তখন তাঁহার সহাধ্যায়ী ছিলেন বাবুরাম ঘোষ (বাবুরাম মহারাজ বা স্বামী প্রেমানন্দ)। ইঁহার সহিত সখ্যসূত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের বিষয় লইয়া রাখাল আলাপ-আলোচনা করিতেন। বাবুরামও ইতিপূর্ব্বে শ্রীরামকৃষ্ণের নাম শ্রবণ করিয়াছিলেন। ঠাকুরের প্রিয় ভক্ত বলরাম বসু মহাশয় বাবুরামের ভগ্নীপতি। কিন্তু বলরাম বাবুর গৃহে তিনি সর্ব্বপ্রথমে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন করিবার সুযোগ পান নাই। রাখালই তাঁহাকে একদিন বিদ্যালয়ের ছুটীর পর দক্ষিণেশ্বরে লইয়া যান এবং শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে আবার আসিতে বলিলেন এবং বাবুরামও প্রেমোন্মত্ত সমাধিমগ্ন মহাপুরুষকে দেখিয়া বিশেষ আকৃষ্ট হইলেন। রাখাল বিদ্যালয় ত্যাগ করিলেও বাবুরাম প্রায়ই

শ্রীশ্রীঠাকুরকে দর্শনের জন্য দক্ষিণেশ্বরে আসিতেন এবং রাখাল ও বাবুরামের বন্ধুত্ব এইরূপে দিন দিন গভীর প্রীতির সম্বন্ধে আবদ্ধ হইল। বয়সে প্রায় দুই বৎসরের বড় বলিয়া রাখাল তাঁহাকে বাবুরামদাদা বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট রাখালের প্রায়ই আবেদন নিবেদন থাকিত এবং ঠাকুরের সহিত ইহা লইয়া তাঁহার কলহ ও মান অভিমান চলিত। কিন্তু কোন বিষয়ে কোন আচরণে সামান্য ত্রুটি দেখিলে ঠাকুর রাখালকে শাসন ও ভৎসনা করিতেন। এই সময়ের কথা উল্লেখ করিয়া ঠাকুর পরে তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তদের নিকট বলিয়াছিলেন যে, "অন্যায় করলে রাখালকে শাসনও করতাম। একদিন মা কালীর প্রসাদী মাখন এলে ক্ষিদে পাওয়ায় সে আপনি তা খেয়েছিল। তাতে বল্লাম, 'তুই তো ভারী লোভী, এখানে এসে কোথায় লোভ ত্যাগে যত্ন করবি, তা না করে আপনি মাখন নিয়ে খেলি?' সে ভয়ে জড়সড় হয়ে গিয়েছিল আর কখনও ঐরূপ করে নি।" এইখানেই রাখালের বিশেষত্ব। ঠাকুর যাহা একবার নিষেধ করিতেন অথবা কোন কিছু করিতে আদেশ দিতেন রাখাল যত্নের সহিত প্রাণপণে তাহা পালন করিতে চেষ্টা করিতেন। ইহাতে তাঁহার কোন দ্বিধা বা বিচার আসিত না।

বালভাবাপন্ন রাখাল একদিন শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া বলেন, "ভারি খিদে পেয়েছে"। সে সময়ে ঘরে খাবার ছিল না এবং তখনি পাইবারও উপায় নাই, কারণ কাছে কোনও দোকান ছিল না। রাখালের ক্ষুধার কথা শুনিয়া ঠাকুর গঙ্গার ধারে বাহির হইলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিতে লাগিলেন, "গৌরদাসী এস, আমার রাখালের

খিদে পেয়েছে।" ক্ষণকাল-মধ্যেই একখানি নৌকা আসিয়া চাঁদনীঘাটে লাগিল। নৌকা হইতে বলরামবাবুসহ কতিপয় ভক্ত ও গৌরদাসী খাবার হস্তে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঠাকুর ইহা দেখিয়া সানন্দে রাখালকে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিয়া বলিলেন, "আয়, খাবার খাবি আয়, খাবার এসেছে, তুই না খিদে পেয়েছে বলছিলি"। রাখাল একটু লজ্জিত ও রাগত ভাবে বলিলেন—"আমার খিদে পেয়েছে, আপনি ঢাক পেটাচ্ছেন।" ঠাকুর বলিলেন, "তাতে কি, তোর খিদে পেয়েছে—তোর খাবার চাই, একথা বললে দোষ কি? তুই এখন খা।"

এই সময়ে একদিন রাখাল বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিলেন যে, রাস্তায় একটি পয়সা পড়িয়া রহিয়াছে। মনে মনে তিনি ভাবিলেন যে বাজে কোন লোক উহা পাইলে অপব্যয় করিবে—তাহাপেক্ষা কোন অভাবগ্রস্ত ভিক্ষুক বা কানা খোঁড়াকে দান করিলে পয়সার সদ্ব্যবহার হইবে। এই ভাবিয়া তিনি পয়সাটি কুড়াইয়া লইলেন। ঠাকুরের নিকট রাখাল কোন কথা গোপন রাখিতেন না। বালক যেমন তাহার মাতার নিকট সকল কথা বলিয়া আনন্দ পায় রাখালও তেমনি ঠাকুরকে সরলভাবে সব বলিয়া আনন্দলাভ করিতেন। কিন্তু পয়সা কুড়াইয়া লইবার কথা শুনিয়া রাখালকে ঠাকুর ভৎ´সনার স্বরে বলিলেন, "যে মাছ খায় না সে মাছের বাজারেই বা যাবে কেন? তোর যখন নিজের কোন দরকার নেই তখন তুই কেন ঐ পয়সা ছুঁতে গেলি?"

একদিন রাখাল আবদার করিয়া ঠাকুরকে স্নানের জন্য তেল মাখাইতে মাখাইতে আধ্যাত্মিক অনুভূতির কোন উচ্চতর স্তরের উপলব্ধি প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু ঠাকুর উহাতে তখন

সম্মত হন নাই। রাখাল বারংবার তাহা চাহিতে লাগিলেন। অবশেষে ঠাকুর কোন মর্ম্মান্তিক কথা বলিয়া তাঁহার হৃদয়ের দ্বারে আঘাত করিলেন। রাখাল অভিমানে দক্ষিণেশ্বর ত্যাগ করিতে কৃত-সঙ্কল্প হইয়া হস্তস্থিত তেলের বাটি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া হন্ হন্ করিয়া ফটক পার হইয়া কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! ফটক পার হইয়া রাখালের পদদ্বয় যেন অকস্মাৎ অবশ হইয়া পড়িল, তিনি আর একপদও অগ্রসর হইতে পারিলেন না। নির্ব্বাক-বিস্ময়ে রাখাল সেইখানে বসিয়া পড়িলেন। সম্পূর্ণ নিরুপায়, কি করিবেন তিনি মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে, অপার করুণাসিন্ধু ঠাকুর রাখালকে ডাকিয়া আনিবার জন্য তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রামলালকে পাঠাইলেন। রাখাল আর কি করিবেন? অগত্যা তিনি ধীরপদে তাঁহার সম্মুখীন হইলে চিরক্ষমাশীল ঠাকুর হাসিতে হাসিতে কৌতুক করিয়া বলিলেন, "কি, গণ্ডী ছাড়িয়ে যেতে পারলি?" রাখাল ঠাকুরের অচিন্তনীয় শক্তি এবং অপার কৃপা ও ক্ষমার কথা স্মরণ করিয়া নীরবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। নিজের অক্ষমতা ও অপরাধ তিনি অন্তরে উপলব্ধি করিলেন। সেইদিন অপরাহ্ণে শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ (মাষ্টার মহাশয়) আসিয়া দেখিলেন যে ঠাকুর ছোট তক্তাপোষে ভাবাবিষ্ট হইয়া বসিয়া আছেন। নিকটে রাখাল নীরবে উপবিষ্ট। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি দেখিলেন ঠাকুর যেন মা জগদম্বার সহিত কথা বলিতেছেন, পরে সেই ভাবাবস্থায় তিনি রাখালকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, "তুই রাগ করেছিলি? তোকে রাগালুম কেন, এর মানে আছে। ঔষধ ঠিক পড়বে বলে। পীলে মুখ তুললে পর মনসার

পাতাটাতা দিতে হয়।" আবার বলিতেছেন, "ঈশ্বরীয় রূপ মানতে হয়। জগদ্ধাত্রী রূপের মানে জান? যিনি জগৎকে ধারণ করে আছেন। তিনি না ধরলে জগৎ পড়ে যায়—নষ্ট হয়ে যায়। মনকরীকে যে বশ করিতে পারে তারই হৃদয়ে জগদ্ধাত্রীর উদয় হয়।" রাখাল তদুত্তরে বলিলেন, "সিংহবাহিনীর সিংহ তাই হাতীকে জব্দ করে রয়েছে।"

আর একদিন অভিমান করিয়া রাখাল দক্ষিণেশ্বর হইতে চলিয়া যান। শ্রীরামকৃষ্ণ এই ঘটনার উল্লেখ করিয়া অধর সেনের বাড়ীতে রাখালকে বলিয়াছিলেন, "এখানকার শ্রাবণ মাসের জল নয়। শ্রাবণ মাসের জল হুড় হুড় করে আসে আবার বেরিয়ে যায়। এখানে পাতালফোঁড়া শিব, বসানো শিব নয়। তুই রাগ করে দক্ষিণেশ্বর থেকে চলে এলি, আমি মাকে বল্লুম, "মা, এর অপরাধ নিসনি।" অহেতুক কৃপাসিন্ধু ঠাকুরের আকর্ষণে রাখাল আবার দক্ষিণেশ্বরে গিয়া তাঁহার সেবায় প্রবৃত্ত হইলেন।

ইহার কিছুদিন পরে দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের পদসেবা করিতে করিতে রাখাল ভাবাবস্থায় বাহ্যসংজ্ঞা হারাইয়া ফেলেন। ঠাকুর পরে তাঁহার ভক্তদিগের নিকট প্রকাশ করিয়া বলিয়াছিলেন, "এইখানে বসে পা টিপতে টিপতে রাখালের প্রথম ভাব হয়েছিল। একজন ভাগবতের পণ্ডিত এই ঘরে বসে ভাগবতের কথা বলছিল। সেই সকল কথা শুনতে শুনতে রাখাল মাঝে মাঝে শিউরে উঠতে লাগল—তারপর একেবারে স্থির।"

শ্রীরামকৃষ্ণ আহারান্তে একদিন রাখালকে বলিয়াছিলেন, "ওরে রাখাল, পান সাজ না, পান নেই যে।" রাখাল সুস্পষ্ট উত্তর

দিলেন, "পান সাজতে জানি নি।" তাঁহার উত্তর শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "সে কি রে! পান সাজবি, তার আবার জানাজানি কি? যা, পান সেজে আন।" রাখাল আবার জবাব দিলেন, "পারব না মশায়।" রাখাল অবাধ্য হইতেছেন, তবুও শ্রীরামকৃষ্ণ হাসিয়া আকুল। তাঁহাকে অন্য কেহ সামান্য কিছু ফরমাশ করিলে শ্রীরামকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ তাহা নিবারণ করিয়া বলিতেন, "আহা, ও দুধের ছেলে, ওকে তোরা কোন কাজ করতে বলিস নি। ওর বড় কোমল স্বভাব।" এইরূপ নানাভাবে উভয়ের মধ্যে অপূর্ব্ব প্রীতির খেলা চলিতে লাগিল।

রাখালের আগমনের প্রায় ছয়মাসের পর নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে প্রথম শিমুলিয়ায় সুরেন্দ্রনাথের গৃহে দর্শন করেন। সেখানে রাখাল উপস্থিত ছিলেন। ঠাকুর শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত মহাশয় এবং সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের নিকট নরেন্দ্রনাথের আনুপূর্ব্বিক পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন এবং তাঁহাকে বারম্বার দক্ষিণেশ্বরে যাইবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিলেন। রাখাল লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, ঠাকুর নরেন্দ্রনাথের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছেন। অতঃপর নরেন্দ্র মধ্যে মধ্যে দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিতে আরম্ভ করেন; এবং এইভাবে পরস্পর সাক্ষাৎ হওয়াতে উভয়েই পরম প্রীতিলাভ করিতেন।

একদিন নরেন্দ্রনাথ দেখিলেন যে রাখাল ঠাকুরের পশ্চাদনুসরণ করিয়া দেব-দেবীবিগ্রহ দর্শন করিতে যাইতেছেন। তিনি সবিস্ময়ে দেখিলেন যে রাখালও শ্রীরামকৃষ্ণের মত প্রত্যেক বিগ্রহের সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিতেছেন। তাঁহার এইরূপ আচরণ দেখিয়া নরেন্দ্রনাথ মনে মনে ক্ষুণ্ণ হইলেন। রাখাল ফিরিয়া

আসিলে নরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে অন্তরালে ডাকিয়া লইয়া তীব্র ভর্ৎসনা ও অনুযোগের সহিত ব্রাহ্মসমাজের প্রতিজ্ঞাপত্রে তাঁহার স্বাক্ষরের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। রূঢ়ভাষায় তিনি বলিলেন, "ব্রাহ্ম-সমাজের অঙ্গীকারপত্রে সই করে আবার মন্দিরে গিয়ে দেবদেবীর মূর্তিকে প্রণাম করছ, এতে তোমার কপট আচরণ করা হচ্ছে।" রাখাল নীরবে দাঁড়াইয়া সব শুনিলেন। তিনি কোন বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিলেন না। শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্যস্পর্শে তাঁহার পূর্ব্ব সংস্কার ও সংশয় তিরোহিত হইয়াছে তাহা তিনি কি করিয়া নরেন্দ্রনাথকে বুঝাইবেন? বুদ্ধিমান, বিদ্বান ও তেজস্বী নরেন্দ্রনাথকে কি করিয়া বুঝাইবেন যে এখন শুধু পূর্ব্বের মত একমাত্র অদ্বিতীয় নিরাকার সগুণ ব্রহ্মে তিনি বিশ্বাসী নহেন,—শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপায় এখন তিনি অন্তরে উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন যে নিরাকারও যেমন সত্য, সাকারও তেমনি সত্য। সেই অখণ্ড সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের কে "ইতি" করিবে?

রাখাল কোমল প্রকৃতিবিশিষ্ট ছিলেন এবং নরেন্দ্রনাথকে খুবই সমীহ করিতেন। এই ঘটনার পর রাখাল নরেন্দ্রনাথের সম্মুখীন হইতে ভীত ও সঙ্কুচিত হইতেন। ইহা শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টি এড়াইল না। একদিন তিনি নরেন্দ্রনাথকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। নরেন্দ্রনাথও আনুপূর্ব্বিক সমুদায় ব্যাপার ঠাকুরকে জানাইলেন। তীব্র অনুযোগের সহিত নরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে বলিলেন, "কেন সাধারণ সাকারবাদীদের মত রাখাল মন্দিরে গিয়ে দেবদেবীর বিগ্রহকে গড় হয়ে প্রণাম করবে? কেন এই মিথ্যা আচরণ?" শান্তভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রনাথকে সস্নেহে বলিলেন, "ভাখ্, রাখালকে আর

কিছু বলিসনি। সে তোকে দেখলেই ভয়ে জড়সড় হয়। তার এখন সাকারে বিশ্বাস হয়েছে তা কি করবে বল? সকলেই কি একেবারে গোড়া থেকে নিরাকারে বিশ্বাস করতে পারে?" স্বাধীনচিত্ত নরেন্দ্রনাথ কাহারও স্বাধীনভাবে মত পরিবর্ত্তনের কথা শুনিলে তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করিতে জানিতেন। ঠাকুরের কথায় তিনি বুঝিলেন, সত্য সত্যই রাখাল এখন সাকারে বিশ্বাসী এবং তাহাকে মিথ্যাচারী সন্দেহে তিরস্কার করা তাঁহার সমুচিত কার্য্য হয় নাই। অতঃপর রাখালকে দেখিলে তিনি আর কোন অনুযোগ বা দোষারোপ করিতেন না। দুই বন্ধু আবার সহজ প্রীতির বন্ধনে মিলিত হইলেন।

দক্ষিণেশ্বরে নরেন্দ্রনাথ ও রাখালের পরস্পর দুইজনের সাক্ষাৎ হইলে মাঝে মাঝে উভয়ের মধ্যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে নানাবিধ আলোচনা চলিত। নরেন্দ্রনাথ স্বভাবতঃ বিনা যুক্তিবিচারে বা বিশেষ পরীক্ষা ব্যতীত কোন বিষয় গ্রহণ করিতে পারিতেন না। স্বাধীন ও তীক্ষ্ণ বিচারশীল মনে কোন নূতন ভাব দেখিলেই বা কোন নূতন তত্ত্ব শুনিলে তাঁহার মতের সহজে পরিবর্ত্তন হইত না। তিনি যতক্ষণ তাহা বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়া ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত না হইতেন এবং নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে কোন ভাবকে নিজের বোধের সীমায় না আনিতে পারিতেন ততক্ষণ কোন তত্ত্ব বা ভাবকে তিনি প্রশ্রয় দিতেন না। এমন কি ঠাকুরকে বারম্বার দর্শন করিয়াও প্রথম প্রথম তাঁহার মন তাঁহার সব মত, সিদ্ধান্ত ও ভাবে সায় দিতে পারে নাই। ঠাকুর বলিতেন, "রাখালের সাকারের ঘর, নরেন্দ্রনাথের নিরাকারের।" তাই ঠাকুরের অপূর্ব্ব ভাবোন্মত্ততা, প্রবল প্রেমানুরাগে নানা অলৌকিক দর্শনাদি ও

ভাবের আস্বাদন রাখালের হৃদয় স্পর্শ করিত। কিন্তু নরেন্দ্র যুক্তি সহায়ে উহাকে ভাব-বিলাসিতার অঙ্গ এবং হৃদয়াবেগের স্তর মাত্র বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতেন। শান্তস্বভাব রাখাল তেজস্বী ও বিদ্বান নরেন্দ্রনাথের নিকট কোন প্রতিবাদ বা তর্ক করিতে সাহসী হইতেন না। অনেক স্থলে রাখালের কোমল ও সরল মন তাঁহার সতেজ যুক্তিপূর্ণ সিদ্ধান্তে বা মতামতে প্রভাবান্বিত হইয়া পড়িত। নরেন্দ্রনাথের কথায় রাখালের মনে ক্রমে সংশয়ের উদয় হইল। তিনিও প্রেমোন্মত্ততা এবং ভাবের আবেশ বা প্রকাশকে নরেন্দ্রনাথের মত ভাব-বিলাসিতাই বলিয়া বোধ করিবার প্রয়াস পাইতেন।

এই সময়ে একদিন তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের মহাভাব দেখিয়া স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইলেন। কীর্ত্তনে বৈষ্ণব মহাজনদের রচিত পদাবলী শুনিতে শুনিতে ঠাকুর ভাবের আবেগে তাঁহার শ্রীঅঙ্গ হইতে গায়ের জামা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন, মহাভাবে ঘন ঘন কাঁপিতে লাগিলেন, এবং রাধাভাবে ভাবিত হইয়া তিনি করুণকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "প্রাণনাথ হৃদয়বল্লভ কৃষ্ণকে তোরা এনে দে, সুহৃদের কাজ তো বটে, হয় এনে দে না হয় আমায় নিয়ে চল—তোদের চিরদাসী হব।" ঠাকুরের এই মহাভাবের অবস্থা রাখাল অনিমিষ লোচনে ও একাগ্রমনে দেখিতেছিলেন। ঠাকুরের সেই বিরহভাবে উদ্দীপ্ত গদগদ কণ্ঠস্বর এবং সেই অশ্রুকম্প সাত্ত্বিকাদি ভাবের স্ফুরণ দেখিয়া রাখালের মন প্রেমে বিগলিত হইল। রাখাল অন্তরে অন্তরে বুঝিলেন—ইহা নরেন্দ্র-কথিত ভাব-বিলাসিতা নয় কিংবা মানসিক বা স্নায়বিক দুর্ব্বলতা হইতে ইহার উৎপত্তি নয়—ইহা গভীর আধ্যাত্মিক প্রেমের বহিঃপ্রকাশ।

দেখিতে দেখিতে এমনিভাবে প্রায় দুই বৎসর কাটিয়া গেল। রাখাল দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের কাছে বাস করিতেছেন। শ্বশুরবাড়ী হইতে রাখালের মাঝে মাঝে নিমন্ত্রণ আসিত কিন্তু তিনি উহা রক্ষা করা দূরে থাক আদৌ তাহা কানে তুলিতেন না। শ্রীযুত মনোমোহন ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিতেন কিন্তু রাখাল তাঁহার সহিত কোন আত্মীয়তা বা ঘনিষ্ঠতা দেখাইতে উদাসীন থাকিতেন। পরিণীতা স্ত্রীরও তিনি কোন খোঁজ খবর রাখিতেন না। রাখালের ঈদৃশ আচরণে তাঁহার শাশুড়ী শ্যামাসুন্দরীর নিকট তাঁহার আত্মীয়স্বজনেরা প্রায়ই আক্ষেপ করিয়া বলিতেন, "তোমার জামাই কি শেষে সন্ন্যাসী হয়ে যাবে? তাকে ঘরে ফিরিয়ে আনবার তো তুমি কোনই চেষ্টা করছ না! মেয়ের দিকে একবার তাকিয়ে দেখ।" তাহাতে তিনি উত্তর দিতেন, "কি আর করব বল? জামাই সাধু হবে—সে তো ভাগ্যের কথা!" শ্যামাসুন্দরী পরমা ভক্তিমতী হইলেও নানা ভাবের আলাপ-আলোচনা শুনিয়া সহসা তাঁহার মনের পরিবর্তন হইল। তিনি জামাতাকে সংসারে ফিরাইয়া আনিবার জন্য একদিন যৌবনোন্মুখী কন্যাকে সঙ্গে লইয়া দক্ষিণেশ্বরে গমন করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণগত-প্রাণ রাখাল যে আকর্ষণে তন্ময় ও আত্মহারা, যে আকর্ষণে তিনি জগতের অপর কোন বিষয়ে চিন্তা করিতে অক্ষম, যে আকর্ষণে তিনি দক্ষিণেশ্বর ছাড়িয়া অন্যত্র যাইতে অনিচ্ছুক, সে আকর্ষণের নিকট শ্যামাসুন্দরীর সকল প্রয়াস ব্যর্থ হইল। শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মুখেই তাঁহারা কোন্নগরে তাঁহাদের সঙ্গে রাখালকে যাইতে বারংবার অনুরোধ করিলেও রাখাল তাহা দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান

করিয়াছিলেন। এই দিনের ঘটনা উল্লেখ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ পরে তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তদের নিকট বলিয়াছিলেন, "রাখাল এখন ঘরের ছেলের মত আছে, জানি আর ও আসক্ত হবে না, বলে 'সব আলুনি লাগে।' ওর পরিবার এখানে এসেছিল, বয়স চৌদ্দ বৎসর। এখান হয়ে কোন্নগরে গেল, তারা ওকে কোন্নগরে যেতে বল্লে—ও গেল না। বলে, 'আমোদআহ্লাদ ভাল লাগে না'।"

রাখালের এই অনাসক্ত ভাব সত্ত্বেও শ্রীরামকৃষ্ণ সূক্ষ্মদৃষ্টি-সহায়ে জানিতে পারিলেন যে রাখালের ভোগের একটু বাকী আছে। এই প্রসঙ্গে তিনি তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তদের নিকট পরে বলিয়াছেন, "সে যে আমার উপর সব নির্ভর করেছিল বাড়ী ঘর সব ছেড়ে। তার পরিবারের কাছে—তাকে আমিই পাঠিয়ে দিতাম—একটু ভোগ বাকী ছিল।" চরম অনুভূতি লাভ করিতে হইলে ভোগের সম্পূর্ণ ক্ষয় হওয়া প্রয়োজন। তাই ঠাকুর রাখালকে মাঝে মাঝে তাঁহার স্ত্রীর নিকট পাঠাইয়া দিতেন। রাখাল ইহাতে আপত্তি করিলেও ঠাকুরের আদেশে বাধ্য হইয়া তাঁহাকে গৃহে যাইতে হইত। কিন্তু তাঁহাকে বাড়ীতে পাঠাইয়া হৃতশাবক বিহঙ্গের ন্যায় তিনি ছটফট্ করিতেন। রাখালও গৃহে যাইয়া তিষ্টিতে পারিতেন না। যত শীঘ্র সম্ভব দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিতেন। ঠাকুর তাঁহাকে নানাবিধ প্রশ্ন করিয়া জানিতেন রাখাল গৃহে গিয়া তাঁহার স্ত্রীর সহিত কিরূপ ব্যবহারাদি করিতেন।

রাখাল গৃহে যাইতে প্রথম প্রথম বিশেষ আপত্তি জানাইলেও পরে ঐ বিষয়ে আর কোনরূপ দ্বিরুক্তি করিতেন না। ক্রমে

ক্রমে তিনি গৃহে গিয়া দুই চারি দিন থাকিয়া যাইতেন। এইরূপ-ভাবে একাদিক্রমে কয়েকদিন গৃহে বাস করায় তাঁহার পিতা ও আত্মীয়-স্বজনেরা আশান্বিত হইয়া রাখালকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করাইয়া সংসারে আবদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইলেন। রাখাল লোকপরম্পরায় তাহা শুনিতে পাইয়া দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরকে সমুদায় নিবেদন করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ শুনিয়া বলিলেন, "ঈশ্বরের জন্য গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়ে মরেছিস্ একথা বরং শুনব, তবু কারুর দাসত্ব করিস, চাকরি করিস এ কথা যেন না শুনি।" গৃহে ফিরিয়া গেলে যখন রাখালের নিকট সত্যসত্যই চাকরি গ্রহণ করিবার প্রস্তাব উত্থাপিত হইল তখন তিনি সতেজে বলিয়া উঠিলেন, "হাজার টাকা মাইনে দিলেও কখন চাকরি করব না।" তাঁহার এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ভাব দেখিয়া তাঁহার পিতা ও আত্মীয়-স্বজনেরা এবিষয়ে আর অগ্রসর হইতে সাহসী হইলেন না। তাঁহাদের আশঙ্কা হইল যে বেশী পীড়াপীড়ি করিলে রাখাল একেবারে গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে।

রাখাল গৃহে যাতায়াত করিতে করিতে বিশ্বেশ্বরীর সহিত সহজভাবেই মেলামেশা করিতে লাগিলেন। বালকের যেমন স্বভাবতঃ কোন বিষয়ে আঁট বা আসক্তি থাকে না কিন্তু নিকটে যাহা পায় তাহা লইয়াই তাহার একটা ক্ষণিক আকর্ষণ বা আনন্দ, তেমনি এক্ষেত্রে রাখালেরও তাহাই ঘটিল। গৃহে একাদিক্রমে অবস্থিতি ক্রমশঃ দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর হইতে লাগিল। তখন সুযোগ বুঝিয়া আত্মীয়-স্বজন ও সমবয়স্ক পরিচিত বন্ধু-বান্ধবেরা প্রায়ই তাঁহাকে বলিত—"তুমি নিজে যা ইচ্ছে তা করতে

পার কিন্তু স্ত্রীর প্রতি ন্যায়তঃ ও ধর্ম্মতঃ একটা দায়িত্ব আর কর্ত্তব্য আছে তা অস্বীকার করতে পার না।" এই সব কথা রাখাল ঠাকুরকে জানাইয়া সরলভাবে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "আমার পরিবারের কি হবে?" রাখালের কথা শুনিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ নিরুত্তর রহিলেন। রাখাল গৃহে ফিরিয়া ঠাকুরের এই মৌনভাব লইয়া মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, "কৈ, তিনি ত আজ আমার কথায় কোন জবাব দিলেন না! কেন তাঁর এই নীরবতা? তিনি যে আমার একান্ত আশ্রয় ও গতি। তাঁর উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে আমি চলেছি। এই যে কঠিন সমস্যা, তার তো কোনই সমাধান করলেন না! এখন উপায় কি?" গভীরভাবে বিষণ্নহৃদয়ে এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে দুই একদিন কাটিয়া গেলে রাখাল দেখিতে পাইলেন সহসা তাঁহার সম্মুখ হইতে একটি যবনিকা অপসারিত হইয়া যাইতেছে! তিনি মহামায়ার স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেমোজ্জ্বল মধুর মূর্ত্তি তাঁহার হৃদয়পটে স্পষ্টতররূপে জাগিয়া উঠিল। তিনি প্রাণে এক তীব্র আকর্ষণ অনুভব করিলেন। তিলমাত্র বিলম্ব না করিয়া রাখাল দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া গেলেন। ঠাকুর তাঁহাকে দেখিয়া আনন্দে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন এবং বুঝিলেন যে রাখালের বাকী 'একটু ভোগ' শেষ হইয়াছে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

দিব্যসঙ্গ

অলৌকিক দিব্যভাবাপন্ন শ্রীরামকৃষ্ণের সন্নিধানে শুদ্ধচিত্ত বাল-স্বভাব রাখাল স্বাভাবিকভাবেই আনন্দে হাসিয়া খেলিয়া বেড়াইতেন। এই হাসিখেলার ভিতরেই আনন্দময় পুরুষের সংস্পর্শে রাখালের আন্তর চরিত্রটী ধীরে ধীরে বিকসিত হইতেছিল। অঙ্কুর উদ্গত হইলে চারিদিকে বেড়া দিয়া তাহা যেমন রক্ষা করা হইয়া থাকে, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার রাখালকে তেমন ভাবেই পালন করিতেন। তাঁহার স্বভাবের সহজ গতি যাহাতে কোনরূপ ক্ষুণ্ণ বা ব্যতিক্রম না হয় কিম্বা তাহা বিপথে না যায়, তিনি সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন। এই আত্মভোলা অলৌকিক মহাপুরুষের চালচলন, আচারব্যবহার ও দৃষ্টিভঙ্গী সবই অদ্ভুত ছিল। যিনি সর্ব্বদা ভাবমুখে অবস্থিত থাকিয়া প্রায়ই বাহ্য সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলিতেন, পরিধেয় বস্ত্র যাঁহার অঙ্গ হইতে নিয়ত স্খলিত হইয়া পড়িত, যিনি কখন সাম্বর কখন বা দিগম্বর, তিনি আবার প্রত্যেক বিষয়ের খুঁটিনাটির প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন। গৃহ, দ্বার, অশন, বসন, শয্যা, আস্তরণ, গৃহদ্রব্য ও আসবাব সমুদয় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে তৎপ্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি থাকিত। এই দিব্য-পুরুষের সঙ্গে সতত বাস ও তাঁহার সেবা করিয়া রাখালের চরিত্রেও ইহা পরিস্ফুট হইয়াছিল। উত্তরকালে তিনি উচ্চ-

ভাব-ভূমিতে বিচরণ করিয়াও প্রত্যেক বিষয়ের খুঁটিনাটি সম্বন্ধে সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন।

জগতে দিব্যভাবের লোক দুর্লভ। যখন কোন অবতার বা অবতারকল্প মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন, তখন তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদগণের মধ্যেও দুই চারিজন মাত্র দিব্যভাবাপন্ন নিত্যসিদ্ধ পুরুষের আবির্ভাব হয়। তাঁহাদের দ্বারাই নবযুগ প্রবর্তিত হইয়া থাকে। তাই ঈশ্বরকোটি নিত্যসিদ্ধের অতীন্দ্রিয় ভাব ও অনুভূতি সাধনসাধ্য নহে—ইহা তাঁহাদের স্বাভাবিক প্রকৃতি। পদ্মকোরক প্রস্ফুটিত হইলে যেমন দলে দলে বিকসিত হইয়া সৌরভে দিক আমোদিত করে, তেমনি নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষদের জীবন স্তরে স্তরে উন্মেষিত হইয়া প্রদীপ্ত দিব্যমহিমায় দশদিক আলোকিত করিয়া থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণের দিব্যস্পর্শে হাসিখেলা ও স্নেহ-ভালবাসার ভিতর দিয়া রাখালের অন্তর অতীন্দ্রিয় অলৌকিক ভাবদ্যুতিতে দীপ্তিময় হইয়া উঠিত।

সমগ্র জীবন সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত না হইলে উচ্চ ভাবভূমিতে আরোহণ করিবার কেহ অধিকারী হয় না। আধিকারিক পুরুষেরা সকলেই সত্যসংকল্প, সত্যনিষ্ঠ এবং সত্যের প্রতীক। শ্রুতিতে আছে "সত্যং জ্ঞানমনন্তম্ ব্রহ্ম," সত্যই ব্রহ্ম বা ব্রহ্মস্বরূপ। যাঁহারা সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকেন তাঁহাদের বাক্য, আচরণ ও চিন্তা সব সত্যময়। ঠাকুর তাই বলিতেন, "সত্য কথাই কলির তপস্যা। সত্যকে আঁট করে ধ'রে থাকলে ভগবান লাভ হয়। সত্যে আঁট না থাকলে ক্রমে ক্রমে সব নষ্ট হয়।" ঠাকুর যখন চরম অনুভূতির পর জ্ঞান, অজ্ঞান, শুচি, অশুচি, পাপ, পুণ্য, ভাল

ও মন্দ মার শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া সব সমর্পণ করিয়াছিলেন তখন সত্যকে দিতে পারেন নাই। তিনি বলিতেন, "সব মাকে দিতে পারলুম, 'সত্য' মাকে দিতে পারলুম না।" এই সত্যনিষ্ঠা যাহাতে রাখালের হৃদয়ে বদ্ধমূল থাকে এবং প্রতিদিনের আচরণে তাহা হইতে তিনি বিচ্যুত না হন তৎপ্রতি ঠাকুরের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল।

একদিন রাখালকে দেখিয়া ঠাকুর বলিলেন, "তোর মুখে কেমন একটা মলিনতার ছায়া দেখছি। তোর দিকে আমি তাকাতে পারছি না কেন? তুই কি কোন অন্যায় কাজ করেছিস্?" রাখাল তাঁহার এই নিদারুণ বাণী শুনিয়া বিস্মিত হইলেন ও চিন্তা করিতে লাগিলেন। বড় বড় অন্যায় কার্য্যের কথা দূরে থাকুক, ছোটখাট ঐরূপ কোন কাজ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার মনে কিছুই উদিত হইল না। তিনি নিরুত্তরে ঠাকুরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলেন। ঠাকুর আবার গম্ভীর-স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মনে করে গ্যাখ কি অন্যায় কাজ করেছিস?" রাখাল ধীরে ধীরে বলিলেন, 'কৈ, কিছু ত মনে পড়ছে না।' ঠাকুর অন্তর্ভেদী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে রাখালের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কোন মিছে কথা বলেছিস কিনা মনে করে গ্যাখ দেখি।" তখন রাখালের সহসা স্মৃতিপথে উদিত হইল যে, তাঁহার দুইজন বন্ধুর সঙ্গে হাস্যপরিহাসচ্ছলে তিনি দুই একটি মিথ্যা কথা বলিয়াছিলেন। রাখাল ঠাকুরকে তাহা আনুপূর্ব্বিক নিবেদন করিলেন। তিনি রাখালকে সাবধান করিয়া বলিলেন, "অমন কাজ আর করিস নি। কলিযুগে এই সত্যনিষ্ঠাই শ্রেষ্ঠ তপস্যা।" উত্তরকালে রাখাল তাঁহার কৃপাপ্রাপ্ত অনেক শিষ্য ও ভক্তের নিকট এই ঘটনা উল্লেখ

করিয়া বলিতেন, "যে মিছে কথা বলে বা মিথ্যাচার করে—তার জপ তপ সব বৃথা। সত্যের প্রতি ঠাকুর আমাদের হৃদয়ে এরূপ ধারণা করে দিয়েছেন যে আমরা বুঝেছি অন্য অপরাধের বরং ক্ষমা আছে কিন্তু মিথ্যাবাদীর ও মিথ্যাচারীর অপরাধের কিছুতেই নিষ্কৃতি নেই।"

রাখাল কোন কোন দিন ঠাকুরের নিকটে বসিয়া আপন মনে গ্রন্থাদি পাঠ করিতেন। একদিন তিনি Smile's Self-help পড়িতেছেন—Lord Erskineএর বিষয়। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত-লেখক শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ ও অপরাপর ভক্তেরা তথায় বসিয়াছিলেন। মহেন্দ্রনাথকে ঠাকুর জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাখাল যে বই পড়ছে—তাতে কি বলছে?" মহেন্দ্রনাথ তদুত্তরে বলিলেন, "সাহেব ফলাকাঙ্ক্ষা না করে—কর্ত্তব্যকর্ম্ম করতে বলছেন। নিষ্কামকর্ম্ম!" ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, "তবে তো বেশ! কিন্তু পূর্ণজ্ঞানের লক্ষণ, একখানা পুস্তকও সঙ্গে থাকবে না। যেমন শুকদেব। তাঁর সব মুখে। বইয়ে, শাস্ত্রে বালিতে চিনিতে মিশেল আছে। সাধু চিনিটুকু লয়ে বালি ত্যাগ করে, সাধু সার গ্রহণ করে।" গ্রন্থপাঠের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু এবং সাধুজীবনে তাহার কতটুকু উপযোগিতা তাহা উপদেশ ছলে ঠাকুর রাখালকে বুঝাইয়া দিলেন।

ব্রহ্মবিদ্যা ব্যতীত বিষয়ান্তরে রাখালের মন ধাবিত না হয় ঠাকুর তাহা লক্ষ্য রাখিতেন। শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথের অনুরোধে রাখাল একদিন ঠাকুরের ভক্তসঙ্গে কথাবার্ত্তাকালে গোপনে কাগজ পেন্সিল লইয়া তাহা টুকিতেছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ উহা দেখিতে পাইয়া রাখালকে

বলেন, "ও কি করছিস্? মাষ্টার বুঝি বলেছে? তোর ও কাজ নয়।" রাখাল আর সে বিষয়ে যত্ন করিলেন না।

নিরভিমান ও অদোষদর্শী না হইলে দিব্যভাবের বিকাশ হয় না। ঠাকুরের জলন্ত দৃষ্টান্তে রাখাল মর্ম্মে মর্ম্মে ইহা অনুভব করিয়াছিলেন। একবার নন্দনবাগান ব্রাহ্মসমাজের উৎসবে ঠাকুর ভক্তগণসহ আমন্ত্রিত হন। স্তোত্রপাঠ ও উপাসনাদি সাঙ্গ হইলে গৃহস্বামীরা পদস্থ ব্যক্তিদের ও পরিচিত ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-বন্ধুদের আদর-আপ্যায়ন ও আহারাদি লইয়াই ব্যস্ত ছিলেন, ঠাকুরের প্রতি তাঁহাদের দৃষ্টি ছিল না। ঠাকুর সঙ্গী ভক্তদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "কৈরে, কেউ ডাকে না যে রে!" গৃহস্বামীদের এই উদাসীনতা ও অযত্ন দেখিয়া রাখাল মনে মনে পূর্ব্ব হইতেই বিরক্ত হইতেছিলেন। ঠাকুরের এই কথা যেন অগ্নিতে ঘৃতাহুতির মত হইল। তিনি সক্রোধে তাঁহাকে বলিলেন, "মশায়, চলে আসুন!" ঠাকুর রাখালের অভিমান লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আরে রোস্, গাড়ী ভাড়া তিন টাকা দুই আনা কে দেবে? রোক করলেই হয় না। পয়সা নেই আবার ফাঁকা রোক! আর এত রাত্রে খাই কোথা?" রাখাল নীরবে বসিয়া থাকিলেন। পদস্থ ব্যক্তিদের ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের বিদায় দিয়া গৃহস্বামীরা সমাগত নিমন্ত্রিতদের একসঙ্গে জলযোগে বসিবার জন্য আহ্বান করিলেন। নিমন্ত্রিতেরা পূর্ব্ব হইতেই সমস্ত আসন অধিকৃত করিয়া ফেলিয়াছিলেন। ঠাকুর রাখাল প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া দেখিলেন বসিবার স্থান নাই। অতি কষ্টে একটা অপরিষ্কৃত স্থানে ঠাকুরকে একধারে বসান হইল। ঠাকুর তথায় কোনপ্রকারে নুন টাকনা দিয়া লুচি-

খাইলেন, তরকারি প্রভৃতি স্পর্শ করিলেন না। লোককল্যাণকামী ঠাকুরের অদ্ভুত নিরভিমানিতা, অদোষদর্শিতা, উদারতা, ক্ষমা ও করুণা রাখালের চিত্তে স্থায়ী ও গভীর রেখাপাত করিয়া দিল।

এই প্রসঙ্গে ঠাকুর রাখালকে পরে বুঝাইয়াছিলেন যে, "গৃহস্থেরা অনেক সময়ে অজ্ঞানবশতঃ সাধুর সঙ্গে ঠিক মত ব্যবহার করতে জানে না। সাধু তাদের দোষ না দেখে কেবল কল্যাণই কামনা করবে। কিছু না খেয়ে এলে গৃহস্থের অমঙ্গল হবে। সাধুর তা করতে নেই—অন্ততঃ এক গ্লাস জল চেয়ে নিয়ে পান করতে হয়।"

দক্ষিণেশ্বরের আবেষ্টনের মধ্যে একটা জমাটবাঁধা আধ্যাত্মিকতা সর্ব্বদা বিরাজ করিত। সকলেই যেন ধ্যানপরায়ণ, মহাপুরুষের মহাশক্তিপ্রভাবে সকলের মন ঊর্দ্ধমুখী হইয়া থাকিত। লাটু ও হরিশ এখানে দিন রাত থাকিয়া সাধনভজন করিতে লাগিলেন। কোনও কোনও গৃহী ভক্ত দুই চারি দিন দক্ষিণেশ্বরে বাস করিয়া ব্যাকুলভাবে নির্জ্জনে সাধন করিতেন। ইঁহারা কেহই একসঙ্গে বসিয়া সমবেতভাবে সাধনভজন করিতেন না। সকলেই ঠাকুরের নির্দ্দেশমত পৃথকভাবে স্বতন্ত্র স্থানে একাকী গোপনে সাধনায় নিরত থাকিতেন। কেহ পঞ্চবটীমূলে, কেহ বিল্বতলায়, কেহ গঙ্গাতীরে, কেহ নাটমন্দিরের কোণে বসিয়া জপধ্যান করিতেন। ইঁহারা জপধ্যানে এত তন্ময় হইতেন যে বিষ্ণুঘরের পূজারী সেবক শ্রীযুত রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ইঁহাদের খুঁজিয়া ডাকিয়া আনিয়া খাওয়াইতেন। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ একদিন ভক্তদের নিকট বলিয়াছিলেন, "রাম আছে, তাই আমাদের অত ভাবতে হয় না।

হরিশ লাটু এদের ডেকে ডেকে খাওয়ায়। ওরা হয়তো একলা কোথায় ধ্যান করছে—সেখান থেকে ডেকে আনে।" রাখাল কিন্তু এই দলের মধ্যে ছিলেন না। তাঁহার প্রধান কার্য্য ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের সেবা। যখন এই সব সাধক অন্তরঙ্গ ভক্তেরা তাঁহাদের অলৌকিক দর্শন বা আধ্যাত্মিক অনুভূতির কথা ঠাকুরকে জানাইতেন তখন প্রায়ই রাখাল সেখানে উপস্থিত থাকিতেন। তাঁহারা চলিয়া গেলে তিনি সরলভাবে শ্রীরামকৃষ্ণকে বলিতেন, "কৈ, আমার তো ওদের মত কোন দর্শনাদি হয় না?" ঠাকুর বলিতেন, "একটু ধ্যানজপ নিয়মমত করলে ঐ রকম দর্শন হয়।"

তাঁহার কথায় রাখাল সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। ঠাকুরের নির্দ্দেশে নির্জ্জনে আসনে বসিয়া তিনি ধ্যানজপ করিতে লাগিলেন। প্রথম প্রথম ইহাতে কোনও সরসতা বোধ না করিয়া বরং তিনি মরুভূমির মত হৃদয়ে একটা শুষ্কতা অনুভব করিতেন। এই নীরসতাকে দূর করিবার জন্য রাখাল তখন ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র রামলাল প্রভৃতির সহিত কখন কখন কৌতুক ও রঙ্গরসিকতা করিতেন। হাজরা ইহাতে লোকের নিকট বলিয়া বেড়াইতেন, "রাখাল টাখাল যা সব দেখছো—ওরা জপতপ করতে পারে না—হো হো করে বেড়ায়।" ঠাকুর ইহা শুনিয়া হাজরাকে বলিয়াছিলেন, "আমি জানি যে যদি কেউ পর্ব্বতের গুহায় বাস করে, গায় ছাই মাখে, নানা কঠোর করে কিন্তু ভিতরে ভিতরে বিষয়ে মন—সে ধিক্। আর যার কামিনী-কাঞ্চনে মন নেই, খায় দায় বেড়ায়, তাকে বলি ধন্য।" ঠাকুর তাহাকে এই কথা বলিলেন বটে কিন্তু পরে রাখালকে একদিন নিকটে

ডাকিয়া বলিলেন, "কিরে, তুই যে আর নিয়মমত জপধ্যান করতে বসিস্ না? কেন রে, তোর কি হল?" রাখাল তদুত্তরে বলিলেন, "সকল সময় প্রাণে ভাবের উদ্দীপনা হয় না। কেমন যেন মনটা ফাঁকা ফাঁকা ঠেকে। তাই নিয়মমত বসি না।" ঠাকুর শুনিয়া বলিলেন, "সে কিরে? খুব রোক চাই—তবে সাধনা হয়। ঠিক নিয়মমত তাই বসতে হয়। রোক চাই। যারা খানদানী চাষা তারা ফসল হয় না বলে কি চাষ ছেড়ে দেবে? ছিঃ! অমন করে বেড়াস নি। ঠিক ঠিক নিয়মমত বসবি।"

ঠাকুর প্রত্যহ যেমন শ্রীশ্রীভবতারিণীর মন্দির দর্শন করিতে যান সেদিনও তেমনি গেলেন। রাখালও পশ্চাতে পশ্চাতে গিয়া দেখিলেন যে ঠাকুর গর্ভমন্দিরে মার সম্মুখে বসিলেন। রাখাল ভিতরে প্রবেশ করিতে সাহস না পাইয়া সম্মুখের নাটমন্দিরে জপ করিতে বসিয়া গেলেন। কিছুক্ষণ জপ করিতে করিতে দেখিলেন যে সহসা গর্ভমন্দিরটী এক অপরূপ আলোকে উদ্ভাসিত হইল। ক্রমশঃ আলোকের তেজ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সেই তীব্র স্নিগ্ধ জ্যোতিঃ যেন সমুদিত শতসূর্য্যের রশ্মির মত উজ্জ্বল ও প্রখর হইল—ক্রমে ক্রমে উহা মন্দির দ্বারের বাহিরে আসিয়া তাঁহার দিকে ধাবিত হইল। রাখাল ভীত ও সন্ত্রস্তভাবে তৎক্ষণাৎ আসন ত্যাগ করিয়া দৌড়াইতে দৌড়াইতে ঠাকুরের ঘরে চলিয়া আসিলেন এবং বিস্ময়চিত্তে নীরবে বসিয়া থাকিলেন। পরে ঠাকুর তাঁহার ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন যে রাখাল স্তব্ধভাবে চুপটী করিয়া বসিয়া আছেন। তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে, তুই এখানে চুপ মেরে বসে আছিস? আজ জপ

করতে বসেছিলি তো ?" রাখাল তখন আনুপূর্ব্বিক বিবরণ ঠাকুরের নিকট নিবেদন করিলেন। গম্ভীরভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ সব শুনিয়া বলিলেন, "তুই না বলিস তোর দর্শন টর্শন কিছু হয় না ? আবার কিছু দেখলেও ভয়ে ভয়ে পালিয়ে আসবি, তা হলে কি করবি বল ?" রাখাল তখন নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন।

রাখাল শ্রীশ্রীভবতারিণীর নাটমন্দিরে গভীর ধ্যানে একদিন তন্ময় হইয়া বসিয়া আছেন এমন সময়ে ভাবাবিষ্ট হইয়া ঠাকুর তথায় উপনীত হইলেন। তিনি রাখালকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এই নে তোর মন্ত্র—আর ঐ দেখ তোর ইষ্ট।" এই বলিয়া ঠাকুর তাঁহাকে তাঁহার ইষ্ট মন্ত্র বলিয়া দিলেন এবং অঙ্গুলী সঙ্কেতে তাঁহার ইষ্ট মূর্ত্তিকে নির্দ্দেশ করিলেন। রাখাল অপ্রত্যাশিতভাবে সহসা এই কৃপা পাইয়া আনন্দোৎফুল্ললোচনে সঙ্কেত স্থানে তাকাইয়া দেখিলেন তাঁহার ইষ্ট-মূর্ত্তি দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া সহাস্যবদনে জীবন্তভাবে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। রাখাল নির্ব্বাক ও স্তব্ধ হইয়া অনিমেষ লোচনে তাঁহার ইষ্টমূর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে তিনি বিহ্বল চিত্তে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। রাখালের মনে তখন দৃঢ় প্রতীতি জন্মিল যে শ্রীরামকৃষ্ণের কৃপাকটাক্ষে মূককে বাচাল করে, পঙ্গু গিরি লঙ্ঘন করিতে পারে, জীবের ইষ্টদর্শন ও চরম অনুভূতি অনায়াসলভ্য হয়। তাঁহার মনে হইল যে, এই অলৌকিক দিব্যশক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ পরম করুণাপরবশ হইয়া তাঁহার দিব্যচক্ষু উন্মীলন করিতেই তথায় আসিয়াছেন। রাখাল অমনি ভক্তিগদগদচিত্তে তাঁহার শ্রীচরণকমলে দণ্ডের মত নিপতিত হইলেন। ঠাকুর হাসিতে হাসিতে তাঁহার ঘরের অভিমুখে চলিয়া

গেলেন। রাখাল পরমানন্দে তাঁহার ইষ্টধ্যানে নিমগ্ন হইয়া বসিয়া রহিলেন।

রাখাল একদিন কোন এক অন্যায় কাজ করিয়া অত্যন্ত অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি মনে ভাবিলেন, ঠাকুরকে সব নিবেদন করিয়া ইহার প্রতিকারের উপায় কি জিজ্ঞাসা করিবেন। রাখাল তাঁহার নিকটে যাইবামাত্র ঠাকুর বলিলেন, "গাড়ু নিয়ে ঝাউতলায় আয়।" ঝাউতলা হইতে ফিরিবার পথে ঠাকুর আপনা হইতেই তাঁহাকে বলিলেন, "তুই আজ অমুক অন্যায় কাজ করেছিস্! অমন আর করিস্ নি।" রাখাল তাঁহার এই কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গেলেন। তাঁহার মন হইতে সব ধুইয়া মুছিয়া গেল। আবার কোন দিন রাখালের মনে মলিনতা দেখিলে তাঁহার মস্তক স্পর্শ করিয়া বিড় বিড় করিয়া কি উচ্চারণ করিতেন তাহাতে রাখালের মন শান্ত ও স্বচ্ছ হইয়া যাইত।

আর একদিন দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীভবতারিণীর নাটমন্দিরে রাখাল আসনে বসিয়া জপধ্যান করিতেছেন কিন্তু কিছুতেই তাঁহার চিত্ত স্থির হইতেছে না। বারংবার চেষ্টা করিয়াও তিনি বিফল হইলেন। রাখাল ভাবিলেন—"এ কি রহস্য! এই দেবস্থান, ঠাকুরের ন্যায় মহাপুরুষের পুণ্য সঙ্গে রয়েছি, তাঁর কথা দিনরাত শুনছি,—তাঁর অপার ও অগাধ করুণা আর ভালবাসা পাচ্ছি অথচ একি দুর্দ্দৈব!" তখন নিজেকে শত ধিক্কার দিয়া অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে তিনি বলিতে লাগিলেন, "মা, আমি কি অপদার্থ! এই মহাপুরুষের শ্রীমুখে শুনেছি মলয়ের হাওয়ায় যে সব বৃক্ষের সার আছে তা চন্দনবৃক্ষে পরিণত হয়। পাঁকাটির মত অসার পদার্থে লাগলে কিছু হয় না। এই চেতন পুরুষের কৃপাই মলয়ের হাওয়া, স্পর্শে প্রাণ জুড়িয়ে যায়। কিন্তু

আমি অসার—ভিতরে কোনই সার নেই, তাই তাঁর এত প্রেম ও কৃপা লাভ করেও কিছু হল না !” ভাবিতে ভাবিতে রাখালের মনে আগুনের হল্‌কা বহিয়া গেল—যন্ত্রণায় তিনি অমনি আসন ত্যাগ করিয়া বিষণ্নমুখে উঠিয়া পড়িলেন। ঠিক সেই সময়ে শ্রীশ্রীভবতারিণীকে দর্শন করিতে ঠাকুর তথায় আসিয়াছিলেন। যখন তিনি নাটমন্দিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন তখন রাখালকে আসন ত্যাগ করিতে দেখিয়াই তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “হ্যাঁরে, তুই এর মধ্যেই উঠে পড়্‌লি? কি হয়েছে, তোর মুখ এত মলিন কেন?” রাখাল সরলচিত্তে অকপটভাবে সব খুলিয়া বলিলেন। ঠাকুর কিয়ৎক্ষণ চিন্তিতভাবে তূষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন। পরে তাঁহাকে বলিলেন, “হাঁ কর্‌।” রাখাল “হাঁ” করিতেই ঠাকুর বিড়্‌ বিড়্‌ করিতে করিতে রাখালের জিভ টানিয়া তিনটা রেখা টানিয়া দিলেন। রাখালের সব দুশ্চিন্তা যেন কোথায় উড়িয়া গেল, প্রাণে বিমল শান্তির নির্ঝর বহিল। তখন ঠাকুর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, “যা, এখন বস্‌গে যা।”

দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রীভবতারিণীর মন্দিরে প্রাতে ধ্যানজপ করিয়া রাখাল প্রভৃতি অন্তরঙ্গেরা শ্রীশ্রীঠাকুরকে প্রণাম করিয়া জলখাবার খাইতেন। একদিন রাখাল দেখিলেন ধ্যান করিতে বসিয়া ঠিক ধ্যান হইতেছে না। তাঁহার মনে হইল “এতদিন এখানে আছি, কিছু ত হল না। দুর ছাই, দু তিন দিন এরূপভাবে থাকলে বাড়ী চলে যাব। সেখানে পাঁচটা নিয়ে তবুও মন-ব্যস্ত থাকবে।” ঠাকুরের কাছে মনের এই অশান্ত ভাবটা খুলিয়া বলিতে রাখাল সঙ্কোচ বোধ করিলেন। তিনি

কালীমন্দির হইতে বাহির হইয়া দেখিতে পাইলেন যে ঠাকুর ঘরের সম্মুখস্থ বারাণ্ডায় পায়চারি করিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া ঠাকুর ঘরে প্রবেশ করিলেন। রাখাল ঘরে প্রবেশ করিয়া যথারীতি প্রণাম করিলেন। ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, "ন্যাখ্, তুই যখন কালীঘর থেকে এলি তখন দেখলুম তোর মনটা যেন জালে ঢাকা রয়েছে।" রাখাল বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "আমার মন যে এত খারাপ হয়েছে আপনি তা সব জেনেছেন।" তিনি রাখালের জিহ্বায় আঙ্গুল দিয়া লিখিয়া দিতেই রাখালের মন আনন্দে পূর্ণ হইল।

শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশে রাখাল কিছুদিন পঞ্চবটীতলে বসিয়া সাধনভজন করিতেন। একদিন রাখাল কিছুতেই মনকে ঊর্দ্ধমুখী করিতে পারিলেন না। বিফল মনোরথ হইয়া হতাশ ও ব্যাকুলভাবে রাখাল ঠাকুরকে জানাইবার উদ্দেশে তাঁহার নিকট গমন করিতে অগ্রসর হইলেন। ঠিক সেই সময় অন্তর্যামী ঠাকুর রাখালের মানসিক বিকার বুঝিতে পারিয়া পঞ্চবটীর দিকে যাইতেছিলেন। মধ্যপথে তাঁহাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ হইল। দূর হইতে তাঁহাকে দেখিয়া ঠাকুর হাত তুলিয়া অভয় দিলেন। পরে নিকটে আসিয়া তিনি বলিলেন, "ওরে, আমি দেখতে পাচ্ছি একটা বিঘ্ন এসে তোর মনকে অশান্ত করে তুলেছে।" এই বলিয়া রাখালের মাথায় শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করিলেন। স্পর্শমাত্র রাখালের চিত্ত শান্ত, শুদ্ধ ও সুনির্ম্মল হইল।

দিব্য অনুভূতি লাভের সহায়তার জন্য রাখালকে নানা ভাবের ও নানা সম্প্রদায়ের সাধনভজনের প্রণালী ঠাকুর শিক্ষা দিয়াছিলেন।

একদিন শ্রীশ্রীভবতারিণীর সম্মুখে রাখালের কপালে কারণের ফোঁটা দিয়া ঠাকুর তাঁহাকে শাক্ত দীক্ষায় অভিষিক্ত করেন এবং চক্রে চক্রে কিরূপে ধ্যান করিতে হয় তাহাও বলিয়া দেন। যোগ-মার্গের কয়েকটী নির্দ্দিষ্ট আসন, মুদ্রা ও ধ্যান-ধারণাদি সম্বন্ধে ঠাকুর তাঁহাকে উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। কিন্তু রাখালের সাধনভজন চলিত খুব গোপনে। যাঁহারা সর্ব্বদা নিকটে থাকিত তাহারাও সহজে বুঝিতে পারিত না যে তিনি কি করিতেছেন। তবে সাধনার দীপ্ত মাধুর্য্য ছড়াইয়া পড়িত তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে, তাঁহার মধুর আকৃতিতে ও কণ্ঠস্বরে।

একদিন দোলপূর্ণিমায় বলরামগৃহে শ্রীযুত রাম, মনোমোহন, নৃত্যগোপাল প্রভৃতি ভক্তেরা ভাবোন্মত্ত শ্রীরামকৃষ্ণকে বেড়িয়া বেড়িয়া নাচিতেছেন, ঠাকুরও মধুর নৃত্য করিতেছেন। গগনভেদী হরিনাম সংকীর্ত্তন চলিতেছে। সেই সংকীর্ত্তনে রাখাল ভাবাবিষ্ট হইয়া ভূতলে পড়িয়া গেলেন। কীর্ত্তনান্তে শ্রীরামকৃষ্ণ প্রকৃতিস্থ হইয়া দেখিলেন যে তাঁহার আদরের রাখাল ভাবাবিষ্ট হইয়া ভূতলে পড়িয়া রহিয়াছে। অমনি তিনি রাখালের বুকে শ্রীহস্ত বুলাইয়া বলিতে লাগিলেন, "শান্ত হও, শান্ত হও।" শ্রীরামকৃষ্ণের স্পর্শে রাখালের বাহ্যসংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল।

রাখাল দিন দিন অন্তর্মুখী হইতে লাগিলেন। তাঁহার এই অন্তর্মুখী ভাবাবস্থা ঠাকুর অন্তরঙ্গ ভক্তদিগকে বুঝাইয়া দিতেন। তিনি বলিতেন, "আহা! আজকাল রাখালের স্বভাবটী কেমন হয়েছে। অন্তরে ঈশ্বরের নাম জপ করে কিনা—তাই ঠোঁট নড়ে।" আবার কাহাকে কাহাকেও তিনি বলিতেন, "রাখাল জপ

করতে করতে বিড় বিড় করতো। আমি দেখে আর স্থির থাকতে পারতুম না। একেবারে তাঁর উদ্দীপন হয়ে বিহ্বল হয়ে যেতুম।" বাস্তবিকই রাখালকে দেখিয়া তিনি কখনও কখনও ভাবাবিষ্ট হইয়া বলিতেন, "আমি অনেক দিন এখানে এসেছি—তুই কবে এলি?" এই অলৌকিক দিব্যবাণীর মর্ম্মরহস্য কে বুঝিবে?

প্রসঙ্গক্রমে একদিন প্রাতে ঠাকুর শব্দব্রহ্মের বিষয়ে কিছু বলিয়াছিলেন। রাখাল সেদিন মধ্যাহ্নে বিজন পঞ্চবটীমূলে উহা হৃদয়ে দৃঢ় ধারণা করিবার জন্য ধ্যান করিতে বসিলেন। তন্ময় হইয়া ধ্যানাবস্থায় তিনি শুনিতে পাইলেন যে, বৃক্ষশাখায় বসিয়া বিহঙ্গেরা মধুর কাকলীতে বেদগান করিতেছে।

সাধনভজন করিতে করিতে রাখালের কখন কখন নানারূপ অলৌকিক দর্শন হইত। পুণ্যবতী রাণী রাসমণির দেবালয়ে জনৈক ব্যক্তি অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়ে। তাহাকে দেখিবার কেহ ছিল না। রাখাল অতি যত্নসহকারে কয়েকদিন তাহার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। এক রাত্রে উক্ত পীড়িত ব্যক্তি রোগযন্ত্রণায় ছটফট করিতেছিল, রাখাল নিকটে বসিয়া সব দেখিতেছিলেন। রোগীর যন্ত্রণার উপশমের তিনি কোন উপায় খুঁজিয়া পাইলেন না। অবশেষে রাখাল অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে রোগীর শিয়রে বসিয়া একান্ত মনে জপ করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি তন্দ্রাচ্ছন্ন অবস্থায় দেখিতে পাইলেন যেন একটী দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাঁহার অপরূপ দিব্য লাবণ্যময়ী মূর্ত্তি দেখিয়া দেবীজ্ঞানে রাখাল স্বতঃই তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, "মা, এই রোগী কি আরোগ্যলাভ করবে?" সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িয়া তিনি উত্তর

করিলেন, "হাঁ"। উত্তর দিবার সঙ্গে সঙ্গেই সেই মূর্ত্তি সহসা অন্তর্হিতা হইল! আশ্চর্য্যের বিষয় ঠিক তার পরদিন রোগী সম্পূর্ণ রোগমুক্ত হইয়া উঠিল।

একদিন দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর তাঁহার ঘরের পূর্ব্বদিকে লম্বা বারান্দার উত্তরাংশে রাখালের সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেছেন এমন সময়ে তাঁহারা উভয়ে দেখিতে পাইলেন, ফটক পার হইয়া একটী জুড়িগাড়ী তাঁহাদের দিকে আসিতেছে। গাড়ীটী দেখিয়াই ঠাকুর যেন আতঙ্কে তাঁহার ঘরে গিয়া বসিলেন। রাখালও বিস্মিতভাবে তাঁহার অনুগমন করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই ঠাকুর বলিলেন, "যা—যা, ওরা এখানে আসতে চাইলে বলিস, এখন দেখা হবে না।" রাখাল তৎক্ষণাৎ ঘরের বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। আগন্তুকেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এখানে না একজন সাধু থাকেন?" রাখাল বলিলেন, "হাঁ, থাকেন। আপনারা কি প্রয়োজনে এসেছেন?" আগন্তুকদের মধ্যে একজন বলিলেন, "আমাদের একজন আত্মীয় অত্যন্ত পীড়িত। ইনি যদি কোন ঔষধ দয়া করে দেন—তাই এসেছি।" রাখাল তাহাদিগকে বলিলেন, "আপনারা ভুল শুনেছেন। ইনি তো কখন কাহাকেও ঔষধ দেন না। বোধ হয় আপনারা দুর্গানন্দ ব্রহ্মচারীর কথা শুনে থাকবেন। তিনি ঔষধ দেন বটে। তিনি ঐ পঞ্চবটীর নিকটে কুটীরে থাকেন—গেলেই দেখা পাবেন।" ঠাকুর কিছুক্ষণ পরে রাখালকে বলিলেন, "ওদের ভিতর কি যে একটা তমোভাব দেখলাম। তাই ওদের দিকে তাকাতেই পারি নি—ওদের সঙ্গে কথা কইব কি? ভয়ে পালিয়ে এলাম।" এই বলিয়া তিনি রাখালকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই মানুষ দেখলে চিনতে

পারিস ?" রাখাল উত্তরে বলিলেন, "না।" সেইদিন ঠাকুর লক্ষণাদিসহ লোক চিনিবার তত্ত্ব শিখাইয়া দিলেন। উত্তরকালে রাখালের লোক চিনিবার অসাধারণ ক্ষমতা দেখা যাইত।

সাধকের মন যেমন স্তরে স্তরে ঊর্দ্ধে আরোহণ করে তেমনি সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ অলৌকিক বিভূতি প্রকাশ পায়। ঐ দিকে দৃষ্টি পড়িলে মানুষ উচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতি লাভ করিতে পারে না। সাধনপথের উহা কণ্টকস্বরূপ। তাই শ্রীরামকৃষ্ণ জগন্মাতার নিকট ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করিয়াছিলেন, "মা, অষ্টসিদ্ধি চাই না, লোক-মান্য চাই না, কেবল এই করো, যেন তোমার শ্রীপাদপদ্মে শুদ্ধা ভক্তি হয়।" সাধন করিতে করিতে রাখালেরও বিভূতি প্রকাশ পাইয়াছিল। কাঁচের ভিতর যেমন জিনিষ দেখা যায় মানুষকে দেখিলে রাখাল তাঁহার ভিতরটা তেমনি সব দেখিতে পাইতেন। দক্ষিণেশ্বরে যে সব লোক ঠাকুরকে দর্শন করিতে আসিত, তাহাদের কাহার ভিতরে কি ভাব আছে, রাখাল তাহা স্পষ্টরূপে দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাইতেন। সুতরাং এইরূপে সকলের অন্তরস্থ ভাব দর্শন করিয়া তন্মধ্যে যাহারা যথার্থ ধর্ম্ম-পিপাসু তাহাদিগকেই ঠাকুরের নিকট যাইতে দিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ ইহা জানিতে পারিয়া রাখালকে তিরস্কার করিয়া বলেন, "তোর এ সব কি হীনবুদ্ধি ? বিভূতির দিকে নজর রাখলে ঈশ্বরলাভ হয় না। ছিঃ! ছিঃ! ওদিকে কখন মন দিস্ নি।" রাখাল সেইদিন হইতে ঐ সব বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইলেন।

অনন্তর রাখালের অন্তরে তীব্র বৈরাগ্যের ভাব ও ব্যাকুলতা দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ঠাকুর তাঁহার এই অবস্থার উল্লেখ

করিয়া বলিয়াছেন, "রাখাল মাঝে মাঝে বলতো, বিষয়ী লোক আসতে দেখলে ভয় হয়। আমার যখন প্রথম এই অবস্থা হল তখন বিষয়ী লোক আসতে দেখলে দরজা বন্ধ করতাম।" শ্রীরামকৃষ্ণ আরও বলিতেন, "রাখাল এখানে শুয়ে শুয়ে বলতো, 'তোমাকেও আমার ভাল লাগে না'; এমনি তার একটি অবস্থা হয়েছিল।"

যতই দিন যাইতে লাগিল, রাখালও সাধনায় তন্ময় হইতে লাগিলেন। তখন ঠাকুরের আর রীতিমত সেবা করিয়া উঠিতে পারিতেন না। তাঁহার তৎকালীন অবস্থা দেখিয়া ঠাকুর তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তদিগকে বলিতেন, "রাখালের এমনি স্বভাব হয়ে গেছে যে তাকে আমায় জল দিতে হয়, সেবা করতে পারে না।"

দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীর উত্তরে একটি লোহার তারের রেল বা বেড়া ছিল। এই তারের বেড়ার ওপারে ঝাউতলা। ঠাকুর ভাবাবিষ্ট হইয়া ঝাউতলার দিকে যাইতে যাইতে উক্ত তারের বেড়ার উপর হঠাৎ পড়িয়া যান। ইহাতে তাঁহার খুব গুরুতর আঘাত লাগে এবং তাঁহার বাম হাতের একখানা হাড় সরিয়া গিয়াছিল। রাখাল তজ্জন্য অন্তরে অতিশয় দুঃখ অনুভব করিতে লাগিলেন, কারণ ঠাকুরের শরীর রক্ষা করা তাঁহারই দায়িত্ব ও সেবার অন্তর্গত। রাখালের মনোভাব বুঝিয়া ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, "যদিও শরীর রক্ষার জন্য তুই আছিস, তোর দোষ নেই, কেন না, তুই থাকলেও রেল পর্য্যন্ত যেতিস না।" ঠাকুর আবার ভাবাবিষ্ট হইয়া সহাস্যে রাখালকে বলিতেছেন, "দেখিস, তুই যেন পড়িস নে। মান করে যেন ঠকিস নে।" পরে ইহা লইয়াই যে মান অভিমানের অভিনয় হইবে, তাহাই কি তিনি রাখালকে পূর্ব্ব হইতে সতর্ক করিয়া দিতেছেন?

রাখাল মনে করিতেন যে সাধারণ লোক ঠাকুরের হাত ভাঙ্গা দেখিলে না বুঝিয়া নানারূপ মিথ্যা ধারণা লইয়া যাইতে পারে, তাই কাপড় দিয়া তাঁহার হাত ঢাকিয়া দিতেন। ইহাতে ঠাকুর রাখালের প্রতি অসন্তুষ্ট হইতেন। তিনি ভক্তদের বলিতেন, "এমনি অবস্থায় রেখেছেন যে ঢাকা-ঢাকি করবার জো নাই। রাখাল আমার অবস্থা বোঝে না। পাছে কেউ দেখতে পায়, নিন্দা করে, গায়ে কাপড় দিয়ে ভাঙ্গা হাত ঢেকে দেয়। মধু ডাক্তারকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে সব কথা বলছিল। তখন চেঁচিয়ে বল্লাম—'কোথা গো মধুসূদন, দেখবে এস, আমার হাত ভেঙ্গে গেছে'।"

রাখাল শুধু ইহা করিয়াই ক্ষান্ত হইতেন না। ঠাকুর যখন বেদনায় অধৈর্য্য হইয়া ইহাকে উহাকে তাঁহার হাত দেখাইয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, তখন ঠাকুরের উপর তিনি চটিয়া উঠিতেন। ঠাকুর ইহাতে রাখালের উপর বিরক্ত হইয়া ভক্তদের নিকট বলিতেন, "রাখাল চটে,—আমার অবস্থা বোঝে না। এক একবার মনে করি এখান থেকে যায় যাক্। আবার মাকে বলি, মা কোথায় যাবে—কোথায় জ্বলতে পুড়তে যাবে!"

এই সময়ে ঠাকুরের অন্তরঙ্গ সাঙ্গোপাঙ্গ পার্ষদ বালক ভক্তেরা একে একে তাঁহার নিকট আসিতেছিলেন। তাঁহাদিগের প্রতি ঠাকুরের আদর, স্নেহ ও তীব্র আকর্ষণ দেখিয়া রাখালের মনে একটা ঈর্ষা-ভাবের উদয় হইত। ইহার মূলে কাহারও প্রতি তাঁহার ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ছিল না। বালক স্বীয় পিতামাতাকে অপর কোন বালককে আদর ও স্নেহ করিতে দেখিলে যেমন মনে মনে হিংসা করে—রাখালেরও সেইরূপ হইত। এই হিংসা বা অভিমান, প্রেমাস্পদের প্রতি একনিষ্ঠ

প্রেমেরই প্রকাশ। রাখাল মনে করিতেন ঠাকুর যেন তাঁহারই একমাত্র নিজস্ব পিতা, মাতা ও গুরু। তাঁহার উপর অপর কাহারও অধিকার নাই। অপর কাহাকেও ঠাকুর আদর বা স্নেহ করিলে রাখালের অভিমান হইত। এইরূপ হিংসা বা অভিমানের বীজ বিশুদ্ধ প্রেমেই নিহিত থাকে। ঠাকুর এই প্রসঙ্গে পূজ্যপাদ সারদানন্দ স্বামিজীকে বলিয়াছিলেন, "রাখালের মনে তখন বালকের ন্যায় হিংসাও ছিল। তাহাকে ভিন্ন আর কাহাকেও আমি ভালবাসিলে সে সহ্য করিতে পারিত না, অভিমানে তাহার মন পূর্ণ হইয়া উঠিত। তাহাতে আমার কখন কখন তাহার নিমিত্ত ভয় হইত। কারণ মা (জগদম্বা) যাহাদের এখানে আনিতেছেন তাহাদের উপর হিংসা করিয়া পাছে তাহার অকল্যাণ হয়।"

শ্রীযুত মাষ্টার মহাশয় প্রমুখ ভক্তবৃন্দের নিকট পরে একদিন ঠাকুর এই হিংসার প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, "তখন রাখাল খুঁত খুঁত করত, গাড়ীতে আমার সঙ্গে যাবে তা দেরী করত। অন্য ছোকরারা আমার কাছে এলে বিরক্ত হত। যদি কলকাতায় দেখতে যেতে চাইতাম—তাহলে বলতো, 'ওরা কি সংসার ছেড়ে আসবে তাই আপনি দেখতে যাবেন?' অন্য ছোকরাদের জলখাবার দেওয়ার আগে ভয়ে বলতাম তুই খা আর ওদের দে।"

শ্রীরামকৃষ্ণ সহসা ভাবচক্ষে দেখিলেন মা যেন রাখালকে সরাইয়া দিতেছেন। তিনি তখন ব্যাকুল হইয়া মাকে জানাইলেন—"মা, ওকে হৃদের মত সরাস নি, মা ও ছেলে মানুষ, বোঝে না তাই কখন কখন অভিমান করে। যদি তোর কাজের জন্য ওকে এখান থেকে কিছুদিনের জন্য সরিয়ে দিস—তা হলে ভাল জায়গায় মনের আনন্দে ওকে রাখিস।"

ঠাকুর অধর সেনের বাড়ীতে হঠাৎ ভাবাবিষ্ট হইয়া একদিন বলিয়াছিলেন, "মা, একি দেখাচ্ছ! থাম, আবার কত কি? রাখাল টাখালকে দিয়ে কি দেখাচ্ছ!" আবার তিনি বলিলেন, "মা, তোমাকে বলেছিলাম, 'একজনকে সঙ্গী করে দাও, আমার মত'। তাই বুঝি রাখালকে দিয়েছ। এই দিব্যভাবের দিব্যবাণী ও দিব্যলীলার মর্ম্ম কে বুঝিবে?

সপ্তম পরিচ্ছেদ

শ্রীবৃন্দাবনে রাখাল

দক্ষিণেশ্বরে রাখালের একাদিক্রমে বাস করিবার পক্ষে এখন প্রধান অন্তরায় হইল, তাঁহার স্বাস্থ্য। যে কারণেই হউক তিনি এই সময়ে প্রায়ই জ্বরে আক্রান্ত হইতেন। এই জন্য ঠাকুর রাখালের নিমিত্ত অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও ব্যস্ত হইয়া পড়েন। শরীর অসুস্থ হইত বলিয়া অনিচ্ছাসত্ত্বেও রাখাল মাঝে মাঝে কলিকাতায় আসিতেন। এই সময়ে পিতৃগৃহে না থাকিয়া অধিকাংশ দিন শ্রীযুত বলরাম বা শ্রীযুত অধর সেনের বাড়ীতে তিনি বাস করিতেন। ইঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণের পরম অনুরক্ত ভক্ত। ঠাকুর তাঁহার বিশিষ্ট গৃহী ভক্তদিগকে বলিতেন, "নরেন্দ্র, ভবনাথ, রাখাল এরা আমার অন্তরঙ্গ। এদের খাওয়ালে সাক্ষাৎ নারায়ণকে খাওয়ান হয়। এরা সামান্য নয়, এরা ঈশ্বরাংশে জন্মেছে।" সুতরাং ইঁহারা পরম যত্ন ও আদর সহকারে রাখালকে গৃহে রাখিতেন। ইঁহাদের নিকট হইতে ঠাকুর রাখালের সমুদয় সংবাদ পাইতেন এবং রাখালের সহিত ইঁহাদের প্রায় সর্ব্বদা ঠাকুরের প্রসঙ্গ চলিত। শ্রীরামকৃষ্ণ মাঝে মাঝে কলিকাতায় ভক্তগৃহে আসিতেন ও নরেন্দ্র রাখাল প্রমুখ অন্তরঙ্গদিগকে সংবাদ দিয়া তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিতে আদেশ করিতেন। একবার তিনি অধর সেনের বাড়ীতে রাখালকে না দেখিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও ব্যস্ত হইলেন। অধর ঠাকুরকে ঐরূপ ব্যাকুল দেখিয়া

রাখালকে আনিবার জন্য অবিলম্বে জনৈক লোকসহ গাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। আনন্দমোহন সেদিন কলিকাতায় আসাতে রাখাল তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন।

কলিকাতাতেও রাখালের স্বাস্থ্য ভাল থাকিল না। তাঁহার শরীর ক্রমাগত অসুস্থ হওয়ায় অনেকে জলবায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য স্বাস্থ্যকর স্থানে যাইতে পরামর্শ দিলেন। সুযোগও ঘটিল। শ্রীযুত বলরাম সেই সময়ে সপরিবারে বৃন্দাবনে যাইবার জন্য উদ্যোগ করিতেছিলেন। তিনি রাখালকে তাঁহাদের সঙ্গে লইয়া যাইতে চাহিলেন। ঠাকুর ইহা শুনিয়া অনুমোদন করিলেন। কারণ বলরামের কাছে থাকিলে রাখালের যত্ন, আদর, চিকিৎসা ও শুশ্রূষাদির কোন ত্রুটী হইবে না। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে ঠাকুর কিছুদিন আগে জানিতে পারিয়াছিলেন, মা যেন তাহাকে এখান হইতে সরাইয়া দিতেছেন," ইহাতে ঠাকুর ব্যাকুল হইয়া জগদম্বার কাছে প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, "যদি তোর কাজের জন্য এখান হইতে কিছুদিনের জন্য সরাইয়া দিস, তাহা হইলে ভাল জায়গায় মনের আনন্দে রাখিস।" শ্রীরামকৃষ্ণ বুঝিলেন, মা তাঁহার প্রার্থনা শুনিয়াছেন. তাই শ্রীযুত বলরামের সঙ্গে রাখালের বৃন্দাবন যাত্রার প্রস্তাবে ঠাকুর তাঁহার সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হইলেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসের প্রারম্ভে রাখাল বলরামবাবুর সঙ্গে বৃন্দাবন যাত্রা করিলেন।

বৃন্দাবনে গিয়া কিছুদিন পরে রাখাল অসুস্থ হইয়া পড়েন। ঠাকুর ইহা শুনিতে পাইয়া স্নেহময়ী জননীর মতই উদ্বিগ্ন ও ব্যাকুল হইলেন। এমন কি একদিন হাজরার কাছে, 'কি হবে' বলিয়া

আকুল হইয়া রোদন করিতে লাগিলেন। তাঁহার আশঙ্কা হইয়াছিল পাছে তাঁহার রাখালকে তিনি হারাইয়া ফেলেন। এই প্রসঙ্গে পূজ্যপাদ সারদানন্দ স্বামিজী যাহা ঠাকুরের নিকট শুনিয়াছিলেন তাহা 'লীলাপ্রসঙ্গে' এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, "বৃন্দাবনে থাকিবার কালে রাখালের অসুখ হইয়াছে শুনিয়া কত ভাবনা হইয়াছিল তাহা বলিতে পারি না। কারণ ইতিপূর্ব্বে মা দেখাইয়াছিলেন রাখাল সত্য সত্যই ব্রজের রাখাল। যেখান হইতে যে আসিয়া শরীর ধারণ করিয়াছে, সেখানে যাইলে প্রায়ই তাহার পূর্ব্বকথা স্মরণ হইয়া সে শরীর ত্যাগ করে। সেই জন্য ভয় হইয়াছিল পাছে শ্রীবৃন্দাবনে রাখালের শরীর যায়। তখন মার নিকট কাতর হইয়া কত প্রার্থনা করি এবং মা অভয়দানে আশ্বস্ত করেন।

শ্রীশ্রীজগদম্বার এই অভয়বাণী শুনিয়া তিনি পরে রাখালের অসুস্থতা সত্ত্বেও শ্রীযুত মাষ্টার মহাশয়ের নিকট তাঁহার লিখিত পত্র লইয়া কৌতুক করিয়াছেন। রাখাল লিখিয়াছিলেন, "এ বড় উত্তম স্থান, আপনি আসবেন। ময়ূর ময়ূরী সব নৃত্য করছে—আর নৃত্য গীত—সর্ব্বদাই আনন্দ।" মাষ্টার মহাশয়কে দেখাইয়া ঠাকুর তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তদিগকে বলিয়াছিলেন, "বৃন্দাবন থেকে রাখাল এঁকে লিখেছে, 'এ বেশ জায়গা—ময়ূর ময়ূরী নৃত্য করছে। এখন ময়ূর ময়ূরী—বড়ই মুশকিলে ফেলেছে'!" ইহার দুই তিন দিন পরে শ্রীবৃন্দাবন হইতে ভক্ত চুণীলাল ফিরিয়া আসিলে শ্রীরামকৃষ্ণ ব্যগ্র-ভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'রাখাল কেমন আছে?' চুণীবাবু তদুত্তরে বলিলেন, "আজ্ঞে, ভাল আছেন।" ঠাকুর ইহা শুনিয়া আনন্দিত হইলেন।

শ্রীবৃন্দাবনে রাখাল

রাখাল শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া এক আনন্দময় মাধুর্য্যরসের আস্বাদ পাইলেন। শ্রীবৃন্দাবনের অনুপম শ্যামশোভা ও অবিচ্ছিন্ন আনন্দের প্রবাহ দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইতে লাগিলেন। আনন্দময় ব্রজধামে বিচরণ করিতে করিতে ব্রজেশ্বরের লীলাস্থানগুলি দর্শন করিয়া রাখাল আনন্দে আত্মহারা ও বিহ্বল হইতেন। সেই বিস্মৃত-যুগের কথা তাঁহার চিত্তদর্পণে প্রতিবিম্বিত হইয়া যেন নয়ন সমক্ষে ভাসিয়া উঠিত। তাঁহার মনে হইত সেই বৃন্দাবন! সেই যমুনা—শ্যামসুন্দরের মধুর মুরলীধ্বনিতে নাচিতে নাচিতে যাহা উজানে বহিয়া যাইত; সেই গোচারণ মাঠ—যেখানে ব্রজেশ্বরের বংশীধ্বনি শুনিয়া শ্যামলী-ধবলী গাভীর দল হাম্বা হাম্বা রবে ছুটিয়া আসিত! শ্রীদাম, সুদাম, দাম, বসুদাম ও সুবলাদি ব্রজরাখালদের সঙ্গে রাখালরাজ ঘুরিয়া বেড়াইতেন, এই ব্রজমণ্ডলেই পাঁচন হাতে নূপুর পায়ে শ্যামসুন্দরের চারিদিকে নৃত্যরত সখার দল আনন্দে মাতিয়া থাকিত! এই সেই বৃন্দাবন—যেখানে নন্দরাণী মা যশোদা ব্যাকুলভাবে ক্ষীর, সর, নবনী হাতে নন্দলালের জন্য দাঁড়াইয়া রহিতেন! এই সেই ব্রজধাম—যেখানে মুরলীর তানে গোপ-গোপীরা আত্মহারা হইয়া মধুর আকর্ষণে যমুনার কূলে কূলে শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রকে খুঁজিয়া বেড়াইত! এই সেই বৃন্দাবন—যেখানে পবিত্র রজঃ কৃষ্ণ-পদচিহ্ন ধারণ করিয়া রহিয়াছে, যাহা শিরে লইলে জন্ম সার্থক হয়, বক্ষে স্পর্শ করিলে তপ্ত হৃদয় শীতল করে, অঙ্গে মাখিলে সকল জ্বালা জুড়াইয়া যায়, সর্ব্ব দেহ মন ইন্দ্রিয় পবিত্র হয়! সেই বৃন্দাবনে কুঞ্জে কুঞ্জে বনে বনে কেকারবে ময়ূর ময়ূরী নৃত্য করিতেছে, বিরহবিধুর কৃষ্ণপ্রেম গাহিয়া বিভোর হইতেছে, বালক-বালিকা, যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা সকল ব্রজবাসী

করতালি দিয়া "জয় রাধে গোবিন্দ" বলিয়া প্রেমভরে নৃত্য করিতেছে! রাখালের হৃদয়ে ব্রজমাধুরীর অস্ফুট ছবি মনে উদিত হইলেই তাঁহার মনে পড়িত—শ্রীরামকৃষ্ণের স্নেহমাখা মূর্ত্তি! ব্রজের মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে না করিতে অনন্ত প্রেমসিন্ধু শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবে তিনি তন্ময় হইয়া পড়িতেন। ইহাই শ্রীশ্রীজগদম্বার লীলা। ব্রজধামে রাখালের যাহাতে স্বরূপ সত্তার অনুভব না হয় ইহাই ছিল মার নিকটে ঠাকুরের প্রার্থনা। তাই ব্রজধামে ব্রজভাবের স্ফূর্ত্তি হইতে না হইতে অনন্ত মাধুর্য্যময় শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতি তাঁহার মনে উদিত হইত। শ্রীকৃষ্ণসখার স্বরূপসত্তার পরিবর্ত্তে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার সন্তানভাবই জাগিয়া উঠিত।

শ্রীবৃন্দাবনে আসিয়া রাখালের হৃদয়ে প্রেমপদ্ম বিকশিত হইল। তাহার স্নিগ্ধ-শুভ্র-বিমলজ্যোতিতে তাঁহার দৃষ্টি উদার ও সম্প্রসারিত হইল এবং তাঁহার বালস্বভাবে এক প্রশান্ত গাম্ভীর্য্যের রেখা ফুটিয়া উঠিতে লাগিল। তাঁহার মনে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি একনিষ্ঠ প্রেমজনিত বালকের মত যে মান অভিমান হিংসার উদয় হইত, অনাবিল ভাব-প্রবাহে তাহা যেন কোথায় ভাসিয়া গেল। তাঁহার মনে হইত চিরক্ষমাশীলা স্নেহময়ী জননীর মত তিনি তাঁহার সকল অপরাধ সকল ত্রুটি উপেক্ষা করিয়া এক অপার্থিব ও মঙ্গলময় স্নেহের আবেষ্টনে তাঁহাকে ঘিরিয়া রাখিয়াছেন। তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য রাখাল চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। ঘটনাক্রমে সেই সময়ে বলরামবাবু সপরিবারে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য উদ্যোগ করিতেছিলেন। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে নভেম্বরের শেষ ভাগে রাখাল ব্রজধাম হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

অমৃতের পথে

শ্রীবৃন্দাবন হইতে প্রত্যাগত হইয়া রাখাল দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের পাদপদ্ম বন্দনা করিলেন। প্রায় তিনমাস পরে রাখালকে সুস্থ শরীরে ব্রজমণ্ডল হইতে ফিরিতে দেখিয়া ঠাকুর পরম আনন্দিত হইলেন। রাখাল ভক্তদের নিকট অবগত হইলেন যে বৃন্দাবনে তাঁহার পীড়ার সংবাদে ঠাকুর কত ব্যাকুল ও উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহার আরোগ্যের নিমিত্ত শ্রীশ্রীসিদ্ধেশ্বরীকে ডাব চিনি মানসিক করিয়াছিলেন। ইহা শ্রবণ করিয়া রাখালের হৃদয় আর্দ্র হইত এবং শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার গভীর প্রেম ও ভক্তি শতধারে উথলিয়া পড়িত।

রাখাল বৃন্দাবন হইতে আসিয়া অধিকাংশ সময় দক্ষিণেশ্বরে শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট থাকিতেন। ঠাকুরের ঘরে রাত্রিকালে পূর্ব্বের মত ক্যাম্পখাটে শুইতেন। তিনি দেখিতে পাইলেন যে ঠাকুরের নিকট অনেক অন্তরঙ্গ ভক্তের দল যাতায়াত করিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ স্কুল-কলেজে পড়িতেছেন, কেহ চাকরি করিতেছেন, কেহ উদাসীনভাবে রহিয়াছেন আবার কেহ কেহ বাড়ীঘর সব ত্যাগ করিয়া দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের সেবা ও তাঁহার উপদেশমত সাধন-ভজনে নিরত আছেন। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ রাখালের প্রায় সমবয়স্ক, কেহ বয়সে জ্যেষ্ঠ, আবার কেহ বা

কনিষ্ঠ। ইঁহাদের অনেকেই তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত, কেহ কেহ তাঁহার ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ বন্ধু। শ্রীবৃন্দাবন হইতে আসিয়া ইঁহাদের প্রায় সকলের সহিত রাখাল ঘনিষ্ঠ প্রীতির সম্বন্ধে আবদ্ধ হইলেন। ইঁহারা যে তাঁহার পরম প্রেমাস্পদ ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্ত, একই স্নেহডোরে যে তাঁহারা সকলেই বাঁধা! ইঁহাদের সকলের দেহ মন ও বুদ্ধি যে শ্রীরামকৃষ্ণের পাদপদ্মে অর্পিত, সকলের হৃদয় তাঁহার প্রেমে অনুপ্রাণিত এবং তাঁহার আকর্ষণে আকৃষ্ট। এই সব অন্তরঙ্গ ভক্তদের প্রতি ঠাকুর আদর ও স্নেহ দেখাইয়া সকলের নিকট উচ্চ প্রশংসা করিলেও রাখালের মনে পূর্ব্বের ন্যায় এখন আর কোন মান, অভিমান, ক্ষোভ বা ঈর্ষ্যার উদয় হইত না। বরং তাঁহারাস কলেই শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয় বলিয়া তাঁহাদের প্রতি তাঁহার হৃদয়ে একটা অপূর্ব্ব ভালবাসার আকর্ষণ ও শ্রদ্ধা জাগিয়া উঠিত। তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতে লাগিলেন, "চাঁদামামা,সকলেরই মামা"—কাহারও একার নহে।

রাখালের মনের এই পরিবর্ত্তন এবং এই নূতন দৃষ্টিভঙ্গী সাধনের জন্যই শ্রীশ্রীজগদম্বা তাঁহাকে ব্রজধামে সরাইয়া লইয়া যান। ঠাকুরের সঙ্গে রাখালের অলৌকিক সম্বন্ধ আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে শ্রীরামকৃষ্ণলীলায় রাখালের একটী বিশিষ্ট স্থান আছে। যিনি জগজ্জননীর সাক্ষাৎ দান, যিনি শ্রীরামকৃষ্ণের প্রার্থিত শুদ্ধসত্ত্ব ছেলে, যিনি ঈশ্বরকোটী ও নিত্যসিদ্ধ, তাঁহাকে সাধারণ দৃষ্টিতে দেখিলে মানুষ কতটুকু বুঝিতে পারে? যাঁহার সম্বন্ধে ঠাকুর স্বয়ং বলিয়াছেন যে, "রাখাল যুগে যুগে প্রত্যেক অবতারের লীলা-সহচর হয়ে এসেছে" তাঁহার দিব্যভাবময় জীবনের—তাঁহার অদ্ভুত কর্ম্মের কে ইয়ত্তা করিবে? যে মহাশক্তি রামকৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ

হইয়াছেন, যে মহাশক্তির লীলার জন্য রাখাল আহূত, যে মহাকার্য্যের জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ পার্ষদ সন্তানেরা মহাশক্তির আকর্ষণে ধরাধামে সমানীত, সেই মহাশক্তিই রাখালের হৃদয়কমলে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রেমদীপ্তির আভায় তাঁহাকে দিন দিন সমুজ্জ্বল করিবার জন্য শ্রীবৃন্দাবনধামে লইয়া গেলেন। যিনি উত্তরকালে শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সঙ্ঘের সঙ্ঘনায়করূপে শীর্ষস্থানে অবস্থিত হইবেন, যিনি আদর্শ আচার্য্য, গুরু ও নেতারূপে ভবিষ্যতে ধর্ম্মচক্র পরিচালনা করিবেন, যিনি আধ্যাত্মিক জগতে শতসহস্র পিপাসু নরনারীকে শান্তির অমৃতবারি দান করিবার জন্য শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসঙ্গী হইয়া আসিয়াছেন এবং যিনি ভাবতন্ময়তার অপূর্ব্ব কমনীয় মূর্ত্তিরূপে সকলের প্রত্যক্ষ-গোচর হইবেন—তাঁহার সেই দিব্য ভাবকে পরিস্ফুট করাইবার জন্যই মহামায়া শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট হইতে তাঁহাকে অপসারিত করিয়াছিলেন। বালস্বভাব রাখাল ভাবী কার্য্যবিষয়ে এখনও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। তাই ঠাকুর মা জগদম্বার নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিয়াছিলেন, "মা, ও ছেলেমানুষ, বোঝে না তাই কখন কখন অভিমান করে।" গুরু-শিষ্য, পিতা-পুত্র এবং জননী-সন্তান প্রভৃতি প্রেমের যে আকারই হউক বিরহের অগ্নিশুদ্ধিতে সকল মলিনতা চলিয়া গিয়া তাহার বিশুদ্ধ উজ্জ্বল রূপ ফুটিয়া উঠে। ইতিহাসে, পুরাণে এবং প্রাচীন কাহিনীতে ইহার শত শত দৃষ্টান্ত আছে। তাই শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরামকৃষ্ণের বিরহে রাখালের হৃদয়ে এই অপূর্ব্ব প্রেমের প্রেরণা আসিয়াছিল। যাঁহাদের লইয়া শ্রীরামকৃষ্ণলীলায় সঙ্ঘগঠন হইবে, তাঁহাদের সঙ্গে রাখাল সেই অপূর্ব্ব প্রেমসূত্রেই যুক্ত হইলেন। যে আশঙ্কায় শ্রীরামকৃষ্ণ উদ্বিগ্ন ও ভীত হইয়াছিলেন,

পাছে মার প্রেরিত পার্ষদ সন্তানদের হিংসা করিয়া রাখালের অকল্যাণ হয়, বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া আসিলে রাখালকে দেখিয়া তাঁহার সে আশঙ্কা সম্পূর্ণ দূরীভূত হইয়াছিল।

দক্ষিণেশ্বরে কয়েক মাস বাস করিবার পর রাখালের শরীর আবার কিছু অসুস্থ হইয়া পড়ে। ঠাকুরও তৎকালে সর্দ্দি ও গলার বেদনায় কষ্ট পাইতেছিলেন। রাখাল জানিতেন, তাঁহার সামান্য কোন পীড়ার সংবাদে ঠাকুর কেমন ব্যস্ত ও উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন। দক্ষিণেশ্বরে থাকিলে তাঁহার পীড়ার কথা ঠাকুরের কাছে গোপন থাকিবে না। ঠাকুরের এই অসুস্থ শরীরে তিনি যাহাতে তাঁহার কোন উদ্বেগ বা চিন্তার কারণ না হন, রাখাল তাই তাঁহার শারীরিক অসুস্থতার কোন কথা ঠাকুরের নিকট উল্লেখ না করিয়া কলিকাতায় পিতৃগৃহে চলিয়া আসেন। বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া সেই সর্ব্বপ্রথম রাখালের পিতৃগৃহে বাস। প্রসঙ্গক্রমে ঠাকুর এই সময়ে তাঁহার কোন কোন ভক্তের নিকটে বলিয়াছিলেন, "রাখাল এখন পেনসন খাচ্ছে। বৃন্দাবন থেকে এসে—এখন বাড়ীতে বাস করছে।"

নরেন্দ্র, রাখাল প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ভক্তদিগকে দেখিবার জন্য ঠাকুর মাঝে মাঝে বলরামের গৃহে যাইতেন। তাঁহার আগমন সংবাদ যাহাতে ভক্তেরা পায় শ্রীযুত বলরামের উপর সেইরূপ নির্দ্দেশ ছিল। নরেন্দ্র ও রাখালকে না দেখিলে ঠাকুর ব্যস্ত হইবেন ভাবিয়া তিনি সর্ব্বাগ্রে ইঁহাদের নিকট ঠাকুরের আগমন-সংবাদ পাঠাইতেন। একদিন বলরামের গৃহে প্রাতঃকালেই ভাবাবিষ্ট শ্রীরামকৃষ্ণ ঈশ্বরীয় কথায় বিভোর হইয়া রাখালাদির সঙ্গে কোন কথা বলিতে পারেন নাই। পাছে ঠাকুর পরে তাঁহাকে তাঁহার

শারীরিক স্বাস্থ্যের কথা জিজ্ঞাসা করেন এই আশঙ্কায় রাখাল ঠাকুরকে না জানাইয়া ধীরে ধীরে গৃহে চলিয়া যান। বেলা প্রায় একটার পর ঠাকুর প্রকৃতিস্থ-হইয়া রাখালকে দেখিতে না পাইয়া শ্রীযুত লাটুকে (অদ্ভুতানন্দ স্বামিজী) জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাখাল কোথায় ?" লাটু উত্তর করিলেন, "চলে গেছে বাড়ী।" শ্রীরামকৃষ্ণ বিস্মিত হইয়া বলিলেন, "সে কি ! আমার সঙ্গে দেখা না করে ?" ঠাকুর অবশেষে সব জানিতে পারিলেন। তিন দিন পরেই কথাপ্রসঙ্গে তিনি তাঁহার ভক্তদিগের নিকট বলিয়াছিলেন, "রাখাল বাড়ীতে আছে। তারও শরীর বড় ভাল নয়। ফোঁড়া হয়েছে। একটি ছেলে বুঝি তার হবে।" রাখাল সুস্থ হইবামাত্র দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া আসিলেন।

দক্ষিণেশ্বরে চলিয়া আসিবার কয়েকদিন পরে একদিন রাত্রি নয়টার সময় তান্ত্রিকসাধক শ্রীযুত মহিমাচরণ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের নিকট তাঁহার একটী অভিলাষ ব্যক্ত করিলেন। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মুখে তিনি উপস্থিত ভক্তদের লইয়া একটী ব্রহ্মচক্র রচনা করিয়া সাধন করেন।

সেদিন কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর রাত্রি। রাণী রাসমণির দেবালয়, গৃহ ও প্রাঙ্গণ তখন নীরব নিস্তব্ধ। ঠাকুরের ঘরখানি সেই নিঃশব্দ রজনীতে এক দিব্যভাবে পরিপূর্ণ ছিল। সেই ঘোরা তমিস্রা নিশায় মুহুর্মুহুঃ সমাধিমগ্ন, অনন্ত ভাব-সিন্ধু, মাতৃগত-প্রাণ শ্রীরামকৃষ্ণের সম্মুখে তান্ত্রিকসাধক মহিমাচরণ মহাশক্তির আরাধনায় শ্রীযুত মাষ্টার মহাশয়, কিশোরী প্রমুখ দুই একটী ভক্ত এবং রাখালকে লইয়া তাঁহার ঈপ্সিত ব্রহ্মচক্র রচনা করিলেন। মন্দিরের বিরাট

নিস্তব্ধতার মধ্যে চারিদিকে ঝিল্লীরব এবং পূতসলিলা ভাগীরথীর কলকলধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই শ্রুতিগোচর হইতেছিল না। চক্রমধ্যস্থ সমবেত সকলকে ধ্যান করিতে মহিমাচরণ অনুরোধ করিলেন। ঠাকুর ছোট খাটটীতে বসিয়া একদৃষ্টে সব দেখিতেছিলেন। ধ্যান করিতে করিতে সহসা রাখালের ভাবাবস্থা উপস্থিত হইল। ঠাকুর ইহা দেখিতে পাইয়া তৎক্ষণাৎ খাট হইতে অবতরণ করিয়া গম্ভীর কণ্ঠে শ্রীশ্রীজগদম্বার মধুর নাম করিতে করিতে রাখালের বুকে হাত বুলাইতে লাগিলেন। ধ্যানরত সাধকেরা চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেন এই অপূর্ব্ব দৃশ্য। ধীরে ধীরে রাখালের বাহ্যসংজ্ঞা ফিরিয়া আসিল। তৎকালে কোন বিষয়ে একটু উদ্দীপনা হইলেই রাখাল একেবারে তন্ময় হইয়া যাইতেন।

ইহার দুই দিন পরে ঠাকুর হঠাৎ বেলা ৮টা হইতে অপরাহ্ণ ৩টা পর্য্যন্ত মৌনাবলম্বন করিয়াছিলেন। ঠাকুরের তখন গলার বিচিতে বেদনা ও শরীর অসুস্থ। এই সদানন্দ পুরুষকে সম্পূর্ণ মৌন হইতে দেখিয়া শ্রীশ্রীমা, রাখাল এবং লাটু কাঁদিতেছিলেন। মৌন ভঙ্গ হইলে তিনি বলিলেন, "মা দেখিয়ে দিচ্ছিলেন যে সবই মায়া ; তিনিই সত্য, আর যা কিছু সব মায়ার ঐশ্বর্য্য। আর একটি দেখলুম, ভক্তদের কার কতটা হয়েছে।" ঠাকুর রাখালকেও তন্মধ্যে দেখিয়াছিলেন। কিন্তু কে কতটা আধ্যাত্মিক পথে উন্নত সে সম্বন্ধে তিনি কিছু বলিলেন না। পূজ্যপাদ সারদানন্দ স্বামী লীলাপ্রসঙ্গে লিখিয়াছেন যে, ঠাকুর তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "রাখালের সম্বন্ধে মা কত কি দেখাইয়াছেন। তাহার অনেক কথা বলিতে নিষেধ আছে।" সে গুপ্তরহস্য কে ব্যক্ত করিবে ?

এই ঘটনার প্রায় মাস দুই পূর্ব্বেই ঠাকুরের গলরোগের সূত্রপাত হইয়াছিল। রোগ ক্রমশঃ কঠিন আকার ধারণ করিল। শাকসবজি তরিতরকারি বা কোন শক্ত দ্রব্য তিনি গলাধঃকরণ করিতে পারিতেন না। হঠাৎ একদিন শোনা গেল যে তাঁহার কণ্ঠতালুদেশ হইতে রক্ত নির্গত হইয়াছে। ভক্তেরা তখন ঠাকুরকে কলিকাতায় আনিয়া চিকিৎসা করিবার ব্যবস্থা করিলেন। প্রথমে বলরামের গৃহে কয়েকদিন থাকিয়া শ্যামপুকুরের একটী ভাড়াটিয়া বাড়ীতে ঠাকুর আসিলেন। সুবিখ্যাত কবিরাজেরা কোন আশা ভরসা না দেওয়ায় এবং তীব্র ঔষধাদি তাঁহার ধাতে সহ্য হয় না বলিয়া সকলে হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা করাই সঙ্গত বোধ করিলেন। তৎকালে উক্ত মতে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিকিৎসক ছিলেন—তাঁহারই চিকিৎসাধীনে ঠাকুর রহিলেন। পথ্যাদি প্রস্তুত ও সেবাশুশ্রূষার জন্য শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী শ্যামপুকুরের বাড়ীতে আগমন করিলেন। রাত্রি জাগিয়া ঔষধ পথ্য ব্যবস্থার ভার নরেন্দ্র, রাখাল প্রমুখ অন্তরঙ্গ ভক্তের দল লইলেন। গৃহী ভক্তেরা সাধ্যমত সমুদায় খরচপত্র বহন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। ব্যয়ভার লাঘব করিবার জন্য রাখালপ্রমুখ শ্রীরামকৃষ্ণের তরুণ অন্তরঙ্গ সেবকেরা গৃহে গিয়া ভোজনাদিকার্য্য সমাপন করিতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণকে এইরূপ কঠিন রোগগ্রস্ত হইতে দেখিয়া রাখাল প্রথমে নির্ব্বাক হতবুদ্ধির ন্যায় হইয়া রহিলেন। সর্দ্দি ও গলার বিচিতে বেদনা যে এইরূপ কঠিন রোগে পরিণত হইবে তাহা তিনি ইতঃপূর্ব্বে কল্পনায়ও আনিতে পারেন নাই। ঠাকুরের রোগ-যন্ত্রণা দেখিয়া

কখন কখন তাঁহার হৃদয়ে অন্তস্তলের মর্ম্মস্থান ভেদ করিয়া এক দুঃসহ বেদনা উঠিত, তাঁহার বক্ষপিঞ্জর নৈরাশ্যের হাহাকারে কখন কখন ভাঙ্গিয়া পড়িত আবার কখন নিশ্চল পাষাণ পুত্তলিকার মত স্থিরদৃষ্টে তাঁহার দিকে চাহিয়া থাকিতেন। নিরুপায় দেখিয়া তিনি মা জগদম্বার নিকট তাঁহার আরোগ্যের জন্য ব্যথিত হৃদয়ে প্রার্থনা করিতেন। রাখালের নীরব অন্তর্ভেদী প্রার্থনা কোন্ মহাশূন্যে বিলীন হইত কে জানে?

রাখালের বুক সর্ব্বদা অব্যক্ত ব্যথায় ভরিয়া থাকিত। রাখাল দেখিলেন চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষা যথারীতি চলিলেও রোগের কোনরূপ উপশম দেখা যহিতেছে না। ভাবিতে ভাবিতে রাখালের মনে কি যেন এক আশঙ্কার রুদ্রমূর্ত্তি ভাসিয়া উঠিত। রাখাল ভয়-চকিত ও বিহ্বল হইয়া পড়িলেও প্রাণপাত করিয়া ঠাকুরের সেবা করিবার জন্য দৃঢ়সংকল্প হইলেন।

শ্যামপুকুরে গৃহী ভক্ত ও তরুণ অন্তরঙ্গেরা শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া সম্মিলিত হইলেন। তাঁহাদের মধ্যে পরস্পরের ঘনিষ্ঠতা বাড়িতে লাগিল। কিন্তু ঠাকুর সম্বন্ধে ইহাদের মধ্যে মতের কোন সামঞ্জস্য বা মিল ছিল না। গিরিশাদি ভক্তেরা যাঁহারা তাঁহাকে সাক্ষাৎ পূর্ণব্রহ্ম বা যুগাবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতেন তাঁহারা ঠাকুরের এই কঠিন রোগকে একটা মিথ্যা ভান বলিয়া ধরিয়া লইতেন। তাঁহাদের বিশ্বাস কোন উদ্দেশ্য সাধনের জন্য এই রোগের ছলনা। কার্য্য সংসাধিত হইলে আবার পূর্ব্বস্বাস্থ্য লাভ হইবে। আবার কোন কোন ভক্ত ঠাকুরকে শ্রীশ্রীজগদম্বার যন্ত্রস্বরূপ

মনে করিতেন। তাঁহাদের বিশ্বাস জগজ্জননী কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধন করিবার জন্য তাঁহার শরীরে এই কঠিন ব্যাধি দিয়াছেন। সে উদ্দেশ্য পূর্ণ হইলেই জগন্মাতা তাঁহার ব্যাধি আরোগ্য করিবেন। কিন্তু তরুণ অন্তরঙ্গ ভক্তেরা ভাবিতেন জন্ম মৃত্যু ব্যাধি দেহের ধর্ম; সুতরাং ইহার মধ্যে কোন অলৌকিক গূঢ় রহস্য আরোপ করা অনাবশ্যক। যতদিন তাঁহার ব্যাধি থাকিবে ততদিন নির্ব্বিচারে তাঁহার রীতিমত চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রূষা করাই তাঁহাদের নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম।

চারিদিকে এই সব অলৌকিক কল্পনা বা আলোচনার কথা রাখালের কর্ণে প্রবেশ করিলেও তাঁহার হৃদয়কে তাহা কিছুমাত্র স্পর্শ করিত না। তিনি মনে মনে ভাবিতেন যে, যাঁহাকে লইয়া এই সব নিরর্থক আলোচনা কিংবা তর্ক বিতর্ক, তিনি যে সকলের চক্ষুর সম্মুখে দিন দিন দুর্ব্বল হইয়া পড়িতেছেন। সুতরাং ইহাতে বৃথা শক্তি ক্ষয় না করিয়া একাগ্রভাবে তাঁহার প্রাণপণ সেবা এবং রোগ-যন্ত্রণা যাহাতে লাঘব হয় তৎপ্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখাই বর্ত্তমান ক্ষেত্রে একমাত্র কর্ত্তব্য। মাতাপিতার গুরুতর অসুস্থতায় কেহ কি তাঁহাদের সম্বন্ধে দার্শনিক বা আধ্যাত্মিক বিচার করিতে বসে? রাখালের এই সব প্রসঙ্গ বিষবৎ জ্ঞান হইত।

শ্যামপুকুরের বাড়ীতে কালীপূজার পূর্ব্বদিন অর্থাৎ ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে ৫ই নভেম্বর বৃহস্পতিবার ঠাকুর অকস্মাৎ তাঁহার কয়েকটী অন্তরঙ্গ ভক্তকে বলিলেন, "কাল কালীপূজা, পূজার সব উপকরণ ঠিক রাখিস।" ঠাকুরের এইমাত্র নির্দ্দেশ থাকায় ভক্তেরা বিষম সমস্যায় পড়িলেন। কোন্ উপচারে মায়ের পূজা হইবে

এবং কিরূপ ভোগের ব্যবস্থা থাকিবে তাহার কোন উল্লেখ না থাকায় তাঁহারা সকলে বহু জল্পনা কল্পনা করিয়াও স্থির সিদ্ধান্তে আসিতে পারিলেন না। অগত্যা তাঁহারা শুধু গন্ধপুষ্প ধূপ দীপ এবং ভোগের জন্য কিছু মিষ্টান্ন ও পায়েসের বন্দোবস্ত রাখিলেন। তাঁহারা স্থির করিলেন পরে ঠাকুর আদেশ করিলে অন্যান্য দ্রব্য সংগ্রহ করা যাইবে। কিন্তু আশ্চর্য্য, কালীপূজার দিন রাত্রি সাতটা পর্য্যন্ত ঠাকুর পূজার কোন কথাই উত্থাপন করিলেন না। অন্যান্য দিনের মত তিনি স্থিরভাবে শয্যায় বসিয়া রহিলেন। ভক্তেরা নিরুপায় হইয়া ঠাকুরের সন্নিকটে পূর্ব্বদিকে স্থান মার্জ্জনা করিয়া সংগৃহীত দ্রব্য-গুলি রাখিলেন। ঠাকুরকে তথাপি নীরব দেখিয়া তাঁহারা কিছুক্ষণ পরে শয্যাপার্শ্বে সমুদায় উপকরণগুলি স্থাপিত করিয়া ধূপ দীপ জ্বালাইয়া দিলেন। ঘর আলোকিত ও ধূপগন্ধে আমোদিত হইল। ঠাকুরকে বেষ্টন করিয়া সকলেই নীরব নিস্তব্ধ ও ধ্যানমগ্ন। সহসা গিরিশচন্দ্র পুষ্পচন্দন লইয়া "জয় মা" বলিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের পাদপদ্মে অঞ্জলি প্রদান করিলেন। অমনি ঠাকুর শিহরিয়া জগন্মাতার ভাবে আবিষ্ট হইয়া গভীর সমাধিমগ্ন হইলেন। দুই হাতে বরাভয় মুদ্রা ধারণ করিয়া তিনি এক দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিলেন। ভক্তেরা কেহ "মা ব্রহ্মময়ী" কেহ "জয় মা" বলিয়া শ্রীপাদপদ্মে পুষ্পাঞ্জলি দিলেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ৬ই নভেম্বর, শুক্রবার অমাবস্যা তিথিতে শ্রীশ্রীশ্যামা-পূজার রাত্রিতে শ্রীরামকৃষ্ণে জগন্মাতার আবেশ হয়।

রাখাল তখন প্রত্যক্ষ করিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীশ্রীজগন্মাতা

অভিন্ন। আপদে বিপদে তাঁহার বরাভয় সর্ব্বদা তাঁহাকে রক্ষা করিতেছে। যে সন্তানভাবে তন্ময় হইয়া রাখাল শ্রীরামকৃষ্ণকে স্নেহময়ী জননীস্বরূপে দেখিতেন, বাৎসল্যরসে আপ্লুত হইয়া যাঁহার অনন্ত মাধুর্য্যসুধা পান করিতেন, আজ দেখিলেন তিনি শুধু তাঁহার জননী নহেন—নিখিল বিশ্বের জীব-জগতের তিনি জগদ্ধাত্রী জগজ্জননী! যে মাতৃমূর্ত্তি তিনি শ্রীরামকৃষ্ণে প্রতিবিম্বিত দেখিতেন, আজ দেখিলেন সেই মাতৃমূর্ত্তির বিরাট জ্যোতির্ম্ময়ী প্রতিমা। রাখাল অনিমেষলোচনে পরমানন্দে তন্ময়ভাবে জননীর দিব্য মাধুর্য্যরস আস্বাদন করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে "জয় মা" বলিয়া তিনিও সেই শ্রীচরণে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করিলেন।

শ্যামপুকুরে শ্রীশ্রীশ্যামাপূজার রাত্রিতে ঠাকুরকে জগন্মাতারূপে দর্শন করিয়া রাখালের মনে অপূর্ব্ব ভাবান্তর ঘটিল। তিনি প্রাণে প্রাণে উপলব্ধি করিলেন যে ঠাকুরের এই পীড়া ও রোগযন্ত্রণা তিনি স্বেচ্ছায় বরণ করিয়াছেন। ঠাকুরের পীড়ার ও যন্ত্রণার জন্য তাঁহার পূর্ব্বেকার মানসিক চাঞ্চল্য, ব্যস্ততা ও গভীর চিত্তক্লেশ চলিয়া গেল। তিনি তাঁহার সেবায় ও চিন্তায় তন্ময় হইতে লাগিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ঔষধে কোন ফল হইতেছে না দেখিয়া ডাক্তার সরকার সহরের উপকণ্ঠে কোন বাগান বাড়ীতে ঠাকুরকে রাখিবার বন্দোবস্ত করিতে বলিলেন। খুঁজিতে খুঁজিতে ভক্তেরা কাশীপুরে একটী উদ্যানবাড়ী পাইলেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের ১১ই ডিসেম্বর, ২৭শে অগ্রহায়ণ শুভ শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে শুক্রবার দিন ভক্তেরা শ্রীরামকৃষ্ণকে সেই কাশীপুরের

উদ্যানবাড়ীতে লইয়া গেলেন। রাখালও তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

কয়েক দিন পরে মনোমোহন ঠাকুরের নিকট প্রকাশ করিলেন যে রাখালের একটী পুত্রসন্তান হইয়াছে। রাখাল শুনিয়া নির্ব্বিকার চিত্তে রহিলেন। তাঁহার মনে তখন গভীর বৈরাগ্যজনিত প্রশান্তি বিরাজ করিতেছিল। মায়ার লেশমাত্র তাঁহার অন্তর স্পর্শ করিতে পারে নাই। কোন বন্ধনেই মহামায়া আর তাঁহাকে আবদ্ধ করিতে পারিলেন না।

অনন্তর ঠাকুর একদিন প্রসঙ্গক্রমে গিরিশকে বলিয়াছিলেন, "রাখাল-টাখাল এখন বুঝেছে, কোনটা ভাল, কোনটা মন্দ, কোনটা সত্য, কোনটা মিথ্যা। ওরা যে সংসারে গিয়ে থাকে, সে জেনে শুনে। পরিবার আছে, ছেলেও হয়েছে—কিন্তু বুঝেছে যে সে সব মিথ্যা, অনিত্য। রাখাল-টাখাল এরা সংসারে লিপ্ত হবে না। যেমন পাঁকাল মাছ। পাঁকের ভিতর বাস, কিন্তু গায়ে পাঁকের দাগটী পর্য্যন্ত নেই।"

বাস্তবিকই তখন রাখালের মনে হইত যে এই অমৃতময় দিব্যপুরুষের সমগ্র জীবন, সমগ্র ভাবপ্রবাহ, নিখিল জীবজগতের প্রতি তাঁহার অহৈতুকী করুণা ও অপার্থিব স্নেহ যেন অনন্ত আনন্দের অমৃত নির্ঝর হইতে ঝরিয়া পড়িতেছে। সেই অমৃতের পথের পথিক হইবার জন্য রাখালের হৃদয়ে একটা তীব্র পিপাসা জাগিয়া উঠিল।

কাশীপুর উদ্যানে রুগ্ন অবস্থায় ঠাকুর তাঁহার অন্তরঙ্গ যুবক ভক্তদিগকে ত্যাগ ও তপস্যার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত করিতেছিলেন।

নরেন্দ্র, রাখাল, নিরঞ্জন, শরৎ, শশী, বাবুরাম, তারক, যোগীন, কালী, লাটু ও গোপাল প্রায় সর্ব্বদা কাশীপুরে বাস করিতেন। ঠাকুর তাঁহাদের প্রত্যেককে চরম আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও ঈশ্বরলাভের জন্য অধিকারী ভেদে সাধন-ভজনের প্রণালী বলিয়া দিতেন।

কিন্তু রাখালের অন্তর্মুখী ভাবতন্ময়তা বুঝিয়া ঠাকুর তাঁহাকে গোপনে অপরূপ দিব্য ভাবের সূক্ষ্ম অনুভূতির রাজ্যে পরিচালিত করিতে লাগিলেন। রাখাল দিনমানে শ্রীরামকৃষ্ণের সম্যকরূপে সেবা করিয়াও নির্জ্জনে ঠাকুরের ইঙ্গিত মত সাধনায় সারারাত্র অতিবাহিত করিতেন। স্বামী সারদানন্দ কথাপ্রসঙ্গে ইহা উল্লেখ করিয়া বলিতেন, "স্বামিজী (নরেন্দ্র) ও মহারাজ (রাখাল) ঠাকুরের এত সেবা করেও ক্লান্তি বোধ করতেন না। তাঁরা দুজনে সারারাত সাধন-ভজন নিয়েই থাকতেন।"

প্রায় প্রত্যহই সন্ধ্যার পর শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে তাঁহার সন্নিধানে ডাকাইয়া দুই তিন ঘণ্টা কাল তাঁহার সহিত ভাবী সঙ্ঘ-গঠনের বিষয় সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। তাঁহার এই সব ত্যাগী যুবক ভক্তেরা পুনরায় সংসারে যাহাতে না যায় এবং কি ভাবে তাঁহাদিগকে একত্রে রাখিয়া পরিচালিত করা যাইতে পারে তৎসম্বন্ধে ঠাকুর তাঁহাকে যথাযোগ্য উপদেশ দিতেন। একদিন ঠাকুর তাঁহাকে নিভৃতে বলিলেন, "রাখালের রাজবুদ্ধি আছে, ইচ্ছে করলে সে একটা প্রকাণ্ড রাজ্য চালাতে পারে।" তীক্ষ্ণবুদ্ধি নরেন্দ্রনাথ অমনি বুঝিতে পারিলেন যে রাখালকেই ভাবী সঙ্ঘের সঙ্ঘনায়ক-পদে বরণ করাই ঠাকুরের অভিপ্রায়। উত্তরকালে নরেন্দ্রনাথ এই নির্দ্দেশ মতই কাজ করিয়াছিলেন।

অনন্তর একদিন নরেন্দ্রনাথ তাঁহার গুরুভ্রাতাদের নিকট প্রসঙ্গক্রমে রাখালের কথা উত্থাপন করিয়া বলিলেন, "আজ থেকে আমরা রাখালকে 'রাজা' বলে ডাকব।" তাঁহার প্রতি ঠাকুরের আদর ও স্নেহ-বাৎসল্য স্মরণ করিয়া নরেন্দ্রের প্রস্তাব সকলেই পরমানন্দে অনুমোদন করিলেন। ক্রমে এই কথা ঠাকুরের কানেও উঠিল। তিনি শুনিয়া অত্যন্ত আনন্দ সহকারে নরেন্দ্র প্রমুখ অন্তরঙ্গ ভক্তদিগকে বলিলেন, "রাখালের ঠিক নাম হয়েছে।" ইহাই তাঁহার ভাবী সঙ্ঘনায়কত্বের পূর্ব্বাভাস।

নরেন্দ্রনাথকে ডাকিয়া ঠাকুরের প্রত্যহ এইরূপ আলোচনা ও শিক্ষাদানের কথা অপর অন্তরঙ্গ ভক্তেরা জানিতে পারিলেন। তাঁহাদের মনে স্বতঃই উদিত হইল যে তাঁহাদিগকে একস্থানে একত্রিত করিয়া একটি সঙ্ঘ গঠন করিবার উদ্দেশ্যে ঠাকুর পীড়ার একটা অছিলা করিয়াছেন। তাঁহার উদ্দেশ্য সাধিত হইলেই পুনরায় পূর্ব্বস্বাস্থ্য লাভ করিবেন। এইরূপ আশার সঞ্চার তাঁহাদের প্রায় সকলের অন্তরেই হইতে লাগিল।

সত্য সত্যই ঠাকুর তাঁহাদের সেই ভুল ভাঙ্গিয়া দিলেন। একদিন নরেন্দ্র ও রাখালের দিকে তাকাইয়া তিনি স্নেহে বিগলিত হইয়া পড়িতেছিলেন। শিশুর মত তাঁহাদিগকে আদর করিয়া মুখে হাত বুলাইতে বুলাইতে হঠাৎ তিনি বলিয়া উঠিলেন, "শরীরটা কিছুদিন থাকত তো লোকদের চৈতন্য হত। তা রাখবে না, সরল মূর্খ দেখে পাছে লোক সব ধরে পড়ে। সরল মূর্খ পাছে সব দিয়ে ফেলে! একে কলিতে ধ্যানজপ নাই।" রাখাল তখন মর্ম্মভেদী কাতরস্বরে তাঁহাকে বলিলেন, "আপনি বলুন, যাতে আপনার দেহ থাকে।" শ্রীরামকৃষ্ণ

উত্তর করিলেন, "সে ঈশ্বরের ইচ্ছা।" রাখাল চুপ করিয়া রহিলেন কিন্তু নরেন্দ্রনাথ তাহাতে বলিলেন, "আপনার ইচ্ছা ও ঈশ্বরের ইচ্ছা এক হয়ে গেছে।"

শ্রীরামকৃষ্ণের রোগ যেমন দিন দিন বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, এই সব যুবকের দল তেমনি অনন্যমন হইয়া সেবা ও সাধনভজনে নিরত হইলেন। উদ্যানবাটীর দ্বিতলে ঠাকুর থাকিতেন এবং সেবকেরা নিম্নতলে বাস করিতেন। তাঁহাদের ঘরে সর্ব্বদা সঙ্গীত, স্তোত্র ও শাস্ত্র পাঠ, মহাপুরুষদের জীবন আলোচনা, তাঁহাদের ত্যাগ তপস্যা ও কঠোর সাধনার চিন্তায় তাঁহাদের হৃদয় সর্ব্বদা উদ্দীপিত থাকিত। কেহ বাগানের বৃক্ষতলে, কেহ গৃহকোণে, কেহ দক্ষিণেশ্বরের পঞ্চবটীমূলে এবং কেহ গঙ্গাতীরে ধ্যানভজন করিতেন।

এই সাধকমণ্ডলীর মধ্যে গোপাল (অদ্বৈতানন্দ স্বামী) বয়সে প্রৌঢ় ছিলেন। ইনি পূর্ব্বে চিনাবাজারে বেণী পালের দোকানে কাজ করিতেন। স্ত্রীবিয়োগের পর সংসারত্যাগ করিয়া সাধন-ভজনে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। বেণী পালের বাড়ীতে ব্রাহ্ম সমাজের উৎসবে ইনি ঠাকুরকে প্রথম দর্শন করেন। তাঁহাকে দেখিয়াই গোপাল তাঁহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া পড়েন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে দেখিয়াই বুঝিলেন যে ইনি তাঁহার পূর্ব্বদৃষ্ট অন্তরঙ্গ ভক্তদের মধ্যে একজন। গোপাল নাম একাধিক থাকাতে রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে তাঁহার নাম ছিল 'বুড়ো' গোপাল। ঠাকুর পীড়িত হইয়া কাশীপুরে অবস্থান করিবার সময় গোপাল হিমালয়ের দুর্গম সুপবিত্র তীর্থ শ্রীকেদারনাথ ও শ্রীবদ্রীনারায়ণ দর্শন করিয়া আসেন এবং তদুপলক্ষে ঠাকুরের নিকট সাধু-ভোজনাদি

করাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। ঠাকুর তাঁহাকে বলেন, "কোথায় সাধু খুঁজ্‌বি এখানেই সব রয়েছে—এই ছোকরাদের খাওয়ালেই হবে।" গোপাল তাহাই করিলেন এবং তৎসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশ ও ইঙ্গিত মত মালাচন্দন ও কয়েকখানি গেরুয়া বস্ত্র আনিয়া ঠাকুরের সম্মুখে রাখিয়া দেন। ঠাকুর তাঁহার অন্তরঙ্গ কামকাঞ্চন-ত্যাগী শুদ্ধ যুবক ভক্তদিগকে স্বহস্তে একে একে সেই গৈরিক বসনগুলি দান করেন। সেই যুবকদের নাম—নরেন্দ্র, রাখাল, যোগীন্দ্র, বাবুরাম, নিরঞ্জন, তারক, শরৎ, শশী, গোপাল, কালী, ও লাটু। উদ্বৃত্ত একটী গেরুয়া বস্ত্র তাঁহার নিকটে রাখিয়া দিলেন। গিরিশচন্দ্র তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিলে তাঁহাকে উহা দান করেন।

এক অপূর্ব্ব আনন্দ প্রবাহের ভিতর দিয়া ঠাকুর ইহাদিগকে বৈরাগ্যের অমৃতময় পথে পরিচালিত করিতে লাগিলেন। সন্ন্যাসীর শুধু বাহ্যিক শাস্ত্রীয় রীতিনীতি পালনে ইহাদিগকে তিনি অনুপ্রাণিত করেন নাই,—অন্তরে প্রেম ও বৈরাগ্যের দীপ্ত বহ্নি জ্বালিয়া দিয়াছিলেন। বরং কাহারও ভিতর সে ভাবের অণুমাত্র ব্যতিক্রম দেখিলে তাঁহাকে প্রকাশ্যেই বলিতেন, "ও কি, শুকনো সাধু হবি কেন?" বৈরাগ্যকে তিনি আনন্দমণ্ডিত করিয়াছিলেন। সেই সদানন্দ পুরুষ তাঁহার অন্তরঙ্গ শিষ্যদিগকে একটী আনন্দময় মূর্ত্তিরূপে গড়িয়া তুলিলেন। 'রসে বশেই' থাকিতে বলিতেন এবং তজ্জন্যই সংস্কারযুগে এই ইংরাজী শিক্ষিত ব্রাহ্মভাবাপন্ন নবযুবকের দল তাঁহার নিকট আসিয়া তাঁহার বাণী ও সাধনা সহজে গ্রহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং তাঁহার

মধুরোজ্জ্বল জীবনের আলোকসম্পাতে শাস্ত্রাদির প্রতি প্রগাঢ় ভক্তিশ্রদ্ধা দেখাইতে তাঁহারা বিন্দুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই। বাস্তবিকই ঠাকুরের নিকট যখন তাঁহারা যে স্থানেই অবস্থান করিতেন, তখন তাঁহাদের মনে হইত উহা যেন সাক্ষাৎ আনন্দধাম। এই আনন্দের ভিতর দিয়াই ঠাকুর তাঁহাদিগকে আনন্দরাজ্যে বিচরণ করাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘে সাধুদের ভিতর এই আনন্দের একটা বিশিষ্ট রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। রাখাল এই আনন্দময় ভাবের এক পূর্ণ মূর্ত্তি ছিলেন। এই আনন্দময় আধ্যাত্মিকতাই ছিল তাঁহার বিমল বাহ্য সৌন্দর্য্যের একটা স্বতঃপ্রকাশ। উত্তরকালে তিনি হাস্যকৌতুকাদি নানা প্রসঙ্গের মধ্যে ভগবত্তত্ত্ব ও সাধনার ইঙ্গিত দিয়া আগন্তুকদের চিত্তে একটা অনৈসর্গিক আনন্দের আস্বাদ দিতেন। ইহা তাঁহার চরিত্রমাধুর্য্যের একটা বিশেষত্ব ছিল।

গেরুয়া বস্ত্র দানের পর ঠাকুর তাঁহার ত্যাগী অন্তরঙ্গ ভক্তদের মাঝে মাঝে ভিক্ষা করিতে পাঠাইতেন এবং স্বয়ং সে ভিক্ষান্ন আস্বাদ করিতেন। তিনি তাঁহাদিগকে বলিতেন, "ভিক্ষান্ন অতি শুদ্ধ অন্ন।" এই প্রসঙ্গে পূজ্যপাদ লাটু মহারাজ বলিয়াছেন, "ঠাকুর আমাকে আর রাখাল মহারাজকে ভিক্ষা করতে বলতেন। তিনি প্রায়ই আমাদের নিকট বলতেন, 'ওরে, ভিক্ষান্ন বড় পবিত্র'। আমি আর রাখাল মহারাজ একদিন ভিক্ষা করতে গেলাম। যাবার সময় ঠাকুর বলে দিলেন, 'কেউ গাল দেবে, আবার কেউ আশীর্ব্বাদ করবে, হয়ত আবার কেউ পয়সাও দেবে, তোরা সব নিবি'।" ভিক্ষায়

তাঁহারা সেদিন অনেক চাউল, ডাল ও পয়সা পাইলেন। ভিক্ষার্জ্জিত দ্রব্যগুলি তাঁহারা ঠাকুরের সম্মুখে রাখিয়া দিলেন। আনন্দময় পুরুষ আনন্দে মাতোয়ারা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোরা কেমন করে ভিক্ষা করলি বল।" তাঁহাদের নিকট সমুদায় বিবরণ শুনিয়া তিনি ভিক্ষালব্ধ দ্রব্যগুলি লইয়া রন্ধন করিতে বলিলেন। পরে পরম তৃপ্তি ও আনন্দ সহকারে তিনি সেই ভিক্ষান্নের আস্বাদ স্বয়ং গ্রহণ করিলেন।

সাধনভজনে কাহারও রোখ না দেখিলে ঠাকুর তাঁহাকে "ম্যাদাটে" বলিতেন। এই "ম্যাদাটে" ভাব তিনি আদৌ পছন্দ করিতেন না। রাখাল ও নরেন্দ্রকে তিনি পুরুষ বা ব্যাটাছেলে বলিয়া উল্লেখ করিতেন। কাশীপুরের উদ্যানে তিনি অসুস্থ অবস্থাতেও নানা ভাবে তাঁহার অন্তরঙ্গ ত্যাগী সাধকদলকে শিক্ষা দিতেন এবং তাঁহাদের প্রত্যেক কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন। ইহাতে তাঁহাদের প্রত্যেকের চরিত্র একটা সংহত ভাবে নিয়ন্ত্রিত হইয়া গড়িয়া উঠিতে লাগিল। ইঁহাদের একদিকে ত্যাগ, বৈরাগ্য, তপস্যা, সংযম ও পবিত্রতা, অপরদিকে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস, সেবা, ভক্তি ও প্রেম পরস্পর মিলিত হইয়া অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের বিকাশ করিল। সমগ্র উদ্যানবাড়ীটী যেন আধ্যাত্মিকতার আবেষ্টনে পরিবেষ্টিত থাকিত। সাধকদের ধ্যান ও তপস্যায় স্থানটীকে পবিত্র তপোভূমি করিয়া তুলিয়াছিল।

এই সময়ে প্রবল বৈরাগ্যের আবেগে ঠাকুরকে না বলিয়াই অকস্মাৎ একদিন নরেন্দ্রনাথ তাঁহার দুইজন গুরুভ্রাতাসহ বুদ্ধগয়ায় চলিয়া গেলেন। ত্যাগী ভক্তদের মধ্যে কাহারও কাহারও মনে পূর্ব্ব হইতেই

তীর্থ ভ্রমণের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল—নরেন্দ্রনাথকে যাইতে দেখিয়া তাঁহারা অনেকেই পশ্চিম প্রদেশে যাইবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কেহ কেহ সত্য সত্যই শ্রীক্ষেত্র ও গঙ্গাসাগর দর্শনে গিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাতে কাহাকেও বাধা দিতেন না। ভক্তদের নিকট একদিন তিনি বলিয়াছিলেন, "আচ্ছা, ছোকরাদের একি হচ্ছে বল দেখি? কেউ শ্রীক্ষেত্রে পালাচ্ছে, কেউ গঙ্গাসাগরে।"

ঠাকুরের ত্যাগী অন্তরঙ্গ ভক্তদের মধ্যে একে একে অনেকেই তীর্থ পর্য্যটনে চলিয়া যাইতেছেন, কিন্তু রাখাল অবিচলিত চিত্তে শ্রীরামকৃষ্ণের সেবাকার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়া রহিয়াছেন। কোন চঞ্চলতা বা ভাববিলাসিতা তাঁহাকে স্পর্শ করে নাই। কঠোর বৈরাগ্য বা তপস্যার প্রলোভন তাঁহাকে চঞ্চল বা উন্মত্ত করিয়া তুলিতে পারে নাই। তিনি সর্ব্বদাই স্থির, ধীর, গম্ভীর ও তন্ময়। শ্রীরামকৃষ্ণই তাঁহার সর্ব্ব তীর্থের সার—সর্ব্ব প্রকার বৈরাগ্য ও তপস্যার অমৃত ফল, সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আশ্রয় এবং পরম ধাম। শ্রীরামকৃষ্ণই সর্ব্ব শক্তির আধার—স্বয়ং মহাশক্তি। এই সুদৃঢ় ভাব হইতে রাখাল কখন বিন্দুমাত্র বিচলিত বা চঞ্চল হন নাই। স্বভাবতই তিনি বালকের মত কোমল প্রকৃতিসম্পন্ন ছিলেন। কিন্তু এই দিব্য বালক নিজভাবে অটল অচল ও সুমেরুবৎ অবিচলিত থাকিতেন। কাশীপুর উদ্যানে তাঁহার এই স্বতন্ত্র রূপ বিকাশ পাইতেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণের সেবাই তাঁহার ধ্যান জ্ঞান ও প্রাণ। বৈরাগ্যের উচ্ছ্বাসে তাঁহার গুরুভ্রাতারা চঞ্চল হইয়া ঠাকুরের এই রোগ বৃদ্ধিকালে সেবা পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যাইতেছেন ইহাই তাঁহার মর্ম্মান্তিক

দুঃখ। অবশেষে যখন নরেন্দ্রনাথ অকস্মাৎ দুইজন গুরুভ্রাতাকে সঙ্গে লইয়া গোপনে গয়াধামে চলিয়া যান তখন রাখাল একান্ত ব্যস্ত ও চিন্তিত হইয়া পড়িলেন।

সেবকসংখ্যার অল্পতায় ও নরেন্দ্রনাথের অনুপস্থিতিতে পাছে ঠাকুরের যথারীতি চিকিৎসা, সেবাযত্ন ও শুশ্রূষার কোন ত্রুটী ঘটে ইহাই তাঁহার চিন্তার কারণ হইল। একদিন তিনি ঠাকুরের নিকট তাঁহার মনের কথা বলিয়া ফেলিলেন। ঠাকুর সব শুনিয়া বিশেষ নরেন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁহাকে অভয় দিয়া বলিলেন, "কেন ভাবছিস্? কোথায় যাবে সে? কদিন বাইরে থাকতে পারবে? দেখ না, এল বলে!" তারপর হাসিতে হাসিতে ঠাকুর তাঁহাকে বলিলেন, "চার খুঁট ঘুরে আয়, দেখবি কোথাও কিছু নেই"। পরে নিজের বুকে হাত দিয়া বলিলেন, "যা কিছু আছে—সব এইখানে।"

ইহা শুনিয়া রাখালের হৃদয়তন্ত্রী বাজিয়া উঠিল। তিনি এতদিন গোপনে অনুভূতি ও দর্শনাদিতে ঠাকুরের যে স্বরূপতত্ত্ব বোধ করিতে-ছিলেন, অহরহ যে ভাবে তিনি তন্ময় হইয়া আছেন, এ যে ঠাকুর তাঁহার শ্রীমুখে তাহাই প্রকাশ করিতেছেন! রাখালের অন্তরের আনন্দ বাহিরে উথলিয়া পড়িল। তিনি বিভোর হইয়া ঠাকুরের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

বাস্তবিক ইহার দুই চারি দিন পরে নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকলেই একে একে কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণের চরণে উপনীত হইলেন। বাহিরে গিয়া তাঁহারা কেহ শান্তি পাইলেন না।

সাধন-ভজন করিতে করিতে ঠাকুর সম্বন্ধে রাখালের এক

নূতন জ্ঞাননেত্রের উন্মেষ হইল। তিনি উপলব্ধি করিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ জগদ্‌গুরুরূপে অবতীর্ণ হইয়া তাঁহার অনন্ত প্রেম অনন্ত ধারায় জগতের হিতকল্পে বিলাইতেছেন। একদিন রাখাল ঠাকুরের সম্মুখেই উপবিষ্ট ভক্তদের নিকট নিজ মনোভাব সরলভাবে স্পষ্টরূপে বলিয়াছিলেন, "উনি কৃপা করে জানিয়ে দিয়েছেন, 'মদ্‌গুরু শ্রীজগদ্‌গুরু!' উনি কি কেবল আমাদের জন্যই এসেছেন?"

রাখাল নরেন্দ্রনাথের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার ঈদৃশ মনোভাব অকপটে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। নরেন্দ্রনাথ তাহাতে কোন প্রতিবাদ করা দূরে থাক বরং জ্বলন্ত উৎসাহপূর্ণ বাক্যে উহা অনুমোদন করিলেন। বিভোরভাবে নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁহার নিজ জীবনের অনুভূতি তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রনাথের আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনে রাখাল বিস্মিত ও আনন্দিত হইলেন। একদিন নরেন্দ্রের সম্মুখেই তিনি আনন্দে শ্রীরামকৃষ্ণকে সব জানাইয়া বলিলেন, "এখন নরেন্দ্র আপনাকে খুব বুঝছে।" তাহাতে তিনি মৃদুমধুর হাসিয়া বলিলেন, "আবার দেখছি অনেকে বুঝছে।" তখন শ্রীযুত মাষ্টার মহাশয় উপস্থিত ছিলেন। ঠাকুর রাখালের দিকে চাহিয়া ইঙ্গিতে নরেন্দ্র ও মাষ্টার মহাশয়কে দেখাইলেন। রাখাল হাসিয়া ঠাকুরকে বলিলেন, "আপনি বলছেন নরেন্দ্রের বীরভাব আর মাষ্টার মশায়ের সখীভাব?" শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, আমার কি ভাব?" নরেন্দ্র ঠাকুরকে সর্ব্বভাবের আধার বলিয়া দেখিতেন—তাই স্পষ্টভাবে উত্তর করিলেন "বীরভাব, সখীভাব—সব ভাব।" নরেন্দ্রের কথা শুনিয়া ঠাকুর নিজের বুকে হাত দিয়া বলিলেন, "দেখছি, এর ভিতর

যা কিছু।" উপস্থিত সকলে এই কথা শুনিয়া নীরব ও নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন। ঠাকুর তখন ইসারা করিয়া নরেন্দ্রকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি বুঝলি ?" তদুত্তরে তিনি বলিলেন, "যত সৃষ্ট পদার্থ সব আপনার ভিতর থেকে।" ঠাকুর আনন্দোৎফুল্ল বদনে রাখালের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "দেখছিস! কেমন বুঝছে ?" আধ্যাত্মিক স্তরে কাহার কি ভাব এবং কে কেমন তাঁহাকে বুঝিতে পারিতেছে তাহা যেন ঠাকুর তাঁহার রাখালরাজকে ইঙ্গিতে বলিতেছেন। উপলব্ধির কোন্ উচ্চ স্তরে আরোহণ করিলে এই প্রকার অস্ফুট ইসারা চলে তাহার মর্ম্ম কে বুঝিবে ?

নরেন্দ্রনাথকে শ্রীরামকৃষ্ণ গান গাহিতে বলিলে তিনি তখন মোহমুদ্গর হইতে বৈরাগ্যসূচক শ্লোক সুর করিয়া আবৃত্তি করিলেন। শ্রীগৌরাঙ্গ যেমন রামানন্দকে বলিয়াছিলেন, "এহ বাহ্য, আগে কহ আর।" তেমনি ঠাকুর তাঁহাকে জানাইলেন, "এই সব ভাব অতি সামান্য।" দিব্যভাবাপন্ন ঠাকুর তখন পরিপূর্ণ প্রেমের আস্বাদনে ভরপুর হইয়া আছেন—নরেন্দ্র ইহা বুঝিয়া কৃষ্ণবিরহিণী ব্রজগোপীর ভাবে আবিষ্ট হইয়া গাহিলেন,

কাহে সই জিয়ত মরত কি বিধান ?
ব্রজ কি কিশোর সই   কাঁহা গেল ভাগই
ব্রজজন টুটায়ল পরাণ ॥

নরেন্দ্র দেবদুর্লভ কণ্ঠে প্রেমোন্মত্ত ভাবে যখন ইহা গাহিলেন, তখন শ্রীরামকৃষ্ণ ও রাখালের নয়ন হইতে প্রেমাশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছে ! নরেন্দ্রও রাধাভাবে উদ্দীপিত হইয়া আবার গাহিলেন—"তুমি আমার, আমার বঁধু।" শ্রীরামকৃষ্ণের সন্নিধানে বসিয়া প্রেমবিহ্বল-

চিত্তে প্রেমবিগলিত অশ্রুধারায় প্লাবিত হইয়া নির্ব্বাকভাবে রাখাল ব্রজের এই প্রেম মাধুর্য্যের রস আস্বাদন করিতে লাগিলেন।

কাশীপুরের উদ্যানে রাখালের হৃদয়ের প্রসারতা, গভীরতা ও উদারতা উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিল। শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়াই তাঁহার এই ভাবের বিকাশ ও বিস্তার হইতেছিল। যে ভাবেই হউক শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি আকর্ষণ থাকিলেই জীবের মঙ্গল হইবে—এই সম্বন্ধে তাঁহার কোন সংশয় ছিল না। দক্ষিণেশ্বরে শ্রীযুত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয়ের সহিত একবার একজন স্ত্রীলোক আসিয়াছিল। সে মাঝে মাঝে তথায় ঠাকুরকে ব্রহ্মসঙ্গীত ও শ্যামা বিষয়ক গান শুনাইয়া যাইত। তাহার অস্বাভাবিক চাল-চলন দেখিয়া সকলে তাহাকে পাগলী বলিয়া ডাকিত। একদিন সেই পাগলী ঠাকুরের ঘরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কাঁদিতেছিল। শ্রীরামকৃষ্ণ তাহা দেখিয়া পাগলীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন কাঁদছিস্?" উত্তরে সে বলিল, "মাথা ব্যথা করছে।" আবার অন্যদিন ঠাকুর আহারে বসিয়াছেন তখন পাগলী হঠাৎ আসিয়া বলিল, "আমায় দয়া কল্লে´ন না—মনে ঠেল্লেন্ কেন?" ঠাকুর তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোর কি ভাব?" পাগলী উত্তরে বলিল, "মধুর ভাব।" শ্রীরামকৃষ্ণ অমনি বলিয়া উঠিলেন, "সব মেয়েরা যে আমার মা।" কাশীপুর উদ্যানে এই পাগলী ঠাকুরের নিকটে যাইবে বলিয়া প্রায়ই নানারূপ উপদ্রব করিত। তাঁহার ত্যাগী যুবক অন্তরঙ্গেরা উক্ত পাগলীকে দেখিলেই বিরক্ত হইতেন। তাঁহারা ধমক বা প্রহারের ভয় দেখাইয়া অতি কষ্টে উদ্যান হইতে তাহাকে বাহির করিয়া দিতেন। একদিন

শ্রীযুত শশী (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) পাগলীর কথা উল্লেখ করিয়া ঠাকুরের সম্মুখে রাখালকে বলিলেন, "এবার পাগলী এলে ধাক্কা মেরে তাড়াতে হবে।" অহৈতুকী কৃপাসিন্ধু ঠাকুর অমনি ইসারায় বলিলেন, "না—না, সে আসবে আর দেখে চলে যাবে।" পাগলী যে ভাবেই হউক দিনরাত ঠাকুরের চিন্তা করিতেছে, সকলের নিকট গালাগালি, লাঞ্ছনা ও অপমান সহ্য করিয়াও তাঁহার নিকটে আসিতে চাহিতেছে, ইহাই স্মরণ করিয়া রাখালের মন দ্রব হইতেছিল। যে যেভাবেই হউক ঠাকুরের চিন্তা করিলে তাহার মঙ্গল নিশ্চয় এই দৃঢ় ধারণায় পাগলীর প্রতি রাখালের মনে অনুকম্পা জাগিয়া উঠিল। তাই শশীকে সম্বোধন করিয়া তিনি ঠাকুরের আদেশ শুনাইলেন। শশী তাহাতে বলিলেন, "কিন্তু অসুখের সময় কেন? আর ওরকম উপদ্রব?" রাখাল প্রেমার্দ্র হৃদয়ে শশীকে বলিলেন, "উপদ্রব সব্বাই করে। সকলেই কি খাঁটি হয়ে ওঁর কাছে এসেছে? ওঁকে আমরা কষ্ট দিই নি?" বলিতে বলিতে রাখালের পূর্ব্বস্মৃতি উদিত হইল। তাঁহার কাছে কত মান, অভিমান, ক্ষোভ ও আব্দার করিয়াছেন! ঠাকুর সব উপেক্ষা করিয়া, সব সহ্য করিয়া, প্রেমের অমৃতনিষেকে তাঁহাকে সিক্ত করিয়াছেন! শুধু কি একা তিনি? ঠাকুর যাঁহাকে সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঋষি বলেন, যিনি জ্ঞানে, বুদ্ধিতে, বিদ্যায় ও তেজস্বিতায় অতুলনীয়, তিনি এক সময়ে ঠাকুরের সহিত তর্ক বিতর্ক করিয়া কত বিরক্ত করিয়াছেন, পাগলী তো সামান্যা বিকৃত-মস্তিষ্কা নারী! সে যে উপদ্রব করিবে ইহা আর আশ্চর্য্য কি? ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের ন্যায় প্রবীণ মনস্বী ব্যক্তি ঠাকুরকে কত কি বলিয়া থাকেন! তাই ব্যথিত হৃদয়ে শ্রীরামকৃষ্ণগত-প্রাণ

রাখাল প্রেমার্দ্র কণ্ঠে বলিলেন, "উপদ্রব সব্বাই করে। সকলেই কি খাঁটি হয়ে ওঁর কাছে এসেছে? ওঁকে আমরা কষ্ট দিই নি? নরেন্দ্র টরেন্দ্র আগে কি রকম ছিল—কত তর্ক করতো? ডাক্তার সরকার কত কি ওঁকে বলেছে! ধরতে গেলে কেহই নির্দোষ নয়!" শ্রীরামকৃষ্ণ রাখালের এই প্রেমবিগলিত বাক্য শুনিয়া আনন্দ প্রকাশ করিলেন। পাগলীর কথা পুনরায় উত্থাপন করিয়া রাখাল বলিতেছেন, "দুঃখ হয় যে সে উপদ্রব করে, আর তার জন্য অনেকে কষ্টও পায়।"

এইরূপে প্রেমে, আনন্দে, সেবায় এবং নিয়ত সাধন-ভজনে রাখাল এক অপূর্ব্ব উদার প্রেম-দৃষ্টিতে সকলকে নিরন্তর নিরীক্ষণ করিতেন। তাঁহার ঈশ্বরলুব্ধ চিত্তে শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ ও তাঁহার প্রেমমূর্ত্তি দিন দিন দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইতে লাগিল। ঠাকুর তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তদের সম্বন্ধে বলিতেন, "আমি কে, আর ওরা কে, এই জানলেই হল।" কাশীপুর উদ্যানে তাঁহাদের মধ্যে এই তত্ত্বই দিন দিন স্ফুরিত হইয়া উঠিল। দক্ষিণেশ্বরে যাহা বীজাকারে অন্তরঙ্গদের মধ্যে ছিল, কাশীপুর উদ্যানে তাহা অঙ্কুরিত হইতে লাগিল। অলক্ষ্যে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদদের লইয়া একটী মহাশক্তির সঙ্ঘ ধীরে ধীরে গড়িয়া তুলিতেছিলেন। যে প্রেমসূত্রে ইহারা পরস্পর আনন্দে আবদ্ধ হইতেছেন—সেই প্রেমসূত্রই শ্রীরামকৃষ্ণ।

এইরূপ আনন্দ প্রবাহের মধ্যে কিন্তু ঠাকুরের রোগ-যন্ত্রণা দেখিলে সহসা তাঁহাদের চিত্ত বিষাদে ভরিয়া উঠিত। সব আনন্দ আহ্লাদ নিমিষে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যাইত।

যাঁহার জন্য, যাঁহার আশ্রয়ে, যাঁহার কৃপায় পরম পুরুষার্থ লাভের প্রত্যাশায়, তাঁহারা ঘর-সংসার, আত্মীয়-স্বজন ত্যাগ করিয়া চলিয়া

আসিয়াছেন, যাঁহার দিব্যসঙ্গলাভে, অনাবিল অপার্থিব স্নেহে এবং অলৌকিক শক্তিতে তাঁহারা ইহজগতে দুর্লভ পরম আনন্দ সম্ভোগ করিতেছেন, যাঁহার অভয়বাণী তাঁহাদের সকল সংশয় দূর করিয়া দিতেছে, যাঁহার অলোকসামান্য জীবন দিব্য অনুভূতির আলোক-সম্পাত করিয়া অমৃতের পথে তাঁহাদিগকে লইয়া যাইতেছে, আজ রোগশয্যায় তাঁহার ভীষণ যন্ত্রণা দেখিয়া নিমিষে সকল আনন্দ অন্তর্হিত হইয়া গভীর দুঃখে তাঁহাদের হৃদয় আচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। সকল প্রকার চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষাদি সত্ত্বেও তিলে তিলে দিন দিন তাঁহাদের সম্মুখেই ঠাকুরের দেহ ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে। অথচ সদানন্দ পুরুষ অপূর্ব্ব অমৃতরসে এবং প্রেমের গভীর তরঙ্গে তাঁহাদিগকে ভুলাইয়া রাখিয়াছেন! যেন যন্ত্রপুত্তলিকার মত তাঁহার ইচ্ছায় সকলে পরিচালিত হইতেছেন।

ধীরে ধীরে কাল পূর্ণ করিয়া ইংরেজী ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দ, ১৬ই আগষ্ট, সন ১২৯৩ সাল, ৩১শে শ্রাবণ, রবিবার, শ্রাবণী পূর্ণিমা তিথিতে রাত্রি ১টা ৬মিনিটের সময় শ্রীরামকৃষ্ণ মহাসমাধিতে নিমগ্ন হইলেন। কিন্তু ত্যাগবৈরাগ্যের অমৃতদীপ্তিতে, অশ্রুতপূর্ব্ব কঠোর সাধনায় ও মহাশক্তির আহ্বানে যে পবিত্র হোমানল তিনি প্রজ্বলিত করিলেন—তাঁহার ত্যাগী সন্তানের দল তাহা ঘিরিয়া বসিয়া হবিঃ প্রদান করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্র রাখাল প্রমুখ অন্তরঙ্গেরা উহা দিব্য-মন্ত্রে মুখরিত করিয়া দিকসমূহ ধ্বনিত, উদ্ভাসিত ও পুণ্যগন্ধে আমোদিত করিলেন।

নবম পরিচ্ছেদ

বরাহনগর মঠে

শ্রীরামকৃষ্ণের বিরহে ত্যাগী ভক্তমণ্ডলী দারুণ শোকে ম্রিয়মাণ। তাঁহারা কেহ স্তব্ধ বা মৌন, কেহ আবিষ্ট বা মুখর, কেহ গম্ভীর বা চিন্তামগ্ন, কেহ ব্যাকুল বা চঞ্চল, কেহ রুদ্ধাশ্রু বা সজলচক্ষু, কেহ উগ্র বা শুষ্ক, কেহ ধ্যানস্তিমিত বা উদাস, কেহ বিবশ বা বিবর্ণ, কেহ শান্ত বা সংযত এবং কেহ ত্রস্ত বা অবসন্ন। ইঁহারা যেন কোন প্রকারে প্রাণহীন দেহ ধারণ করিয়া আছেন।

নরেন্দ্র রাখাল প্রমুখ ত্যাগী ও অনুরাগী গৃহস্থ ভক্তগণ কাশীপুরের উদ্যানে সম্মিলিত হইয়া শ্রীরামকৃষ্ণের পুণ্যকথা আলোচনা করিতেন। তাঁহার পুণ্যস্মৃতির স্মরণ, মনন এবং তাঁহার উদ্দেশ্যে সেবাই তাঁহাদের বিরহতপ্ত হৃদয়ে এখন একমাত্র সুস্নিগ্ধ শান্তিবারি। কিন্তু এই দুঃসহ বিরহের মধ্যে একটী সমস্যার চিন্তায় ভক্তদের মন আলোড়িত হইতে লাগিল—ততঃ কিম্, তার পর?

সমস্যাটি এই যে, মাসের অবশিষ্ট কয়েকদিন উত্তীর্ণ হইলে যখন কাশীপুরের সেই উদ্যানবাড়ী ছাড়িয়া দিতে হইবে, তখন শ্রীরামকৃষ্ণের ব্যবহৃত দ্রব্যাদি এবং তাঁহার পবিত্র ভস্মাস্থিপূর্ণ তাম্রকৌটা কোথায় রক্ষা করা যাইবে? অনেক পরামর্শ ও আলোচনার পর ইহার শেষ মীমাংসা হইল যে আপাততঃ পরমভক্ত শ্রীযুক্ত বলরামের গৃহে ইহা রক্ষিত হইবে। ভস্মাবশেষের কিয়দংশ কাঁকুড়গাছি যোগোদ্যানে সমাধিমন্দিরে স্থাপিত হইয়াছিল।

নরেন্দ্র, শরৎ, শশী প্রভৃতি কেহ কেহ স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া গেলেন। ১২৯৩ সালের ১৫ই ভাদ্র যোগীন, কালী ও লাটু শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর সহিত শ্রীবৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কয়েকদিন পরে তারকও (শিবানন্দ) একাকী তথায় চলিয়া যান। রাখাল বলরামের গৃহে অবস্থান করিতে লাগিলেন। রাখালকে যত্ন করিতে ও তাঁহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে ঠাকুর শ্রীযুত বলরামকে আদেশ করিয়াছিলেন।

রাখালের প্রশান্ত গম্ভীর হৃদয় শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতির তরঙ্গে অহর্নিশ আলোড়িত হইত। তাঁহার মনে পড়িত কেবল শ্রীরামকৃষ্ণের প্রেমঘন মূর্ত্তি, অলৌকিক দিব্যলীলা, অপার করুণা ও অগাধ স্নেহ, অদ্ভুত পবিত্রতা ও অপূর্ব্ব প্রেমবিহ্বলতা এবং অশ্রুতপূর্ব্ব বিচিত্র মুহুর্মুহুঃ সমাধি ও অতীন্দ্রিয় আনন্দের অনন্তপ্রবাহ! শ্রীরামকৃষ্ণের অলৌকিক দিব্যসঙ্গে ও দিব্যস্পর্শে সেই অনন্ত আনন্দের অমৃতবিন্দু যে রাখালের হৃদয়ে কানায় কানায় ভরিয়া আছে। রাখাল অনন্যমনে তন্ময়চিত্তে তাহা স্মরণ করিয়া নির্জ্জনে নির্ব্বাক ও নিস্পন্দ হইয়া থাকিতেন।

গৃহে নরেন্দ্রনাথ শ্রীরামকৃষ্ণের বিরহে ব্যাকুল ও গম্ভীর। তাঁহার একমাত্র চিন্তা, কি উপায়ে ঠাকুরের ত্যাগী অন্তরঙ্গ সন্তানেরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে একস্থানে বাস করিতে পারেন। শ্রীরামকৃষ্ণের প্রদর্শিত সনাতন সত্য ও তাঁহার মহান্ আদর্শজীবন যাহাতে তাঁহাদের মধ্যে প্রতিফলিত হইয়া জগতের দ্বারে দ্বারে প্রচারিত হইতে পারে ইহাই এখন নরেন্দ্রের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য। ঠাকুর স্বয়ং যে তাঁহার উপর সমুদায় ভার অর্পণ করিয়া গিয়াছেন। তিনি

দিবারাত্র এই চিন্তায় বিভোর হইয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন। ঠিক এই সময়ে এক অচিন্তিতপূর্ব্ব ঘটনা ঘটিল।

ঠাকুরের পরম অনুরক্ত ভক্ত শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় আফিস হইতে প্রত্যাগত হইয়া সন্ধ্যাকালে একদিন তাঁহার ঠাকুর-ঘরে বসিয়া পূজা করিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার এক অদ্ভুত দিব্যদর্শন হইল। তিনি দেখিলেন অকস্মাৎ শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে বলিলেন, "তুই করছিস কি? আমার ছেলেরা সব পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছে—তার আগে একটা ব্যবস্থা কর।" ইহা বলিয়াই তিনি অন্তর্হিত হইলেন। ইহা শুনিয়া সুরেন্দ্র অমনি নরেন্দ্রনাথের নিকট উন্মত্তভাবে ছুটিয়া গেলেন। ইঁহারা এক পল্লীতেই বাস করিতেন। অশ্রুধারায় সিক্ত হইয়া সুরেন্দ্র নরেন্দ্রনাথকে তাঁহার এই দিব্যদর্শনের সমুদায় বৃত্তান্ত বলিয়া অবশেষে তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন, "ভাই, একটা আস্তানা ঠিক কর, যেখানে ঠাকুরের ছবি, ভস্মাস্থি আর তাঁর ব্যবহৃত জিনিষগুলি রেখে রীতিমত পূজার্চ্চনা চলতে পারে, যেখানে তোমরা কামকাঞ্চনত্যাগী ভক্তেরা এক জায়গায় থাকতে পার। মাঝে মাঝে আমরা গিয়ে সেখানে জুড়ুতে পারব। আমি কাশী-পুরে মাসে মাসে যে টাকা দিতাম, এখনও তাই দেব।" নরেন্দ্র-নাথও ইহা শুনিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া সজলনয়নে তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন।

পরদিন হইতেই নরেন্দ্রনাথ কাশীপুর বরাহনগর অঞ্চলে বাড়ীর সন্ধান করিতে লাগিলেন। অবশেষে বরাহনগরে মুন্সীবাবুদের গঙ্গাতীরের সন্নিকটে একটী পুরাতন জীর্ণ বাগান-

বাড়ী মাসিক এগার টাকা ভাড়ায় স্থির হইল। তারক (শিবানন্দ স্বামিজী) তখন বৃন্দাবন হইয়া কাশীধামে অবস্থান করিতেছিলেন। নরেন্দ্রনাথ তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ আসিবার জন্য তার করিয়া দিলেন। পরদিন যখন নরেন্দ্রনাথ রাখালের সহিত পরামর্শ করিয়া সব বন্দোবস্ত করিবার জন্য শ্রীযুত বলরামের গৃহে গিয়াছিলেন তখন তারকও ষ্টেশন হইতে গাড়ী করিয়া তথায় উপনীত হইলেন। সেই গাড়ীতেই নরেন্দ্রনাথ রাখাল, তারক প্রভৃতিকে সঙ্গে লইয়া বরাহনগরের ভাড়াটিয়া বাড়ীতে চলিয়া যান। ইহাই মঠ-প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত। সন ১২৯৩ সালের আশ্বিন মাসের শেষ ভাগে বরাহনগর মঠ প্রতিষ্ঠিত হয়।

বরাহনগরের একটী ভগ্ন জীর্ণ বাড়ীতেই শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সর্ব্বপ্রথম মঠ প্রতিষ্ঠিত হইল। এই গৃহের কক্ষে কক্ষে নরেন্দ্র ও রাখাল প্রমুখ ত্যাগী অন্তরঙ্গ সন্তানদের কঠোর তপস্যা ও অদ্ভুত সাধনার স্মৃতিকাহিনী অঙ্কিত হইয়া রহিয়াছে। বাংলাদেশে পূতসলিলা ভাগীরথী তীরে দক্ষিণেশ্বরে জগতের সুপ্ত প্রাণশক্তির প্রথম জাগরণ ও আধ্যাত্মিক জ্যোতির স্ফুরণ হইয়াছিল। দক্ষিণেশ্বরে পঞ্চবটীমূলে, শ্রীশ্রীভবতারিণীর মন্দিরে ও কাশীপুর উদ্যানে মহাশক্তির স্পন্দনে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার ত্যাগী সন্তানদের হৃদয়ে যে বিদ্যুদ্বাহী অগ্নিকণার সঞ্চার করিয়াছিলেন তাহাই দীপ্ত হইয়া উঠিল বরাহনগরের এই জীর্ণ গৃহে। দিন নাই, রাত্রি নাই, আহার নাই, আলস্য নাই, ক্লান্তি বা অবসাদ নাই, সকলেই সেই অমৃতের পথে অনন্তের সন্ধানে ব্যাকুল হইয়া চলিয়াছেন। কি যেন এক প্রবল উন্মাদনা, অদম্য উৎসাহ, অটল দৃঢ়প্রতিজ্ঞা,

শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি গভীর প্রেম ও বিশ্বাস তাঁহাদের প্রতি পদক্ষেপে, প্রতি কার্য্যে এবং প্রতি চিন্তায় প্রকাশ পাইতেছিল। এক অদৃশ্য মহাশক্তির ইঙ্গিতে, প্রেরণায় ও আকর্ষণে নরেন্দ্র, রাখাল, শরৎ, শশী, বাবুরাম, যোগীন, নিরঞ্জন, তারক, গোপাল, কালী, লাটু, সারদাপ্রসন্ন, সুবোধ, গঙ্গাধর, হরি ও তুলসী আসিয়া ক্রমে ক্রমে এই মঠে সকলে একত্রিত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের এই ত্যাগী সন্তানমণ্ডলীর প্রাণস্বরূপ ছিলেন নরেন্দ্রনাথ। তাঁহারই তত্ত্বাবধানে সকলে সাধনভজন শাস্ত্রপাঠ ও ভগবদ্-প্রসঙ্গের আলোচনা করিতেন। কিন্তু তিনি মঠ পরিচালনার ভার দিয়াছিলেন রাখালের উপর। মঠের বন্দোবস্ত বা নিয়মিত পরিচালনায় কোন দোষ বা ত্রুটী দেখিলে তাঁহাকেই দায়ী করিতেন। রাখালের প্রতি নরেন্দ্রনাথের কেবল মাত্র বন্ধুপ্রীতি বা গুরুভ্রাতার আকর্ষণ ছিল না ;—তাঁহার অন্তরে ছিল রাখালের উপর একটা সসম্মান দৃষ্টি, অগাধ বিশ্বাস ও অসীম প্রাণঢালা ভালবাসা। নরেন্দ্রের প্রতি রাখালেরও সেইরূপ গভীর শ্রদ্ধা, অশেষ প্রীতি এবং প্রগাঢ় বিশ্বাস ছিল। ইহার মূলে ছিল তাঁহাদের সহিত শ্রীরামকৃষ্ণের সম্বন্ধ, তাঁহার আচরণ এবং তাঁহাদের স্বরূপ-পরিচয়ের বাণী।

নরেন্দ্রের পবিত্র সঙ্গে, তাঁহার প্রাণস্পর্শী আলাপ-আলোচনায় এবং তাঁহার সর্ব্বদা উদ্দীপনাময় বাক্যে রাখালের হৃদয়তন্ত্রী ঝঙ্কৃত হইত। মঠ হইতে একবার কোন গুরুভ্রাতাকে তপস্যার জন্য অন্যত্র চলিয়া যাইতে উদ্যত দেখিয়া তিনি তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলেন, "কোথায় ছুটে ছুটে বেরিয়ে যাস! এখানে সাধুসঙ্গ, এ ছেড়ে

যেতে আছে? আর নরেনের মত লোকের সঙ্গ! এ ছেড়ে কোথায় যাবি?" বাস্তবিকই জ্বলন্ত বৈরাগ্যমূর্ত্তি নরেন্দ্রনাথ তাঁহার গুরুভ্রাতাদিগকে এক অপূর্ব্ব ভাবের প্রেরণায় প্রদীপ্ত করিয়া রাখিতেন। রাখালও তাঁহার তন্ময় গভীর ভাবে এবং স্বাভাবিক মধুর চরিত্র ও সুমিষ্ট ভাষায় সাধনভজনের জন্য সকলের মধ্যে উৎসাহাগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দিতেন।

বরাহনগর মঠ প্রতিষ্ঠার পর ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝি সময়ে নরেন্দ্রনাথ আঁটপুর যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। বাবুরাম মহারাজ শুধু নরেন্দ্রনাথকে লইয়া যাইবার আয়োজন করিতেছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে নরেন্দ্রনাথ তাহা শরৎ ও শশী মহারাজের নিকট বলিয়া ফেলেন। পরে এক কাণ হইতে পাঁচ কাণ হইল। দিন ও সময় স্থির করিয়া নরেন্দ্রনাথ শরৎ প্রমুখ গুরুভ্রাতাদিগকে আঁটপুরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিতে বলিলেন। যে দিন বাবুরাম মহারাজ নরেন্দ্রনাথকে লইয়া যাইবেন বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন ঠিক সেই দিন প্রত্যূষে বরাহনগর মঠ হইতে শরৎ, শশী, তারক, কালী, নিরঞ্জন, সারদা ও গঙ্গাধর, বলরাম মন্দিরে আসিয়া উপনীত হইলেন। তখন সকলে আনন্দ করিতে করিতে বাঁয়া, তবলা, তানপুরা ও পৌটলাপুঁটলী হাতে লইয়া হাওড়া ষ্টেশনে যাত্রা করিলেন। স্বামিজী রেল গাড়ীতে বসিয়া গান ধরিলেন, "শিব শঙ্কর বোম্ বোম্ ভোলা"—শরৎ প্রমুখ গুরুভ্রাতারা তাহাতে যোগ দিলেন। সকলেই পথে গীতবাদ্য ও হাস্যকৌতুক করিতে করিতে আঁটপুরে আসিয়া পৌছিলেন। আঁটপুর গ্রামে

বাবুরামের জন্মভূমি ও পৈতৃক বাসভবন—তাই সকলে মহা উৎসাহে আনন্দে মগ্ন হইলেন। বাবুরাম শ্রীরামকৃষ্ণের পরম স্নেহাস্পদ ত্যাগী সন্তান। ঠাকুর ইঁহাকে দেবী-অংশসম্ভূত ও ঈশ্বরকোটী বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন। বাবুরামের অপূর্ব্ব পবিত্রতার কথা উল্লেখ করিয়া ঠাকুর বলিতেন, "বাবুরামের হাড় পর্য্যন্ত শুদ্ধ।" ঠাকুরের ভাব ও সমাধি অবস্থায় রাখাল ও বাবুরাম ছাড়া অপর কাহাকেও তিনি স্পর্শ করিতে দিতে পারিতেন না। আজ এই সর্ব্বত্যাগী, পরমপবিত্র, ঠাকুরের বিশেষ অন্তরঙ্গ পার্ষদের জন্মভূমি ও তাঁহার পৈতৃক বাসভবনে আসিয়া তাঁহার ত্যাগী গুরুভ্রাতারা পরম উৎফুল্ল ও আনন্দিত হইবেন, তাহা আর বিচিত্র কি?

আঁটপুরে এই বাড়ীর সম্মুখস্থ বৃক্ষমূলে একটী ধুনি জ্বালা হইত। সেই ধুনির চারিদিকে এই ত্যাগীর দল অধিকাংশ সময় বসিতেন। সেখানে শাস্ত্রপাঠ, আলোচনা এবং মহাপুরুষদের অলৌকিক জীবনকাহিনী লইয়া নানা প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইত। দিনকএ নরেন্দ্রনাথ ধুনির পার্শ্বে বসিয়া Imitation of Christ বা ঈশানুসরণ গ্রন্থ পাঠ করিয়া ব্যাখ্যা করিতেছিলেন। তিনি ভাবে তন্ময় হইয়া ঈশার পবিত্রতা, ত্যাগ, বৈরাগ্য, ভক্তি ও প্রেমের কথা জলন্ত ভাষায় বলিতে লাগিলেন। অনন্তর তিনি প্রবল আবেগে ঈশার সর্ব্বত্যাগী শিষ্য ও ভক্তগণের পবিত্র আত্মনিবেদিত জীবন, তঁাহাদের কঠোর তপশ্চর্য্যা, অসাধারণ দৈব্য এবং অপার কষ্টসহিষ্ণুতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। ঈশার মহান্ আদর্শে ও প্রেমে তাঁহাদের জীবন অনুরঞ্জিত করিয়া কিরূপ অদ্ভুত অনুরাগে জগতের ভোগসুখ সম্পূর্ণ উপেক্ষাপূর্ব্বক তাঁহারা দ্বারে দ্বারে

ঈশার সমগ্র জীবন ও বাণী প্রচার করিয়াছিলেন! মনুষ্যজাতির কল্যাণের জন্য তাঁহারা সকল অপমান, সকল লাঞ্ছনা এবং সকল দুঃখ-যন্ত্রণাকে হাসিতে হাসিতে আলিঙ্গন করিয়াছেন! এই সকল মহাপুরুষদের দেহপাতে খৃষ্টধর্ম্ম আজ জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। তাঁহাদের অপূর্ব্ব ত্যাগ ও আত্মবলিদানের কথা বলিতে বলিতে নরেন্দ্রনাথ প্রমত্তভাবে শ্রীরামকৃষ্ণের অশ্রুতপূর্ব্ব ত্যাগ, বৈরাগ্য, তপস্যা ও সাধনা, তাঁহার অদ্ভুত জ্ঞান, প্রেমভক্তি এবং তাঁহার সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের অতুলনীয় আদর্শের কথা উল্লেখ করিলেন। তিনি তাঁহার সমবেত গুরুভ্রাতাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "ঠাকুরের আদর্শে ও ভাবে আমাদের জীবন গঠন করতে হবে। তাঁর ভাব, তাঁর মহান্ আদর্শ, তাঁর প্রেমপূর্ণ শান্তির বাণী জগতের মঙ্গলের জন্য, মনুষ্যজাতির কল্যাণের জন্য আমাদের প্রচার করতে হবে। এই আমাদের জীবনের একমাত্র ব্রত।"

নরেন্দ্রনাথের উদ্দীপনাময়ী বাণী সকলের অন্তরে, সকলের প্রাণে যেন একটা তাড়িত প্রবাহের মত খেলিয়া গেল। তাঁহারা অন্তরে অন্তরে অনুভব করিলেন ঈশ্বরানুভূতি এবং শ্রীরামকৃষ্ণের মহান্ আদর্শ ও বাণী মানুষের ভিতর প্রচার করাই তাঁহাদের জীবনের একমাত্র ব্রত। তাঁহারা সেই প্রজ্বলিত ধুনির সম্মুখে সমুদায় বাসনা-বিরহিত হইয়া এই ব্রত গ্রহণ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থী বা পরীক্ষার্থী ছিলেন, তাঁহারা তাঁহাদের সে সব সংকল্প ত্যাগ করিলেন। আঁটপুরে সেই প্রজ্বলিত ধুনির সম্মুখে তাঁহাদের জীবনের উদ্দেশ্য, গতি এবং ব্রত সম্যক্ভাবে একাভিমুখী হইল। তাঁহারা স্থির করিলেন যে অন্ত

হইতে শ্রীরামকৃষ্ণকেই কেন্দ্র করিয়া তাঁহাদের ভাবী জীবন দৃঢ়লক্ষ্যে অগ্রগতিতে চলিতে থাকিবে। বৈরাগ্যের দীপ্তমহিমায় সকলের অন্তর উদ্ভাসিত হইয়া কি এক অচিন্ত্য দিব্যশক্তির প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইল! এই দিব্যভাবের আবেশ চলিয়া গেলে তাঁহারা জানিতে পারিলেন সেদিন ২৪শে ডিসেম্বর—ঈশার আবির্ভাবের প্রাক্‌সন্ধ্যা (X'mas Eve)। সেই ত্যাগী সন্ন্যাসীর দল বুঝিলেন যে, শুভদিনে শ্রীরামকৃষ্ণের ইঙ্গিতে এবং প্রেরণায় নরেন্দ্রনাথের ভিতর দিয়া এই অপূর্ব্ব বাণী নির্গত হইয়াছে এবং তাঁহাদের চিত্তকে দিব্যভাবে মণ্ডিত করিয়াছে। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে ইহা একটী পুণ্যস্মৃতি-কাহিনী।

বাবুরামের মাতাঠাকুরাণী ঠাকুরকে অনেকবার দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি পরম ভক্তিমতা ছিলেন। আঁটপুরে এই ত্যাগী দলের মধ্যে রাখালকে না দেখিয়া তিনি তৃপ্তি বোধ করিলেন না। ঠাকুরের নিকট যে সব স্ত্রী ভক্তেরা যাতায়াত করিতেন তাঁহারা জানিতেন ঠাকুরের কত স্নেহের ও কত আদরের রাখাল! তাঁহারা যদি কেহ রাখালকে সমুচিত স্নেহাদর ও যত্ন না করিতেন তবে ঠাকুর বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইতেন। সেই রাখাল আঁটপুরে না আসাতে বাবুরাম-জননী এই আনন্দোৎসবে একটা অভাব বোধ করিতে লাগিলেন। নরেন্দ্র তাঁহার মনোভাব বুঝিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিলেন যে, তিনি অবিলম্বে রাখালকে লইয়া পুনরায় আঁটপুরে আসিবেন এবং তাঁহারা দুইজনে মিলিয়া পরমানন্দে তথায় কয়েকদিন বাস করিবেন।

কিছুদিন পরে নরেন্দ্রনাথ রাখালকে সঙ্গে লইয়া আঁটপুরে আসিলেন। সঙ্গে বাবুরাম ও বুড়ো গোপালও ছিলেন। বাবুরামের

মাতার আশা পূর্ণ হইল। শ্রীরামকৃষ্ণের তিরোভাবের পর তাঁহাকে স্মরণ করিয়া ঠাকুরের স্ত্রী-ভক্তেরা অনেকে রাখালকে আদরযত্ন ও ভোজন করাইয়া তৃপ্তি বোধ করিতেন। রাখাল নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে আঁটপুরে আসিয়া তথায় বৃক্ষলতা-পরিবেষ্টিত উন্মুক্ত প্রান্তর ও গ্রামের শ্যামশোভা দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। তাঁহার সরল মধুর বালগম্ভীর ভাব দেখিয়া গ্রামের অনেকে আকৃষ্ট হন। এমন কি পাশ্চাত্য আদর্শে অনুপ্রাণিত একজন শিক্ষিত যুবক হিন্দুধর্ম্মের প্রতি বিতৃষ্ণ হইয়া খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইবেন বলিয়া মনস্থ করিয়াছিলেন; কিন্তু রাখালের ধ্যানতন্ময় ভাব দেখিয়া ও তাঁহার মধুর সরল বাক্য শুনিয়া যুবকটী উক্ত সংকল্প ত্যাগ করেন।

বরাহনগর মঠে রাখাল যখন অবস্থান করিতেছিলেন তখন তাঁহার পিতা আনন্দমোহন প্রথম প্রথম প্রায়ই তাঁহাকে দেখিতে আসিতেন। তাঁহার মনে মনে আশা ছিল শ্রীরামকৃষ্ণের বিরহজনিত আবেগ কাটিয়া গেলে রাখাল পুনরায় গৃহে প্রত্যাগত হইতে পারেন। আনন্দমোহন মঠে আসিলে রাখাল শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশ স্মরণ করিয়া তাঁহাকে যথোচিত সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে ক্রুটী করিতেন না। কিন্তু পিতার স্বার্থ-প্রণোদিত অভিপ্রায় জানিতে পারিয়াও তিনি উদাসভাবে মৌন হইয়া তাঁহার নিকটে বসিতেন। একদিন রাখাল তাঁহার এইরূপ নিরর্থক বারম্বার মঠে যাতায়াতের ক্লেশ দেখিতে না পারিয়া স্পষ্টাক্ষরে তাঁহাকে বিনয়-নম্র গম্ভীরভাবে বলিলেন, "কেন আপনারা কষ্ট করে আসেন? আমি এখানে বেশ আছি। এখন আশীর্ব্বাদ করুন যেন আপনারা আমায় ভুলে যান, আর আমি আপনাদের ভুলে যাই।"

রাখালের ঈদৃশ দৃঢ় সংকল্পের নির্ম্মম বাণী শুনিয়া আনন্দমোহন হতাশ হৃদয়ে গৃহে ফিরিয়া গেলেন। তিনি বেশ বুঝিতে পারিলেন যে রাখালকে ফিরাইয়া আনিবার চেষ্টা বৃথা।

"আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমি আপনাদের ভুলে যাই"—আনন্দ-মোহনের প্রতি রাখালের এই কথা তাঁহার অন্তস্তল হইতে ঐকান্তিক-ভাবেই উত্থিত হইয়াছিল—ইহা তাঁহার জীবনে বাস্তব ঘটনায় প্রতি-ফলিত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময়ে তাঁহার পত্নী বিশ্বেশ্বরী সহসা দেহত্যাগ করেন কিন্তু তাহা শুনিয়া রাখাল বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই। এমন কি পরবর্ত্তী কালে শ্রীবৃন্দাবন হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনের পর ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার একমাত্র দশম বর্ষীয় পুত্রের মৃত্যুসংবাদে তাঁহাকে নির্ব্বিকার, স্থির ও অটল দেখা গিয়াছে। বাস্তবিকই সাংসারিক সম্বন্ধ বা স্মৃতি তিনি পূর্ণরূপেই ভুলিয়া গিয়া-ছিলেন, তাই যৌবনে পত্নীবিয়োগ বা দারুণ পুত্রশোক তাঁহার অতীন্দ্রিয়ভাবমগ্ন হৃদয়কে স্পর্শ করে নাই। যাঁহারা তৎকালে তাঁহার নিকটে ছিলেন—তাঁহারা এই দিব্য প্রশান্ত বৈরাগ্যমূর্ত্তি দেখিয়া বিস্মিত ও মুগ্ধ হইয়া যান। আধ্যাত্মিক ভাবরাজ্যের ইহা অপূর্ব্ব আদর্শ।

আঁটপুর হইতে ফিরিয়া আসার পর সকলেই ত্যাগের অমৃতময় পথে কঠোর তপস্যা ও ধ্যানভজনে অগ্রসর হইয়া ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুল হইলেন। ১৮৮৭ খৃঃ জানুয়ারী মাসে ১২৯৩ সালে মাঘ মাসের প্রথমভাগে রাত্রিকালে শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদুকার সম্মুখে তাঁহারা সকলে মিলিয়া এই বরাহনগর মঠে বিধিমত শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের পর বিরজাহোম করিয়া বৈদিক সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন।

কৌপীনবস্তঃ হইয়া সন্ন্যাসাশ্রমে তাঁহাদের নামের পরিবর্ত্তন হইল। সকলেই স্বামী সংজ্ঞায় নূতন নাম গ্রহণ করিলেন। নরেন্দ্রনাথ —বিবেকানন্দ, রাখাল—ব্রহ্মানন্দ, তারক—শিবানন্দ, শরৎ— সারদানন্দ, শশী—রামকৃষ্ণানন্দ, যোগীন—যোগানন্দ, বাবুরাম— প্রেমানন্দ, হরি—তুরীয়ানন্দ, নিরঞ্জন—নিরঞ্জনানন্দ, লাটু— অদ্ভুতানন্দ, গঙ্গাধর—অখণ্ডানন্দ, সারদাপ্রসন্ন—ত্রিগুণাতীতানন্দ, কালী—অভেদানন্দ, বুড়োগোপাল—অদ্বৈতানন্দ এবং সুবোধ— সুবোধানন্দ নাম ধারণ করিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, "আমি ষোল ট্যাং করেছি তোরা এক ট্যাংও কর।" তাঁহাদের সর্ব্বদা মনে পড়িত ঠাকুরের কঠোর ত্যাগ ও তপস্যা। ইহা স্মরণ করিয়া তাঁহারা অশ্রুতপূর্ব্ব কঠোর সাধনায় ব্রতী হইলেন। আহার নিদ্রা ভুলিয়া দিনের পর দিন তাঁহারা ধ্যানজপে তন্ময় হইয়া থাকিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের তীব্র ব্যাকুলতা যখন তাঁহাদের স্মৃতিপথে উদিত হইত, তখন তাঁহারা আপনাদের ধিক্কার দিয়া আর্ত্তভাবে বলিতেন, "হায়, কোথায় সে ব্যাকুলতা ?" কোনদিকে তাঁহাদের দৃষ্টি ছিল না, কেবল মনে হইত বুদ্ধের তপস্যা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, শ্রীচৈতন্যের প্রেমভক্তি ও ব্যাকুলতা, জ্ঞানগুরু শঙ্করের অদ্বৈতানুভূতি এবং সর্ব্বোপরি শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগ, তপস্যা, ব্যাকুলতা, প্রেম ও সমাধির জীবন্ত অগ্নিময় আলেখ্য !

বরাহনগর মঠে এই যুবক ত্যাগীর দল তীব্র বৈরাগ্যে কঠোর ভাবে দিন কাটাইতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণানন্দ ঠাকুরের সেবা-পূজায় তন্ময় হইয়া থাকিতেন। পাচক উঠিয়া গেল। তিনি স্বহস্তে

রাঁধিয়া ভোগ নিবেদন করিতেন। তাঁহারা যথাক্রমে দুই তিন জন, কখনও চারি জন মিলিয়া একত্রে ভিক্ষায় বাহির হইতেন। কত লোকে তাঁহাদিগকে দেখিয়া কত কর্কশ ও কটু কথা শুনাইত, আবার কেহ ঠাট্টা বিদ্রূপও করিত। তাঁহারা নিন্দা, উপহাস, সুখ্যাতি, প্রশংসা সমভাবে গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, বরং সেই সব প্রসঙ্গ তুলিয়া সকলে মিলিয়া অন্য সময় আনন্দ উপভোগ করিতেন। পাড়াপড়শী দুর্জ্জনেরা তাঁহাদের প্রতি নানাবিধ অত্যাচার ও উৎপীড়ন করিয়া আমোদ পাইত। কেহ কেহ তাঁহাদের কুৎসা ও গ্লানি প্রচার করিয়াও বেড়াইত। ইহা সন্ন্যাসজীবনের অঙ্গের ভূষণ বলিয়া এই তরুণ ত্যাগীর দল সমস্তই উপেক্ষা করিতেন। ঠাকুরের গৃহস্থ ভক্তেরা প্রায়ই সংবাদ পাইতেন না—তাঁহারা কি আহার করিতেন। কোন দিন তাঁহাদের ভিক্ষা জুটিত, আবার কোন দিন একটি তণ্ডুলকণাও জুটিত না। একদিন চারিজন ভিক্ষায় বাহির হইয়া একমুষ্টি তণ্ডুল বা একটি কপর্দ্দকও পাইলেন না। ভাণ্ডারেও চাউল নাই যে তাঁহারা ঠাকুরকে ভোগ দিবেন। বেলা দ্বিপ্রহরের প্রচণ্ড রৌদ্রে হাসিমুখে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহারা যখন জানাইলেন—আজ ভিক্ষা মিলিল না, তখন সকলে যুক্তি করিলেন—"এস, আজ সকলে মিলিয়া কীর্ত্তন করা যাক্। ভগবানের নামে ক্ষুধাতৃষ্ণা অবসাদ সব দূর হয়ে যাবে।" সকলেই খোল-করতাল সহযোগে কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। কীর্ত্তনানন্দে সকলে এত মাতিয়া উঠিয়াছেন যে তাঁহাদের আর কোন বিষয়ে হুঁশ নাই। এদিকে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ (শশী মহারাজ) দেখিলেন—আজ ঠাকুর উপবাস থাকিবেন; একথা ভাবিতেই তাঁহার অন্তর

যেন দগ্ধ হইতে লাগিল—তিনি ব্যথিত ও চঞ্চল হইলেন। অবশেষে মঠের নিকটস্থ কোন পরিচিত বন্ধুকে নির্জ্জনে ডাকিয়া বলিলেন—"ভাই, আজ ভিক্ষায় কিছুই পাওয়া যায় নাই,—কিছু আলো চাল, দুটো আলু ও এক ছিটে ঘি দিতে পার?" বন্ধুটির বাড়ীর অপর সকলেই এই সন্ন্যাসীদের উপর বিরক্ত। লেখাপড়া শিখিয়া ভদ্র ঘরের ছেলেরা ভিক্ষা করে খায়—ছিঃ! এ ক্ষেত্রে বন্ধুটি কোন রকমে পোয়াটাক চাল, কয়েকটা আলু ও আধছটাক ঘি সংগ্রহ করিয়া গোপনে জানালার মধ্য দিয়া স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের হাতে দিলেন। রামকৃষ্ণানন্দ তাহা পাইয়া পরম আনন্দিত। তিনি এই ভিক্ষালব্ধ দ্রব্য রাঁধিয়া ঠাকুরকে ভোগ নিবেদন করিলেন। ভোগের পর তিনি অন্নপ্রসাদ একসঙ্গে চটকাইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পিণ্ড প্রস্তুত করিলেন। সেই পিণ্ডগুলি 'দানাদের' ঘরে লইয়া গিয়া তিনি দেখিলেন সকলেই হরিনামে উন্মত্ত ও কীর্ত্তনানন্দে বিভোর। রামকৃষ্ণানন্দ এক এক জনের সম্মুখে প্রসাদের পিণ্ড ধরিয়া বলিলেন, "হাঁ কর, ঠাকুরের প্রসাদ।" একে একে তাঁহাদের প্রত্যেকের মুখে সেই ভাবে এক একটি অন্ন-পিণ্ড তুলিয়া দিলেন। এই অপূর্ব্ব প্রসাদের আস্বাদ পাইয়া সকলে পরম পরিতৃপ্ত ভাবে বিস্মিত নয়নে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভাই শশী! এ অমৃত কোথায় পেলে ভাই?" পুনরায় কীর্ত্তন চলিতে লাগিল। মঠে প্রায়ই তাঁহাদের এই ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হইত। কতদিন ভিক্ষা করিয়া তাঁহারা চাউল সংগ্রহ করিলেন কিন্তু কোনও শাকসবজি তরকারি মিলিল না। এই কপর্দ্দকহীন সন্ন্যাসীদের তখন উহা ক্রয় করিয়া আনা সাধ্যাতীত ছিল। সুতরাং অবশেষে বেড়ার

গা হইতে তেলাকুচা পাতা আনিয়া তাহাই রাঁধিয়া অন্নগ্রহণের একমাত্র ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইত। দারুণ শীতে শীতবস্ত্র বা পাদুকা নাই, কখনও বা পরিধেয় বস্ত্রের অভাব, কিন্তু এই নবীন সন্ন্যাসীর দল কিছুতেই দমিতেন না—তাঁহারা সহাস্যবদনে সব সহ্য করিতেন। সুযোগক্রমে যদি কখনও উত্তম খাদ্যদ্রব্য আসিয়া জুটিত তবে প্রসাদজ্ঞানে সামান্য গ্রহণ করিয়া তাহার অধিকাংশ অতিথি, অভ্যাগত ও ভক্তদের সেবায় বিতরিত হইত। কোন কোন রাত্রিতে তাঁহারা শুধু লবণ সহযোগে দু'একখানি শুক্‌নো রুটী খাইয়া সাধনায় অতিবাহিত করিতেন। এমন দিনও তাঁহাদের গিয়াছে যেদিন আদৌ আহার জোটে নাই—শুধু ভগবদ্‌প্রসঙ্গে ক্ষুধাতৃষ্ণা কোথায় চলিয়া গিয়াছে!

এই কঠোর ভাবের কথা স্মরণ করিয়া উত্তরকালে স্বামী বিবেকানন্দ বলিয়াছিলেন—"বরাহনগরে এমন কতদিন গিয়াছে যে খাবার কিছু নেই, ভাত জোটে ত নুন জোটে না। কয়েকদিন হয় ত শুধু নুনভাতই চললো. কিন্তু কারুর তাতে গ্রাহ্য নেই। জপধ্যানের প্রবল তোড়ে তখন আমরা ভাসছি। কখন কখন শুধু তেলাকুচো পাতা সিদ্ধ ও নুনভাত—এই মাসাবধি চলেছে। আহা, সে সব কি দিনই গেছে! সে কঠোরতা দেখলে ভূত পালিয়ে যেত, মানুষের কথা কি?" উত্তরকালে ব্রহ্মানন্দও রহস্য কৌতুক করিয়া কাহাকে কাহাকে বলিয়াছিলেন, "যখন খাবার শক্তি ছিল তখন তেলাকুচো সিদ্ধ ভাত জোটাই মুশকিল হত, এখন খাবার সামর্থ্য নেই তাই উপাদেয় আহার জুটচে।"

মঠে কীর্ত্তন, পাঠ, জপ, ধ্যান অবিরাম চলিত। বিবেকানন্দ

তাঁহার ত্যাগী গুরুভ্রাতাদের নিকট শ্রীরামকৃষ্ণের এক একটি বাণী লইয়া শাস্ত্রযুক্তি সহায়ে ও আধুনিক পাশ্চাত্য দর্শনবিজ্ঞানের দৃষ্টিভঙ্গীতে তাহার ব্যাখ্যা করিতেন। তাঁহার ব্যাখ্যায় ও পাণ্ডিত্য-পূর্ণ আলোচনায় ব্রহ্মানন্দ প্রমুখ গুরুভ্রাতারা বুঝিতে সক্ষম হইলেন যে, ঠাকুরের সামান্য সামান্য উপদেশে কত গভীর ভাব ও তথ্য নিহিত আছে। অনবরত শাস্ত্রপাঠ ও ভগবদ্প্রসঙ্গের আলোচনা করিতে করিতে তাঁহারা হৃদয়ে ঈশ্বরলাভের জন্য একটা তীব্র ব্যাকুলতা অনুভব করিলেন। বরাহনগর মঠের একটী বৃহত্তম ঘরে সকলে সমবেত হইয়া নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে শাস্ত্রালোচনা করিতেন। কোন গৃহস্থ ভক্ত বা আগন্তুক ভদ্রলোক আসিলে এই ঘরেই তাঁহাদের সহিত ঈশ্বরপ্রসঙ্গ চলিত। ঈশ্বরচিন্তা ভিন্ন তাঁহারা আর কিছু জানিতেন না। এই সময়ে ঠাকুরের পরম অন্তরঙ্গ ভক্ত শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় মঠে আসিলে ব্রহ্মানন্দ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "মাষ্টার মহাশয়! আসুন, সকলে সাধন করি। তাই ত আর বাড়ীতে ফিরে গেলাম না। যদি কেউ বলে ঈশ্বরকে পেলে না তবে আর কেন? তা নরেন্দ্র বেশ বলে—রামকে পেলাম না বলে কি শ্যামকে নিয়ে ঘর করতেই হবে, আর ছেলেপুলের বাপ হতেই হবে! আহা নরেন্দ্র এক একটী কথা বেশ বলে।" নরেন্দ্রের কথা শুনিলে তাঁহার মনে শ্রীরামকৃষ্ণের স্মৃতির উদ্দীপনা হইত। ঠাকুর যে তাঁহাকে বলিতেন সহস্র-দল কমল! আগন্তুক কোন ভদ্রলোকের সহিত নরেন্দ্রনাথের ঈশ্বরপ্রসঙ্গের আলোচনা হইলে রাখাল সমীপস্থ ভক্ত ও গুরুভ্রাতাদের সম্বোধন করিয়া বলিতেন, "চল, নরেন কি বলছে শুনি গিয়ে।"

এই ত্যাগিমণ্ডলী বরাহনগর মঠে কঠোর তপস্যা ও অহর্নিশি সাধনভজন করিয়াও তৃপ্তি লাভ করিতে পারিতেছিলেন না। সকলেই কোনও নির্জ্জন স্থানে বসিয়া সাধনভজন করিতে ব্যাকুল হইলেন। কাহারও কাহারও ইচ্ছা হইল যে লোকালয় হইতে বহু দূরে গিয়া কোন বিজন প্রদেশে, নদীতীরে বা গিরি-গুহায় স্থিরাসনে বসিয়া ঈশ্বর-ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া থাকেন। কেহ ভাবিলেন তপোভূমি হিমালয়ের ক্রোড়ে বসিয়া সর্ব্বদা কঠোর সাধনায় রত হইবেন। বরাহনগর মঠে এইরূপ একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি হইল। রাখালের মনেও ইহার স্পর্শ লাগিল।

ব্রহ্মানন্দ নির্জ্জনে একাকী বসিয়া তন্ময়ভাবে চিন্তা করিতেন—কেন মনের শান্তি হইতেছে না? কি যেন চাই, কি যেন প্রাণে অপূর্ণতা বোধ হইতেছে, কিন্তু কিছুতেই সে অভাব দূর হইতেছে না। এই মঠ, যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী পরম পবিত্রচিত্ত ঈশ্বরলুব্ধ অন্তরঙ্গেরা দিনরাত কঠোর তপস্যা ও সাধনভজনে নিরত আছেন—এই মঠ, যেখানে নরেন্দ্রনাথের ন্যায় বৈরাগ্যবান ত্যাগিশ্রেষ্ঠ, দৃঢ়চেতা, তেজস্বী, মহাশক্তিশালী, জ্ঞানী, বিদ্বান ও উচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতি-সম্পন্ন শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয়তম অন্তরঙ্গ বিদ্যমান রহিয়াছেন—এই মঠ, যেখানে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাবে অনুরঞ্জিত হইয়া তাঁহার সেবা, পূজা, স্তব ও ধ্যানধারণাদি চলিতেছে—সেই পূতস্থানে থাকিয়াও মনের কেন শান্তি হইতেছে না? রাখালের মনে হইল যোগবাশিষ্ঠে ব্রহ্মজ্ঞানের কথা। মনই সকল অশান্তির মূল। ইহার নাশই একমাত্র উপায়। কঠোর সাধনে গভীর ধ্যানে এই মনের লয় করিতে হইবে। ঠাকুরের দিব্যস্পর্শে এই মনে যে আধ্যাত্মিক অনুভূতি হইত, মন যে

উচ্চতম স্তরে আরোহণ করিত, যে অতীন্দ্রিয় ভাবে তন্ময় হইয়া থাকিত —তাহা যে তাঁহার শক্তি—তাঁহার খেলা। কুম্ভকার যেমন মৃত্তিকা লইয়া নানা ছাঁচে তাহার গড়ন করে, তিনিও যে তাঁহাদের মন লইয়া নানা ছাঁচে গড়িতেন! আজ তাঁহার বিরহে প্রতিমুহূর্ত্তে রাখাল বুঝিতেছেন যে তাঁহার শক্তিতে ও তাঁহার অপার করুণায় এই মনে অতীন্দ্রিয় অনুভূতি ও আনন্দলাভ হইত! শ্রীকৃষ্ণের দেহত্যাগে অর্জ্জুন শক্তিহীন হইয়া পড়িয়াছিলেন। মহাবীর মহাধনুর্দ্ধর অর্জ্জুনের গাণ্ডীব তুলিবার পর্য্যন্ত সামর্থ্য ছিল না। ঠাকুরের অন্তর্দ্ধানে তাঁহার মনে হইল যে সেই দশা উপস্থিত হইয়াছে। সে মন কোথায়? যেরূপেই হউক এই মনের নাশ করিতে হইবে। রাখাল ভাবিয়া দেখিলেন যে মঠে বাস করিলে কত কাজকর্ম্ম ও বহির্মুখী চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হয়। গুরুভ্রাতাদের আহারবিহার, স্বাস্থ্য ও মঠের পরিচালনার ভার নরেন্দ্র তাঁহার উপর অর্পণ করিয়াছেন। কিন্তু তাহাও যে সুসম্পন্ন করা সময় সময় অসম্ভব হইয়া উঠে। মঠের গুরুভ্রাতারাও একে একে তপস্যার জন্য চলিয়া যাইতেছেন। নরেন্দ্রনাথকে বলিয়া তিনিও কোথাও গিয়া একাগ্রমনে সাধনভজন করিবেন, এইরূপ মনস্থ করিলেন।

এই বৈরাগ্যের উন্মাদনায় ঈশ্বরলাভের জন্য নির্জ্জনে কঠোর তপস্যার দৃঢ়সংকল্প লইয়া রাখাল নরেন্দ্রনাথকে একদিন বলিলেন, "এখানে থেকে তো কিছুই হল না! তিনি যা বলেছিলেন—ভগবান দর্শন কৈ হল?" রাখালের এই কথায় নরেন্দ্র কোন উত্তর দিলেন না। রাখাল তখন পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন, "চল, নর্ম্মদায় বেরিয়ে পড়ি।" এবার নরেন্দ্রনাথ রাখালের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "বের হয়ে কি হবে? জ্ঞান কি হয়, তাই জ্ঞান জ্ঞান করছিস্?"

ব্রহ্মানন্দ তদুত্তরে বলিলেন, "মুক্তি ও তাহার সাধন বইখানিতে আছে সন্ন্যাসীদের একসঙ্গে থাকা ভাল নয়। সন্ন্যাসী নগরের কথা আছে।" নরেন্দ্রনাথ নীরব হইয়া রহিলেন। তাঁহার মনেও তখন তীব্র ব্যাকুলতা—নির্জ্জন তপস্যার আকাঙ্ক্ষা জাগিতেছে।

অমৃতের পথ কঠিন, দুর্গম ও শানিত ক্ষুর-ধারের মত। ব্রহ্মানন্দ সেই দুর্গম পথের যাত্রী। তাঁহার অন্তরে শ্রীরামকৃষ্ণের বিরহে যে প্রদীপ্ত বহ্নিশিখা জ্বলিতেছিল—যে অশান্তির হাহাকারধ্বনি উঠিতেছিল, যে তীব্র অভাব প্রতি মুহূর্ত্তে হৃদয়ের অন্তরতম স্থলে অনুভব করিতেছিলেন, তাহাই বৈরাগ্যের আকারে দুঃসহ ঈশ্বর-ব্যাকুলতার রূপ ধরিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণই যে তাঁহার ধ্যান জ্ঞান তপস্যা ও ঈশ্বর। তিনি নিজেই যে নরেন্দ্রনাথকে স্পষ্টভাবে সরল ভাষায় বলিয়াছেন, "যে রাম যে কৃষ্ণ, সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ!" সেই পূর্ণব্রহ্ম নারায়ণ যে স্বয়ং রামকৃষ্ণ। গুরু কর্ণধাররূপে জগতে অবতীর্ণ হইয়া স্তরে স্তরে কত উচ্চ, উচ্চতর ও উচ্চতম অনুভূতি-রাজ্যে তিনি তাঁহাদের বিচরণ করাইয়াছেন। সেই মহাশক্তি কিসে লাভ হয়? আজ রাখাল সেই অতীন্দ্রিয় রাজ্যে বিচরণ করিবার জন্য কোন নির্জ্জন স্থানে বসিয়া অনন্তের ধ্যানে নিমগ্ন হইবার জন্য ব্যাকুল।

তাঁহার সন্ন্যাসী গুরুভ্রাতাদের মধ্যে যখন একে একে অনেকেই সাধনভজনের উদ্দেশ্যে তীর্থভ্রমণে বাহির হইলেন, তখন রাখালও কোন তীর্থে গিয়া তপস্যা করিবেন, এই দৃঢ় সংকল্প করিলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের আদরের রাখাল কোথাও গিয়া ভিক্ষা বা কষ্ট করিবে ইহা নরেন্দ্রনাথ বা তাঁহার কোন গুরুভ্রাতা পছন্দ করিতেন

না। তাই তাঁহারা রাখালকে একাকী তপস্যার জন্য কোথাও যাইতে দিতে চাহিতেন না।

১৮৮৭ খৃষ্টাব্দের নবেম্বরে অর্থাৎ বাংলা ১২৯৫ সালের অগ্রহায়ণ মাসে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী যখন নীলাচলে যাত্রা করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন তখন তিনি রাখালের তীর্থভ্রমণ ও তপস্যা করিবার সংকল্পের কথা শুনিতে পাইলেন। রাখালের সাধ পূর্ণ হয় এবং কোন কষ্ট না পান ইহা মনে করিয়া তিনি তাঁহাকে তাঁহার সঙ্গে যাইতে আদেশ করিলেন। রাখালও শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর সহিত যাইতে উৎসাহিত হইলেন। ইহাতে নরেন্দ্রনাথও কোন বাধা দিলেন না। পুরীতে শ্রীযুত বলরামবাবুদের "ক্ষেত্রবাসী" বলিয়া একটা বাড়ী ছিল। শ্রীশ্রীমা অগ্রহায়ণ মাসে পুরী যাত্রা করিলেন এবং তথায় ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত বলরাম বাবুদের "ক্ষেত্রবাসী" বাড়ীতে বাস করিয়াছিলেন। রাখাল প্রভৃতি অন্যত্র থাকিতেন। শ্রীশ্রীমার সঙ্গে রাখাল যাইবে এবং বলরামবাবুও তথায় আছেন ইহা মনে করিয়া নরেন্দ্র রাখাল সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইলেন।

রাখাল নীলাচলে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন করিবার জন্য শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। সেখানে প্রেমে আবিষ্ট হইয়া তন্ময়ভাবে শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিলেন। তাঁহার মনে স্বতঃই উদিত হইল শ্রীগৌরাঙ্গের কথা। সেই বিরহতপ্ত প্রেমময় মূর্ত্তি—যাঁহার বিরহাগ্নির উত্তাপে শ্রীমন্দিরের জগমোহনে অরুণস্তম্ভের নিকটে কঠিন পাষাণ গলিয়া তাঁহার করপল্লব ও পদচিহ্ন আজিও ধারণ করিয়া রাখিয়াছে। যিনি মহাপ্রেমে আবিষ্ট হইয়া যমুনাভ্রমে সমুদ্রে ঝাঁপাইয়া পড়িয়াছিলেন, চটক পর্ব্বতকে গোবর্দ্ধন গিরি

মনে করিয়া প্রেমোন্মত্তভাবে ছুটিয়া গিয়াছিলেন, যিনি প্রেমে বিহ্বল হইয়া কৃষ্ণবিরহে ভিত্তিগাত্রে মুখ ঘর্ষণ করিতেন—সেই অপূর্ব্ব বিরহী প্রেমিকের কথা রাখালের মনে উদিত হইয়া হৃদয় আর্দ্র হইয়া গেল। শ্রীচৈতন্যের বিরহের কথায় আর এক বিরহী প্রেমিকের কথা তাঁহার মনে পড়িল। শ্রীরামকৃষ্ণ দক্ষিণেশ্বরে ভাগীরথীকূলে "মা" "মা" করিয়া মাটিতে পড়িয়া মুখ ঘষিতেন, তাঁহার বিরহতপ্ত অশ্রু গঙ্গাসলিলে মিশিয়া যাইত—তাঁহার "মা" "মা" রবে বিরহের আর্ত্তনাদে পাষাণ হৃদয়েও চক্ষু সজল হইয়া উঠিত। সেই প্রেম—সেই বিরহের কথা স্মরণ করিতে করিতে রাখাল অশ্রুধারায় বিগলিত হইলেন। তিনি এই সময়ে দীনভাবে ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। কোন কোন দিন এমার মঠে আবার কোন কোন দিন অন্যান্য মঠে একবেলা মাত্র মহাপ্রসাদ ভিক্ষা করিয়া ভগবদ্-চিন্তায় বিভোর হইয়া রহিলেন। শরীরের দিকে আদৌ দৃষ্টি রাখিতে পারিতেন না। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী ইহা শুনিয়া দুঃখিত হইলেন। তাঁহাদের স্নেহের দুলাল রাখাল কোন কঠোরতা বা ক্লেশ করিতেছে শুনিলে শ্রীশ্রীমা অত্যন্ত চিন্তিত ও ব্যস্ত হইয়া পড়িতেন। বলরামবাবু ইহা শুনিতে পাইয়া রাখালকে তাঁহার গৃহে রাখিয়া যত্ন করিতে ব্যগ্র হইলেন। কয়েক মাস অতিবাহিত করিয়া রাখাল দেখিলেন নীলাচলে থাকিলে তাঁহার অভীপ্সিত তপশ্চর্য্যা ও কঠোর সাধনার পথে অনেক অন্তরায় আছে। তিনি মনে করিলেন যে একাকী বহুদূরে কোন নির্জ্জন স্থানে না গেলে কিছুই হইবে না। অগত্যা তিনি পুরী হইতে কটক হইয়া বরাহনগরের মঠে ফিরিয়া আসিলেন।

দশম পরিচ্ছেদ

তপস্যায় নিষ্ক্রমণ

মঠে ফিরিয়া আসিয়া ব্রহ্মানন্দ বিবেকানন্দ প্রমুখ কয়েকজন গুরুভ্রাতার সঙ্গে পুনরায় মিলিত হইলেন। ইতিমধ্যে শুনিলেন তাঁহার গুরুভ্রাতাদের মধ্যে অনেকেই তপস্যা ও সাধন ভজন করিবার জন্য ব্যাকুলচিত্তে নানা তীর্থে চলিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মানন্দ মঠে তন্ময়ভাবে বাস করিলেও অন্তরে অশান্তির অগ্নিতে দগ্ধ হইতেছিলেন। দিনের পর দিন চলিয়া যাইতেছে কিন্তু যে পরমা শান্তি ও নিবৃত্তি শ্রীরামকৃষ্ণ-সন্নিধানে তাঁহার মন অনুক্ষণ বোধ করিত তাহা কোথায়? কোথায় সে অনাবিল অপার্থিব প্রেম যাহার প্রবাহে বিশ্বজগৎ বিলুপ্ত হইয়া নিয়ত আনন্দের তরঙ্গ উত্থিত হয়? কি করিলে, কোথায় গেলে তাহা পাওয়া যায়? পুরী হইতে ফিরিয়া আসিয়া তিনি মঠের পরিচালনাকার্য্যে সম্পূর্ণ ভাবে দৃষ্টি রাখিতে পারিতেন না। স্বামিজী ব্রহ্মানন্দের এই তন্ময় ব্যাকুলতার ভাব লক্ষ্য করিলেন। তাঁহার সহিত একান্তে আলাপ-আলোচনা করিয়া তিনি বুঝিলেন যে তাঁহার নির্জ্জনে তপস্যা করিবার প্রবল আগ্রহ হইয়াছে। তিনিও তখন একাকী কোন সুদূর প্রদেশে বা তীর্থে তপস্যা করিবার সংকল্প করিতেছিলেন। ব্রহ্মানন্দের ব্যাকুলতা দেখিয়াও নিজের মনের অবস্থা দৃষ্টে তাঁহার হৃদয় সহানুভূতিতে পূর্ণ হইল। কোনরূপ আপত্তি

ও নিরুৎসাহ না করিয়া তিনি তাঁহাকে উত্তরাখণ্ডে যাইবার জন্য পরামর্শ দিলেন। পূর্ব্ব হইতে তিনিও সেই অঞ্চলে যাইবার মনস্থ করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মানন্দের যাহাতে কোন কষ্ট না হয় স্বামিজী সেজন্য সুবোধানন্দকে তাঁহার সঙ্গে যাইতে আদেশ করিলেন। কিন্তু ইহাতে সর্ব্বাগ্রে শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর অনুমতি ও আদেশ লইবার প্রয়োজন। শ্রীশ্রীমা তখন জয়রামবাটীতে ছিলেন। তিনি রাখালের অভিপ্রায় শুনিতে পাইয়া শ্রীযুত বলরামবাবুকে লিখিলেন "শুনিলাম রাখাল পশ্চিমে যাইবে। গেলবারে জগন্নাথে শীতে কষ্ট পাইয়াছিল। শীত অন্তে ফাল্গুন মাস নাগাত গেলে ভাল হয়। তবে যদি একান্তই ইচ্ছা হইয়া থাকে তাহা হইলে আর কি বলিব।" মা বুঝিয়াছিলেন যে ব্রহ্মানন্দের মনে এখন তীব্র ব্যাকুলতা। অনন্যচিত্তে পরম নিভৃতে তপস্যার দ্বারা ঈশ্বরলাভ করাই তাঁহার এই সন্তানের প্রবল আকাঙ্ক্ষা হইয়াছে। নীলাচলে ব্রহ্মানন্দ বিশেষ কোন গরম বস্ত্র লইয়া যান নাই, তজ্জন্য মায়ের প্রাণ স্নেহে বিগলিত হইয়াছিল। পুরীতে শীতও প্রবল নহে এবং কোন গরম বস্ত্র না লইলেও তেমন কষ্ট হইবার কারণ নাই। তবুও তিনি যে মা, এবং ব্রহ্মানন্দ তাঁহার ও শ্রীরামকৃষ্ণের আদরের মানসপুত্র। স্নেহের প্রাবল্যেই তিনি লিখিয়াছিলেন, "জগন্নাথে শীতে কষ্ট পাইয়াছিল।" তিনি জানিতেন যে, ব্রহ্মানন্দ যে ভাবে সর্ব্বদা তন্ময় হইয়া আছেন, তাহাতে শরীরের দিকে দৃষ্টি আদৌ থাকে না। এই অবস্থায় শীতপ্রধান পশ্চিমের কথা মনে করিয়াই তিনি তাঁহাকে ফাল্গুন মাসে যাইবার পরামর্শ

দিয়াছিলেন। কিন্তু অন্তর্যামী জননী অন্তরে অন্তরে বুঝিলেন; ব্রহ্মানন্দের মনে যে দিব্যভাবের ব্যাকুলতা আসিয়াছে, যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা ও বলবতী বাসনার উদয় হইয়াছে, যে মহাপুণ্যময়ী অশান্তির পূতাগ্নি তাঁহার হৃদয়ে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিয়াছে তাহা নিরোধ করা কঠিন। অপার মাতৃস্নেহে বিগলিত হইয়াও তাই পুত্রের মঙ্গলকামনায় শেষে লিখিলেন, "তবে যদি একান্তই ইচ্ছা হইয়া থাকে, তাহা হইলে আর কি বলিব।" বাস্তবিকই এখানে বলিবার কিছু নাই। যখন বিপুলসলিলা স্রোতস্বিনী উচ্ছ্বসিত তরঙ্গভঙ্গে সমুদ্রের অভিমুখে অপ্রতিহত গতিতে ধাবিত হয়, যখন স্থির বায়ুমণ্ডলে ঝটিকা বিক্ষুব্ধ হইয়া প্রবল বেগে জল স্থল আলোড়ন করে, যখন মধুলোভী ভ্রমর মধুগন্ধে আকৃষ্ট হইয়া প্রমত্তভাবে কুসুমের দিকে ছুটিয়া যায়—তখন সে গতি, সে আলোড়ন, সে আকর্ষণকে কে বাধা দিতে পারে? ব্রহ্মানন্দ আর ফাল্গুন মাস পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে পারিলেন না। কালবিলম্ব না করিয়া তিনি ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে অর্থাৎ অগ্রহায়ণের শেষ ভাগেই স্বামিজীর উপদেশ মত উত্তরাখণ্ডে যাত্রা করিতে অভিলাষী হইলেন। এই পর্য্যটনে ব্রহ্মানন্দের যাহাতে কোন ক্লেশ না হয় তজ্জন্য স্বামিজী—শুধু সুবোধানন্দকে সঙ্গে দিয়াই ক্ষান্ত হইলেন না, তিনি প্রমদাবাবুর নিকট একখানি পরিচয়পত্রও তাঁহাদের সঙ্গে দিলেন। পত্রে তিনি বিশেষ করিয়া উল্লেখ করিলেন যে ব্রহ্মানন্দ শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয়পাত্র ছিলেন।

স্বামিজীর পরামর্শ মত তাঁহারা প্রথমে বাবা বিশ্বনাথ ও মাতা অন্নপূর্ণাকে দর্শন করিতে বারাণসী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পথে তাঁহারা বৈদ্যনাথধামে নামিয়া পড়িলেন। বৈদ্যনাথের উন্মুক্ত বিস্তৃত প্রান্তর, আশে পাশে, নিকটে ও দূরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গিরিরাজির শোভা এবং তরুলতার অনুপম সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাঁহার মনে বিমল আনন্দের সঞ্চার হইল। স্থানটী তপস্যার অনুকূল দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন। বরাবর কাশীর টিকিট থাকায় তাঁহারা মাত্র দুইদিন তথায় থাকিতে পারিয়াছিলেন।

বৈদ্যনাথধাম হইতে রওনা হইয়া তাঁহারা দুইজনে যথাকালে অবিমুক্ত বারাণসীধামে উপনীত হইলেন। প্রথমে উভয়ে বাঙ্গালী-টোলায় বংশীদত্তের বাড়ীতে উঠিয়াছিলেন এবং তথায় একতলায় একটি সঁ্যাতসেঁতে ঘর পাইয়াছিলেন। ব্রহ্মানন্দ লিখিয়াছিলেন,"বংশীদত্তের বাটীতে আমাদের শীতেতে হাড় সেঁকে দিত।" বাড়ীটী পুরাতন প্রথায় নির্ম্মিত, রৌদ্র বা আলো আসিবার ব্যবস্থা খুব কম ছিল। ইহা ছাড়া পশ্চিমের শীত সম্বন্ধে ইঁহাদের এই প্রথম অভিজ্ঞতা।

কাশীধামে পৌঁছিয়াই সেইদিন ব্রহ্মানন্দ স্বামিজী-লিখিত পত্রসহ সুবোধানন্দকে প্রমদাবাবুর নিকট পাঠাইয়া দেন। এই পরিচয়পত্র ছাড়া স্বামিজী ডাকযোগে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ৩রা ডিসেম্বর তারিখের পত্রে প্রমদাবাবুর নিকট কাশীধামে ইঁহাদের রওনা হইবার কথা জানাইয়াছিলেন। সুতরাং সুবোধানন্দকে দেখিয়াই তিনি যথোচিত যত্ন-সহকারে অভ্যর্থনা করেন এবং তৎপরদিন দুইজনকেই তাঁহার বাড়ীতে ভিক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য আমন্ত্রণ করেন। পূর্ব্ব হইতেই তিনি রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের কয়েকজন সন্ন্যাসীর সহিত ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে প্রায়ই তাঁহার পত্রের আদান-প্রদান চলিত। কাশীধামে প্রমদাবাবুর ডাক নাম ছিল "রাজাবাবু"।

অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী হইয়াও হিন্দুদর্শনে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য, অনুরাগ, ধর্ম্মপ্রাণতা ও তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেখিয়া স্বামিজীপ্রমুখ সন্ন্যাসীরা তাঁহার গুণমুগ্ধ ছিলেন। ব্রহ্মানন্দ তাঁহার বিষয়ে পূর্ব্বেই স্বামিজীর নিকট শুনিয়াছিলেন এবং প্রমদাবাবুর সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া ও তাঁহার অমায়িক ব্যবহার দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। পিশাচমোচন পল্লীস্থিত উদ্যানবাটীতে তাঁহাদের থাকার জন্য প্রমদাবাবু বারম্বার বিশেষ অনুরোধ করিলেন। স্থানটী নির্জ্জন এবং সাধনভজনের অনুকূল হইবে বলিয়াই ব্রহ্মানন্দ ইহাতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু প্রমদাবাবু যখন তাঁহাদের তথায় আহারের বন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন, তখন তিনি উহা দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করিয়া স্পষ্টভাবে তাঁহাকে বলিলেন, "সত্রে ভিক্ষা করিয়া আহার করাই সাধুর কর্ত্তব্য। আমরা তাহাই করিব।" সত্রে ভিক্ষা করিয়াই তাঁহারা কোনরূপে উদরপূর্ত্তি করিতেন।

ব্রহ্মানন্দ কোন লোকাপেক্ষা রাখিতেন না। এই সময়ে তাঁহার মন শুধু তপস্যার জন্য ব্যাকুল থাকিত, লোকসঙ্গ তাঁহার ভাল লাগিত না। তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কখন কোন বিষয়ে কাহারও নিকট ভিক্ষাপ্রার্থী হন নাই।

সারদানন্দ এই সময়ে হৃষীকেশে সাধনভজন করিতেছিলেন, তিনি সংবাদ পাইলেন যে ব্রহ্মানন্দ ও সুবোধানন্দ উভয়েই কাশীধামে প্রমদাবাবুর বাগানে রহিয়াছেন। প্রমদাবাবুর সহিত তাঁহার পূর্ব্বে পরিচয় ছিল। কাশীধামে পাছে ব্রহ্মানন্দের কোন কষ্ট হয় সেজন্য তিনি ব্যস্ত হইলেন। হৃষীকেশে ব্রহ্মানন্দ আসিলে তাঁহারা

তাঁহার দিকে সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিতে পারিবেন, এই ভাবিয়া সারদানন্দ ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ৩১শে ডিসেম্বর পত্রে প্রমদাবাবুকে লিখিলেন, "কলিকাতার এক পত্রে জ্ঞাত হইলাম যে, আমাদের রাখাল ও সুবোধ কাশীতে আপনার বাগানে রহিয়াছেন এবং হৃষীকেশে আসিতে বড়ই উৎসুক। রাখালকে এই পত্র দেখাইবেন এবং কহিবেন যে এখন এই স্থান সম্পূর্ণ অনুকূল। শীত কলিকাতা অপেক্ষা অধিক নহে। ধুনির কাষ্ঠ ইত্যাদিও প্রচুর পাওয়া যায়। ভিক্ষার খুব সুবিধা। থাকিবার ঘরও রহিয়াছে। জল অমৃততুল্য, পান করিলে খুব ক্ষুধা বৃদ্ধি করে। অধিক আর কি লিখিব। এখানে আসিলে তাঁহার এখন কোন কষ্টই হইবে না বরং অপূর্ব্ব আনন্দলাভই করিবেন। হরিদ্বার হইতে হৃষীকেশ আন্দাজ ১৪ মাইল হইবে। টাট্টু ঘোড়া পাওয়া যায়। সুবোধের যদি এখন না আসা মত হয় তাহা হইলে তিনি একাকী আসিলেও কোন কষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই। এখন আসিলে মাঘ মাসের কল্পবাসও হইবে, কারণ সপ্তপ্রয়াগের মধ্যে এই স্থান দ্বিতীয় প্রয়াগ।"

স্বামী সারদানন্দের পত্রে এত সুখ-সুবিধার কথা থাকা সত্ত্বেও ব্রহ্মানন্দ তখন হৃষীকেশে গেলেন না। তখন কাশীধাম তাঁহার ভাল লাগিয়াছিল। তিনি মানসচক্ষে দেখিতেন অবিমুক্ত বারাণসী-ধাম, যেখানে কত সাধু, যোগী, ঋষি, তপস্বী, সাধক ও আচার্য্য পুরুষ, কত পুণ্যাত্মা মহাত্মা সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিয়াছেন! সত্য সত্যই স্বর্ণকাশী। তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইত, এই পুণ্যতীর্থে আসিয়া ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ দিব্য দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন—স্বর্ণপুরী কাশীর মণিকর্ণিকাঘাটে স্বয়ং জগদ্গুরু বিশ্বনাথ মুমূর্ষু

জীবের কর্ণে মহামন্ত্র দান করিতেছেন—মহারুদ্র মহাকাল ভৈরব ত্রিশূলহস্তে বেড়াইতেছেন! হায়, সেই দর্শন কোন্ প্রজ্ঞাচক্ষু-লাভে হয়? কৈ সে প্রজ্ঞাচক্ষু, সেই দিব্যভাবময় দৃষ্টি—যাহাতে দর্শন হয় শুভ্ররজতগিরিসম বিভূতিভূষিতাঙ্গ অস্থিমালা-শোভিত দিগম্বর চন্দ্রমৌলি ভগবান পিনাকপাণি বিশ্বনাথ? কৈ সে প্রজ্ঞাচক্ষু, সেই দিব্যভাবময় দৃষ্টি—যাহাতে দর্শন হয় কোটী-চন্দ্রার্কদ্যুতিসমুজ্জ্বলা তড়িন্ময়ী সর্ব্বৈশ্বর্য্যধারিণী বরাভয়-প্রদায়িনী ভক্তাভীষ্টপূর্ণকারিণী তপঃফলদাত্রী—দক্ষকরে বিচিত্ররত্নরচিতস্বর্ণ-দর্ব্বিধৃতা অন্নদায়িনী অন্নপূর্ণা জগজ্জননী বিশ্বেশ্বরী! অর্দ্ধচন্দ্রাকারে পুণ্যপ্রবাহিণী ভাগীরথীতটদেশে আকাশস্পর্শী শত শত মন্দির-চূড়া শোভা পাইতেছে! পঞ্চক্রোশী কাশী "বোম্" "বোম্" "হর" "হর" নিনাদে কাঁপিয়া উঠিতেছে—গগন পবন মুখরিত করিতেছে। বরুণা ও অসি কত নীরব সাধকের স্মৃতি বক্ষে লইয়া নীরবে বহিয়া যাইতেছে। ভাবঘন ধ্যানমূর্ত্তি কাশীধাম! এই পুণ্যতীর্থে নির্জ্জনে বসিয়া ব্রহ্মানন্দের শরীর ও মন ভাবে তন্ময় হইয়া পড়িত। তথায় অহরহ দিবারাত্রি "শিব" "শিব" "হর" "হর" ধ্বনি শুনিতে শুনিতে ব্রহ্মানন্দ পরমানন্দে গভীর ধ্যানে তন্ময় হইতেন। কাশীধাম সহসা ত্যাগ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইল না।

এই ভাবে মাঘ মাস পর্য্যন্ত অতিবাহিত করিয়া ব্রহ্মানন্দ নর্ম্মদা তীর্থে যাইবার সংকল্প করিলেন। এই সময়ে একটী বাঙ্গালী পরিব্রাজক ব্রহ্মানন্দকে দেখিয়া আকৃষ্ট হন। উক্ত পরিব্রাজক প্রায়ই তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতেন। ব্রহ্মানন্দের ধীর প্রশান্ত মূর্ত্তি, তাঁহার কঠোর বৈরাগ্য, তপস্যাদীপ্ত জীবন এবং অমায়িক

ব্যবহার দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন। একদিন তিনি শুনিতে পাইলেন যে ব্রহ্মানন্দ নর্ম্মদা তীর্থে চলিয়া যাইতেছেন। ইহা শুনিয়া পরিব্রাজকও তাঁহার সঙ্গে নর্ম্মদায় যাইবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। সুবোধানন্দ এবং উক্ত সঙ্গী সহ ব্রহ্মানন্দ ওঙ্কারনাথ অভিমুখে রওনা হইলেন।

ভারতের পুণ্যতীর্থ পবিত্র নদনদীর মধ্যে নর্ম্মদা অন্যতম। এই নর্ম্মদার তীরে আচার্য্য শঙ্করের কত কীর্ত্তিকাহিনী বিজড়িত রহিয়াছে। নর্ম্মদার তীরেই ওঙ্কারনাথের মন্দির—ব্রহ্মানন্দের বহুদিনের ঈপ্সিত তপস্যার স্থান। এইখানে তপস্যা করিবার জন্য তাঁহার কত আগ্রহ ও ব্যাকুলতা ছিল! তাঁহারা নর্ম্মদাতীর্থে পৌঁছিলে দৈবক্রমে একটী মঠে তাঁহাদের তিন জনের স্থান হইল। তপস্যার একান্ত অনুকূল স্থানে, স্বভাব-সুন্দর দৃশ্যের মধ্যে, পবিত্র তীর্থের আধ্যাত্মিক আবেষ্টনে ব্রহ্মানন্দ অহরহ তন্ময় হইয়া থাকিতেন। এই নর্ম্মদার তীরেই তিনি একাদিক্রমে ছয় দিন গভীর অতীন্দ্রিয় ভাবসমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া তন্ময়ভাবে ছিলেন। তাঁহার কোন বাহ্য সংজ্ঞা ছিল না। তৎকালীন তাঁহার অন্তরের উপলব্ধি কে প্রকাশ করিবে? তিনি নিজের সাধনভজন বা অনুভূতির কথা প্রায়ই গোপন রাখিতেন। এইজন্য মহাপুরুষদের সাধকজীবনের প্রচেষ্টা ও অনুভূতির অনেক কথা অজ্ঞাত। কোন্ অন্তররাজ্যে বিচরণ করিয়া উত্তরকালে স্বামী ব্রহ্মানন্দ বলিতেন, "নির্ব্বিকল্প সমাধির পর ধর্ম্মজীবন আরম্ভ হয়!" সে গভীর তত্ত্ব কয়জন বুঝিবে?

ওঙ্কারনাথে কিছুদিন থাকিয়া ব্রহ্মানন্দ শ্রীরামচন্দ্রের পুণ্যলীলা-

ক্ষেত্র গোদাবরীতটে দণ্ডকারণ্যে পঞ্চবটীবন দর্শন করিতে গমন করিলেন। কিন্তু সেখানে গিয়া তিনি দেখিলেন যে পুণ্যতোয়া গোদাবরী কলকল রবে বহিয়া যাইতেছে সত্য, কিন্তু বনের নাম-গন্ধ নাই। ভীষণ দণ্ডকারণ্যের পঞ্চবটীবন এখন বিভিন্ন পল্লী-সমন্বিত সহরের আকার ধারণ করিয়াছে। ঋক্ষ, ব্যাঘ্র, সিংহ, গজ প্রভৃতি হিংস্র শ্বাপদকুলের গর্জ্জন নাই—এখন তৎপরিবর্ত্তে গৃহপালিত পশু ও নানা শ্রেণীর নরনারীর কল-কোলাহল। ঘন নিবিড় শাল পিয়াশাল অর্জ্জুন প্রভৃতি দীর্ঘাকৃতি বৃক্ষরাজির স্থলে বিচিত্র সুদৃঢ় অট্টালিকাশ্রেণী এবং লোকের ঘন বসতি। কিন্তু এই সব নানাপ্রকার পারিপার্শ্বিক পরিবর্ত্তন ও বিক্ষেপ সত্ত্বেও চারিদিকে উচ্চ গিরিশ্রেণী বেষ্টিত থাকায় স্থানটী অনুপম সৌন্দর্য্যময় ছিল। একদিন পম্পা সরোবরের তটে তিনি শ্রীশ্রীসীতারামের পুণ্যলীলা স্মরণ করিয়া ভাবে আবিষ্ট হইলেন। সেই অতীত দৃশ্য তাঁহার নয়নসমক্ষে ভাসিয়া উঠিল। তিনি ভাবচক্ষে দেখিলেন, জটাবল্কলপরিহিত ধনুর্দ্ধারী শ্যামলসুন্দর রঘুপতি শ্রীরামচন্দ্র পরম-তপস্বী বেশে দাঁড়াইয়া আছেন, পার্শ্বে কাষায়বসনধারিণী মা জানকী এবং অদূরে কুটীর সম্মুখে ব্রহ্মচারিবেশে লক্ষ্মণ অপলকনেত্রে অবস্থান করিতেছেন। কি অনুপম শোভা! নিবিড় দণ্ডকারণ্যে এই পঞ্চবটী-কুটীরের চারিদিকে পুষ্পতরুতে কত বর্ণের কুসুমরাশি ফুটিয়া রহিয়াছে—তাহারা যেন নীরবে শ্রীশ্রীসীতারামকে অর্চ্চনা করিতেছে, বৃক্ষে বৃক্ষে তরুলতায় বিহগ-কাকলীতে এই পুণ্যভূমি যেন তাঁহাদের স্তবগানে মুখরিত হইতেছে! "জয় জয় রাম সীতারাম" উচ্চারণ করিতে করিতে তিনি বিভোর হইয়া পড়িলেন। ব্রহ্মানন্দ ভাবে

তন্ময় হইয়া গেলেন—তাঁহার আর বাহ্যসংজ্ঞা রহিল না। পরে তিনি সহজ অবস্থায় ফিরিয়া আসিলে দ্রবীভূত হৃদয়ে প্রেম-বিগলিত কণ্ঠে রাম নাম উচ্চারণ করিতে লাগিলেন। এই তীর্থ-ভ্রমণকালে যখনই ব্রহ্মানন্দ তন্ময়ভাবে নিমগ্ন হইয়া পড়িতেন, তখনই সুবোধানন্দ তাঁহার প্রতি ব্যগ্র ও সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন।

শ্রীভগবান যখন পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন, তখন তিনি জীবহিতকল্পে ও ধর্ম্মস্থাপনার্থে মনুষ্যরূপে যে যে লীলা করেন—তাহা নিত্য। কামকাঞ্চনাসক্ত সাধন-ভজনহীন সাধারণ জীব তাহা স্থূল চক্ষে দেখিতে পায় না, কিন্তু যাঁহারা সাধক, উচ্চ ভাবভূমিতে যাঁহাদের মন অবস্থিত, তাঁহারা সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে ভাবময় চক্ষে এই নিত্যলীলা দর্শন করিয়া থাকেন। ভক্তিরসের রসিক কত সাধক বৈষ্ণব মহাজন বৃন্দাবনে শ্রীরাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলা এখনও দর্শন করিয়া আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হন। এই জন্যই বৈষ্ণব মহাজন বলিয়া থাকেন,

> "অদ্যাপিও সেই লীলা করেন গৌর রায়।
> কোন কোন ভাগ্যবান দেখিবারে পায়॥"

মহাপুরুষেরা পুণ্যতীর্থে গিয়া তদ্ভাবে ভাবিত হইয়া যান। তাঁহাদের চিত্তদর্পণে সেই ভাবের প্রতিবিম্ব পড়ে এবং তাঁহাদের ভাবময়চক্ষে চিন্ময়লীলা স্ফুরিত হইয়া সমুপস্থিত হয়। ঠাকুর বলিতেন, "চিন্ময় ধাম, চিন্ময় নাম, চিন্ময় শ্যাম।"

শ্রীরামচন্দ্রের চিন্ময় আনন্দলীলা দর্শন করিয়া ব্রহ্মানন্দ অপরিসীম

আনন্দে তিন দিন পরে পঞ্চবটী হইতে শ্রীদ্বারকানাথ দর্শনের উদ্দেশ্যে তাঁহার গুরুভ্রাতা সুবোধানন্দ ও পরিব্রাজক সঙ্গিসহ বোম্বাই অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

বোম্বাই সহরে জন ডিকিন্‌সনের বড়বাবু এবং শ্রীরামকৃষ্ণের পরম ভক্ত শ্রীকালীপদ ঘোষ (কালী দানা) কর্ম্মোপলক্ষে অবস্থান করিতেছিলেন। কালীবাবুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে তিনি তাঁহাদিগকে তাঁহার বাসায় থাকিতে খুব অনুরোধ করেন, কিন্তু ব্রহ্মানন্দ তথায় উঠিলেন না। শ্রীশ্রীমুম্বাদেবীর মন্দিরসংলগ্ন একটি একান্ত নিভৃত স্থানে তিনি সঙ্গিদ্বয়সহ আশ্রয় লইলেন। তিনি পরে বলরাম-বাবুকে এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন, "তাহা অপেক্ষা আমরা ভাল স্থানে ছিলাম বলিয়া সেখানে থাকি নাই।" বিশেষতঃ এই সময়ে জনকোলাহল বা লোকসঙ্গ তাঁহার ভাল লাগিত না। তাঁহার মন এখন ব্যাকুলতাপূর্ণ। তাই কালীপদবাবু আন্তরিক অনুরোধ ও আগ্রহ করিলেও ব্রহ্মানন্দ তাঁহার বাড়ীতে থাকিতে স্বীকৃত হইলেন না। সাত আট দিন বোম্বেতে বাস করিয়া তিনি শ্রীদ্বারকা-নাথ দর্শনে গমন করিলেন।

ব্রহ্মানন্দ ভিক্ষান্নের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া চলিতেন। অর্থ তিনি স্পর্শ করিতেন না। তাঁহার তেজঃপুঞ্জ লাবণ্যপুষ্ট ধ্যানগম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া জনৈক ভাটীয়া মহাজন বিশেষ আকৃষ্ট হইলেন। শেঠজী জানিতে পারিলেন যে তাঁহারা শ্রীদ্বারকাধামের যাত্রী। তাঁহাদের তীর্থপর্য্যটনে তিনি কিঞ্চিৎ অর্থ সাহায্য করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু ব্রহ্মানন্দ উহা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। শেঠজী যখন দেখিলেন যে ইঁহারা তাঁহার

নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিতে একান্ত অনিচ্ছুক তখন অগত্যা তিনি তিনজনের দ্বারকাধাম যাইবার জন্য ষ্টীমারের টিকিট কিনিয়া সুবোধানন্দের হস্তে প্রদান করিলেন।

ষ্টীমারযোগে প্রায় সাতচল্লিশ ঘণ্টা যাত্রার পর ব্রহ্মানন্দ সহযাত্রীদের সহিত দ্বারকাধামে উপনীত হইলেন। অনন্ত প্রশান্ত আরব সমুদ্রের নীলবক্ষ হইতে শ্রীশ্রীদ্বারকানাথের শ্রীমন্দিরের চূড়া দেখিতে পাওয়া যায়। সমুদ্রতটের নিকবর্ত্তী হইলে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে সম্মুখে অনন্তফেনিল বারিরাশি তরঙ্গের পর তরঙ্গ তুলিয়া অবিরাম বেলাভূমির উপর প্রতিহত হইতেছে। অপর দিকে গোমতীর শীর্ণধারা ক্ষীণভাবে সমুদ্রে মিশিয়াছে। আর মধ্যভাগে বিচিত্র সৌধমালার ভিতর আকাশচুম্বী শ্রীদ্বারকানাথের মন্দিরচূড়া শোভা পাইতেছে। শত শত নরনারীর কণ্ঠে উচ্চারিত হইতেছে "জয় দ্বারকানাথ কি জয়", "জয় রণছোড়জী কি জয়"। ষ্টীমার হইতে নৌকাযোগে নামিয়া ব্রহ্মানন্দ সঙ্গিগণসহ শ্রীমন্দিরের নিকটবর্ত্তী একটী ধর্ম্মশালায় অবস্থান করিলেন।

দ্বারকাধামে তীর্থযাত্রীরা পুণ্যসলিলা গোমতী নদীতে স্নান করা পুণ্যজনক মনে করিয়া থাকে এবং তথায় তীর্থযাত্রার ইহা একটি প্রধান অঙ্গ। ব্রহ্মানন্দ তাঁহার গুরুভ্রাতা ও অপর সঙ্গিসহ তথায় স্নান করিতে গেলেন। কিন্তু স্নানের পূর্ব্বে রাজসরকারের কর্ম্মচারী প্রত্যেকের নিকট হইতে দুই টাকা মাশুল চাহিলেন। যাত্রীরা ইহা দিলে তবে গোমতীস্নানের পুণ্যসঞ্চয় করিতে পারে! ব্রহ্মানন্দ উক্ত কর দিতে অস্বীকার করিলেন। নিঃসম্বল সঙ্গীদের বলিলেন, "চল আমরা ফিরিয়া যাই।" একজন অর্থশালী ব্যবসায়ী

শেঠ তাঁহাদিগকে অস্নাতভাবে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে দেখিয়া আহ্বান করিলেন। শেঠজী নিজেও স্নানার্থী; তিনি ইঁহাদের দেয় মাশুল দিয়া পুণ্যসঞ্চয় করিতে চাহিলেন। কিন্তু ব্রহ্মানন্দ তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া বলিলেন, "গোমতী নদীতে স্নান অপেক্ষা তীর্থরাজ সমুদ্রে স্নান অধিকতর পুণ্যজনক। বৃথা অর্থব্যয়ের কোন আবশ্যক নাই। আমরা ভেটপুরী সঙ্গমে সমুদ্রে স্নান করিতে যাইব।" ব্রহ্মানন্দের ঈদৃশ উক্তি শেঠজীর হৃদয় স্পর্শ করিল। ব্রহ্মানন্দের তেজঃপূর্ণ বাক্য ও বৈরাগ্যমণ্ডিত গম্ভীর মূর্ত্তি দেখিয়া শেঠজী মুগ্ধ হইলেন। তিনি তাঁহার গৃহে ভিক্ষা লইবার জন্য ব্রহ্মানন্দকে সঙ্গিসহ আমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহারা শেঠজীর গৃহে উপনীত হইলে তিনি ফুলচন্দন দিয়া তাঁহাদের পূজা করিলেন এবং প্রত্যেকের হস্তে একখানি ভগবদ্গীতা গ্রন্থ দিলেন। তিনদিনই শেঠজী তাঁহাদিগকে পরম ভক্তিসহকারে সেবা করিয়াছিলেন। ভারতের নানাস্থানে তাঁহার কারবার ছিল, তিনি তাঁহার কর্ম্মচারীদের নিকট ব্রহ্মানন্দকে পরিচয় পত্র দিতে চাহিলেন, যাহাতে তীর্থ বা দেশভ্রমণে তাঁহার কোনরূপ ক্লেশ বা অসুবিধা না হয়। কিন্তু ব্রহ্মানন্দ তাঁহাকে বলিলেন, "আমার কোন বস্তুর অভাব বা আবশ্যক নাই। সাধুসন্ন্যাসীর ঈশ্বরই একমাত্র আশ্রয় ও ভরসা।" ইহা শুনিয়া শেঠজী কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "আপনার তীর্থভ্রমণের গাড়ীভাড়াস্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ দিতে চাই, অনুগ্রহপূর্ব্বক গ্রহণ করুন।" তদুত্তরে তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "অর্থ বা কোনরূপ যানবাহনের আমার দরকার নাই। তীর্থভ্রমণে আমি পদব্রজে গমন করিব।" এই বলিয়া ব্রহ্মানন্দ তথা হইতে বহির্গত হইয়া তাঁহাদের আবাসে ফিরিয়া আসিলেন।

পরদিন ব্রহ্মানন্দ তাঁহার গুরুভ্রাতা ও অপর সঙ্গিসহ সাত ক্রোশ দূরে ভেটদ্বারকা দর্শনে পদব্রজে যাত্রা করিলেন। তথায় স্নান ও মন্দির দর্শনাদির পর অত্যন্ত ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত বোধ করিলে তিনি সুবোধানন্দকে ধর্ম্মশালা হইতে কিছু ভিক্ষা করিয়া আনিতে বলিলেন। ধর্ম্মশালার অধ্যক্ষ সাধুসেবার জন্য বাদাম রাখিতেন। সুবোধানন্দ ভিক্ষা চাহিলে অধ্যক্ষ তাঁহাকে কয়েক সের বাদাম ভিক্ষা দিলেন। বাদাম লইয়া ব্রহ্মানন্দের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এত বাদাম কে দিয়েছে?" সুবোধানন্দ বলিলেন, "ধর্ম্মশালার অধ্যক্ষ।" ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, "আমাদের জন্য দুই ছটাক রেখে বাকিগুলি ফিরিয়ে দিয়ে এস।" "সন্ন্যাসীর সঞ্চয় করিতে নাই"—শ্রীরামকৃষ্ণের এই বাণী তাঁহার ত্যাগধর্ম্মের মূলমন্ত্র ছিল। তাঁহারা ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্যই ভিক্ষা করিতেন, প্রয়োজনের অতিরিক্ত কখনও লইতেন না। সুবোধানন্দ দুই ছটাক বাদাম রাখিয়া অবশিষ্টগুলি অধ্যক্ষকে প্রত্যর্পণ করিতে গেলে উহা সে ফেরত লইতে স্বীকৃত হইল না। সুবোধানন্দ ইহা জানাইলে ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, "দুই ছটাক রাখিয়াছ তো? অবশিষ্ট-গুলি দরিদ্রদের মধ্যে বিলাইয়া দাও।"

ভেটদ্বারকা হইতে ফিরিয়া আসিয়া দ্বারকা হইতে জাহাজে চড়িয়া তাঁহারা সুদামাপুরী বা পোরবন্দর যাত্রা করিলেন। সুদামা-পুরী হইতে পদব্রজে জুনাগড়ে গিয়া তথায় ২।১ দিন থাকিয়া তাঁহারা গির্ণার পাহাড়ে গেলেন। গির্ণারের অভ্রভেদী চূড়া দেখিয়া ব্রহ্মানন্দ মুগ্ধ হইলেন। তাঁহার গুরুভ্রাতাও সঙ্গীলোকটিকে লইয়া সেই উচ্চ চূড়ায় উঠিতে লাগিলেন। প্রায় ১০ মাইল পথ খাড়া চড়াই।

তাঁহারা তিনজন ধীরে ধীরে প্রখর রৌদ্রে সেই দুরারোহ পথ অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিলেন। দেহ ঘর্ম্মাক্ত, শ্রান্ত ও অবসন্ন হইয়া আসিতেছে, কিন্তু উপরে না পৌঁছান পর্য্যন্ত কোন উপায় নাই। এই পথ চলিতে তাঁহাদের অত্যন্ত ক্লেশ হইল। কিন্তু যখন তাঁহারা পর্ব্বতশীর্ষে উঠিলেন, তখন স্থানটির মনোরম দৃশ্যে ও শ্রান্তিহর সুমন্দ পবনে তাঁহাদের সমুদায় কষ্ট যেন চলিয়া গেল। এই পর্ব্বত আরোহণে ৩।৪ দিন পর্য্যন্ত ব্রহ্মানন্দের সর্ব্বাঙ্গে বেদনা ছিল। গির্ণার পর্ব্বতে অশোকস্তম্ভ, হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও মুসলমান যুগের প্রাচীন জীর্ণ মন্দিরাদি, সমাধিক্ষেত্র এবং খাপরা-খোদিগুহাদি পথ চলিতে চলিতে তাঁহাদের নয়নগোচর হইল। ৺শিবরাত্রি ব্রত তাঁহারা এই পাহাড়ের উপরেই উদ্‌যাপন করিলেন। তথায় বাস করিবার সময় তাঁহারা নীচে পাহাড়সংলগ্ন জঙ্গলে কোন কোন দিন সিংহগর্জ্জন শুনিতে পাইতেন।

গির্ণার হইতে অবতরণ করিয়া ব্রহ্মানন্দ সঙ্গিদ্বয়সহ পদব্রজে গুজরাটের মধ্য দিয়া আমেদাবাদে আসিলেন ; তথায় দুই এক দিন বিশ্রাম করিয়া তাঁহারা পুনরায় তীর্থপর্য্যটনে যাত্রা করিলেন।

প্রথমে তাঁহারা পুষ্করতীর্থে আসিয়া পৌঁছিলেন। স্থানটী অতি মনোরম দেখিয়া ব্রহ্মানন্দ তথায় ৮।৯ দিন বাস করিলেন। এখানে একটী বাঙ্গালী ব্রহ্মচারী তাঁহাদিগকে খুব আদরযত্নসহকারে আশ্রয় দিয়াছিলেন। ব্রহ্মানন্দ তাঁহার সরল ব্যবহার ও আন্তরিক শ্রদ্ধাভক্তি দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত ও মুগ্ধ হইয়াছিলেন। দৈবক্রমে তাঁহাদের সঙ্গী পরিব্রাজকটী প্রবল জ্বররোগে আক্রান্ত হন। জ্বর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তথায় চিকিৎসার সুবিধা না থাকায়

ব্রহ্মানন্দ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে তিনি ও সুবোধানন্দ দুইজনে মিলিয়া অতি কষ্টে তাঁহাকে আজমীঢ় হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য লইয়া আসিলেন। ডাক্তার পরীক্ষা করিয়া তাঁহাদিগকে জানাইলেন, "ইঁহার নিউমোনিয়া হইয়াছে।" আর কোন উপায় নাই দেখিয়া অগত্যা তাঁহারা তাঁহাকে হাসপাতালে রাখিয়া আসিলেন। যথাবিধি চিকিৎসা ও পথ্যাদির সুবন্দোবস্ত বিষয়ে ডাক্তারের প্রতিশ্রুতি পাইয়া তাঁহারা পুষ্করে ফিরিয়া গিয়া ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে, ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম ভাগেই শ্রীবৃন্দাবনের অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনে ব্রহ্মানন্দের এই দ্বিতীয়বার আগমন। পূর্ব্বে একবার শ্রীরামকৃষ্ণ লীলাদেহে বর্ত্তমান থাকিতে শ্রীযুত বলরামবাবুর সঙ্গে তথায় আসিয়াছিলেন। সে একদিন আর আজ একদিন!

শ্রীরামকৃষ্ণ-বিরহে আজ ব্রহ্মানন্দের প্রাণে দারুণ অশান্তি। বৎসরের পর বৎসর চক্রনেমির মত আবর্ত্তিত হইতেছে; জপধ্যান সাধনভজনে মন ঊর্দ্ধস্তরে গিয়া তন্ময় বা সমাহিত হইয়াও আজ ব্রহ্মানন্দের প্রাণে শান্তি নাই! কেন এই অশান্তি? ইহা শ্রীরামকৃষ্ণ-বিরহজনিত অন্তরের অন্তস্তল হইতে বেদনার মূক অনুভূতি। কোন অবস্থাতেই মনে শান্তি নাই। শ্রীবৃন্দাবনধাম হইতে তাঁহার এই প্রবল অশান্তির একটা অস্পষ্ট আভাস তিনি ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ২৯শে মার্চ্চ তারিখের পত্রে শ্রীযুত বলরামবাবুকে জানাইয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছিলেন, "তাঁহার লীলা কেহ বুঝিতে পারে না। জ্ঞানী হউক আর অজ্ঞানী হউক, সৎকর্ম্ম করুক আর অসৎকর্ম্ম করুক, সুখদুঃখ কর্ম্মানুসারে সকলকেই ভোগ

করিতে হয়। এ জগতে জন্মগ্রহণ করিয়া সুখ এবং শান্তিতে অবস্থান করে—এমন লোক অতি বিরল। বিশেষ ভাগ্যবান তিনিই—যিনি সকল বাসনা হইতে মুক্ত হইয়াছেন, বোধ করি শান্তিরাজ্যে তাঁহারই অধিকার। এ জগতে সুখের ভাগ অতি অল্প—দুঃখের ভাগই অধিক এবং এই দুঃখময় জীবন লইয়া সকলেই দিন অতিবাহিত করিতেছে। জগদীশ্বর পরম দয়াময় হইয়া কেন তাঁহার জীবকে কষ্টভোগ করান, ইহার গূঢ়ভাব তিনিই জানেন, সামান্য জীবের জানিবার কোন উপায় নাই। জীবের এত কষ্ট কেবল "আমি" এবং "আমার" এই অজ্ঞানবশতঃ। যাহার অহংকার একেবারে পরিত্যাগ হইয়াছে, মন, বুদ্ধি, প্রাণ যিনি সেই জগদীশ্বরের পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়াছেন—আমার বলিতে কিছুই নাই, এমন ব্যক্তিই সৌভাগ্যবান এবং যথার্থ সুখী। জীবের নিজের কোন বিষয়ে করিবার ক্ষমতা কিছুমাত্র নাই, সর্ব্বদা তাঁহার নিকট প্রার্থনা ভিন্ন অন্য উপায় কিছু নাই। হে জগদীশ্বর, আমি কিছুই নই—এই চৈতন্য যেন থাকে এবং তুমি সত্য, এই বোধ যেন সর্ব্বদা থাকে। তাহা হইলে অজ্ঞান তাহাকে আক্রমণ করিতে পারে না। শ্রীশ্রীপরমহংসদেব বলিতেন, স্ত্রীপুত্রাদিতে যেরূপ লোকের আসক্তি এবং ভালবাসা, ভগবানের নিমিত্ত কটা লোকের সেরূপ ভালবাসা হয়? বোধকরি শতাংশের একাংশ জীব ভগবানকে ভালবাসিতে পারে না এবং কটা লোকই বা ভালবাসিতে চেষ্টা করে?

"বাহ্যজগৎ হইতে মন উৎপন্ন হইয়াছে এবং বাহ্যজগতে থাকিতে বড় ভালবাসে, ইহাই মনের স্বধর্ম্ম। এই মনকে সর্ব্বপ্রকারে বাহ্যবস্তু হইতে উঠাইয়া লইয়া সেই হরি-পাদপদ্মে স্থিতি করা—ইহা

কেবল ভগবানের কৃপা না হইলে কোনমতে হওয়ার সম্ভাবনা নাই।

"উপস্থিত আমার মনের অবস্থা বড় ভাল নহে। যত দিন যাই-তেছে ততই অজ্ঞান এবং অশান্তি মনকে জড়ীভূত করিতেছে। সাধন ও ভজন দ্বারা মনে শান্তি পাইব এরূপ আশা নাই। যেমন পক্ষীর পক্ষ না থাকিলে উড়া অসম্ভব, তদ্রূপ অনুরাগবিহীন সাধনভজনের চেষ্টা আমার পক্ষে বিফল হইতেছে। জানি না কতদিন আমাকে এরূপ অশান্তিতে এবং মনঃকষ্টে কালযাপন করিতে হইবে। শ্রীশ্রীজগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছি এবং আপনারা আশীর্ব্বাদ করুন যেন সত্বর দেহাদি ভাব হইতে মুক্ত হইতে পারি। এ জনমে আর কোন আশা নাই। এখন বাঁচিয়া থাকা কেবল বিড়ম্বনা মাত্র। আশীর্ব্বাদ করুন যেন গুরুপাদপদ্মে মিশিয়া যাই, আর আমার কোন বাসনা না থাকে।"

যিনি ভগবান লাভের জন্য সংসার ত্যাগ করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশে কঠোর সাধনভজন করিয়াছেন, যিনি দক্ষিণেশ্বর এবং অন্যান্য স্থানে ঈশ্বরপ্রসঙ্গে বা নামসঙ্কীর্ত্তনে কতবার বাহ্যসংজ্ঞা হারাইয়া ফেলিয়াছেন, যিনি নর্ম্মদার তীরে একাদিক্রমে ছয়দিন সমাহিত অবস্থায় ছিলেন—তাঁহার আজ কিসের অশান্তি? কিসের জ্বালা? কে বুঝিবে?

তাই মনে হয় ইহা সম্ভবতঃ শ্রীরামকৃষ্ণবিরহ-জনিত নিবিড় ব্যাথার অস্ফুট আভাস। কিছুতেই শান্তি নাই—জীবনে ভীষণ নৈরাশ্যজনিত দুঃখ,—যাহা চাওয়া যায় তাহা যেন পাওয়া যায় না। লীলাময় বিগ্রহকে লইয়া যে আনন্দ, যে প্রেমসম্ভোগ

ইনি করিয়াছেন, আধ্যাত্মিক রাজ্যের বিভিন্ন স্তরে যে সকল অপূর্ব্ব বিকাশ তাঁহাতে দেখিয়াছেন—তাঁহার অন্তর্দ্ধানে স্বীয় জীবনে ঐ সব অনুভূতি সম্যক্ পরিস্ফুট না হওয়ায় অশান্তির প্রবল আগুন যেন তাঁহার হৃদয় দগ্ধ করিতেছিল।

শ্রীবৃন্দাবনে গিয়া ব্রহ্মানন্দ কি যেন এক অপূর্ব্বভাবে তন্ময় হইয়া থাকিতেন! সুবোধানন্দ তাঁহাকে কোথাও কখন ভিক্ষা করিতে দেন নাই এবং এখানেও দিতেন না। তিনি নিজে ভিক্ষা করিয়া তাঁহাকে খাওয়াইতেন। ব্রহ্মানন্দ ব্রজধামে সর্ব্বদাই অন্তর্মুখী হইয়া রহিতেন বলিয়া বাহ্যবিষয়ে তাঁহার কোনই খেয়াল থাকিত না। তিনি যে ঘরে বাস করিতেন সেখানে অহর্নিশ শুধু নামজপ ও ধ্যানে নিমগ্ন এবং তন্ময়; কচিৎ কোন দিন সুবোধানন্দের সহিত বাক্যালাপ হইত। তাঁহার প্রতি ব্রহ্মানন্দের এইমাত্র নির্দ্দেশ ছিল যে, ভিক্ষালব্ধ তাঁহার আহার্য্য গৃহকোণে রাখিয়া তিনি চলিয়া যাইবেন, নিয়মিত সময়ে উঠিয়া তিনি আহার করিবেন। যেদিন সুবোধানন্দের ভিক্ষা হইতে ফিরিতে বিলম্ব হইত এবং নির্দ্দিষ্ট স্থানে ব্রহ্মানন্দ আহার্য্যদ্রব্য না দেখিতেন,—সেদিন পুনরায় সাধনস্থানে আসিয়া বসিতেন—তাঁহার আহার হইত না। সুবোধানন্দ পরদিন দেখিতেন যে আহার্য্যদ্রব্য তিনি যেমন রাখিয়া গিয়াছিলেন তেমনই আছে। ব্রহ্মানন্দের জন্য সুবোধানন্দ পাঁচরকম ব্যঞ্জন ভিক্ষা করিয়া আনিতেন কিন্তু তিনি দেখিতেন ব্রহ্মানন্দ একটী ব্যঞ্জন ব্যতীত অপরগুলি স্পর্শই করেন নাই। এই কঠোরতা তাঁহার ইচ্ছাকৃত বা চেষ্টা করিয়া নয়, তিনি সাধনায় এত তন্ময় ও বিভোর হইয়া থাকিতেন যে, ক্ষুধা-তৃষ্ণা প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহার অনেক সময়ে

বোধ থাকিত না। শরীরধারণোপযোগী সামান্য কিছু আহার করিলেই হইল। অনেক ত্যাগী পুরুষ বা সাধক স্থূল বিষয় ত্যাগ করিতে পারেন কিন্তু রুচিমত সুস্বাদু দ্রব্যের আস্বাদনের সূক্ষ্ম আকাঙ্ক্ষা সহজে যায় না। ভক্তিশাস্ত্রে ইহা জিহ্বালাম্পট্যের অন্যতম লক্ষণ। উত্তরকালে কথাপ্রসঙ্গে ব্রহ্মানন্দ বলিতেন, "স্থূল বিষয়ের ত্যাগ অপেক্ষা সূক্ষ্ম বাসনার ত্যাগ অত্যন্ত কঠিন। সূক্ষ্ম বাসনার মধ্যে জিহ্বালাম্পট্য আরও কঠিন। উচ্চ আধ্যাত্মিক অবস্থায় এই সূক্ষ্ম লালসার ত্যাগ হয়।" ব্রহ্মানন্দের এই অপূর্ব্ব কঠোরতা ও তন্ময়তার কথা সুবোধানন্দ কাহারও কাহারও নিকটে কথাপ্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন, "দিন নাই, রাত্রি নাই, মহারাজ (ব্রহ্মানন্দ) একাসনে বসিয়া তন্ময়ভাবে ডুবিয়া থাকিতেন। কথাবার্ত্তা প্রায় বলিতেন না।" শ্রীযুত বলরামবাবুকে ব্রহ্মানন্দ পত্রে লিখিয়াছিলেন, "যাহার অহঙ্কার একেবারে পরিত্যাগ হইয়াছে, মন বুদ্ধি প্রাণ যিনি সেই জগদীশ্বরের পাদপদ্মে সমর্পণ করিয়াছেন, আমার বলিতে কিছুই নাই—এমত ব্যক্তিই সৌভাগ্যবান।" ইহারই কি বাহ্য আকার এই ধ্যানতন্ময়তা? বাহ্যবস্তু হইতে মনকে সর্ব্বপ্রকারে আকর্ষণ করিয়া "হরিপাদপদ্মে স্থিতি" করিলে কি এই তন্ময়তা লাভ করিতে পারা যায়?

কোন কোন দিন ব্রহ্মানন্দ শ্রীবিগ্রহদর্শনে মন্দিরে যাইতেন। পরম ভক্তিভাজন শ্রীযুত বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী মহাশয় এই সময়ে শ্রীশ্রীগোপীনাথ মন্দিরের বাগানের মধ্যে বাস করিতেছিলেন। তিনি তখন তিলকমালা ধারণ করিয়া ভক্তি-অঙ্গের সাধনায় ব্রজবাসী বৈষ্ণবদের সঙ্গে সর্ব্বদা কীর্ত্তনাদি করিতেন। মন্দির-

দর্শনের সময় সুবোধানন্দের নিকট বৃন্দাবনে গোস্বামীজীর উপস্থিতির কথা শুনিয়া ব্রহ্মানন্দ তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। দক্ষিণেশ্বরে ও কাশীপুরে শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে উভয়েই ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত ছিলেন। অনেক দিন পরে তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইলে উভয়েই খুব আনন্দিত হইলেন। ইতিপূর্ব্বে সুবোধানন্দ আসিয়া ব্রহ্মানন্দের কঠোর সাধনভজনের কথা বিজয়কৃষ্ণকে জানাইয়াছিলেন। গোঁসাইজী কথাপ্রসঙ্গে ব্রহ্মানন্দকে বলিলেন, "পরমহংসদেব আপনাকে তো সব রকম সাধনভজন, অনুভূতি, দর্শনাদি করিয়ে দিয়েছেন, তবে আপনি এখন কেন আবার কঠোর সাধনা করছেন?" ব্রহ্মানন্দ মৃদুস্বরে তাঁহাকে বলিলেন, "তাঁর কৃপায় যে সব অনুভূতি বা দর্শন হয়েছে, এখন সেগুলি আয়ত্ত করবার চেষ্টা করছি মাত্র।" গোঁসাইজী বুঝিলেন যে ব্রহ্মানন্দ এখন প্রবল অনুরাগের বন্যায় প্লাবিত হইতেছেন—তাঁহাকে প্রতিনিবৃত্ত করিতে যাওয়া বৃথা।

এই সময়ে বৃন্দাবনে ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। অনেক মন্দিরে ঠাকুরসেবা রীতিমতভাবে চলিতে পারে নাই। জ্বর গায়েই বিগ্রহাদির সেবাকার্য্য চলিত। ব্রহ্মানন্দও এই সময়ে জ্বর রোগে আক্রান্ত হন। গোঁসাইজী সুবোধানন্দের নিকট শুনিতে পাইলেন যে ব্রহ্মানন্দের জ্বর হইয়াছে। ইহা শুনিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে দেখিতে গেলেন। ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলেন, ব্রহ্মানন্দের কোন মশারি নাই। সুবোধানন্দের নিকট তিনি জানিলেন, ব্রহ্মানন্দ সারারাত বসিয়া জপধ্যান করেন।

বৃন্দাবনের ভীষণ মশার উপদ্রবের মধ্যে ব্রহ্মানন্দের মশারি নাই জানিতে পারিয়া গোঁসাইজী তাড়াতাড়ি চলিয়া গেলেন এবং ঐ দিনই মশারি, পেরেক ও দড়ি প্রভৃতি লইয়া আসিয়া তিনি নিজেই মশারিটী অতি সুন্দরভাবে টান করিয়া খাটাইয়া দেন। পরে ব্রহ্মানন্দের নাড়ী দেখিয়া তিনি কাগজে ব্যবস্থা-পত্র লিখিয়া একটী ঔষধ সেবন করিতে তাঁহাকে বলেন। ব্রহ্মানন্দ উক্ত ঔষধ সেবন করিতে ইতস্ততঃ করাতে গোঁসাইজী তাঁহাকে বলেন, "আমার ব্যবস্থানুযায়ী ঔষধ সেবনে আপনার কোন ভয়ের কারণ নেই। আমি মেডিকেল কলেজে কিছুদিন পড়েছি—চিকিৎসাও করেছি। আমাদের সময় বাঙ্গালা বিভাগ ছিল। আমি আপনাকে জোর করে বলতে পারি, এই ঔষধেই আপনার উপকার হবে।" গোঁসাইজীর আগ্রহে ও যত্নে তিনি তাঁহার প্রদত্ত ঔষধ সেবন করিলেন। এই ঔষধেই তিনি শীঘ্র জ্বরমুক্ত হইলেন। তিনি বলরামবাবুকে ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ২৯শে মার্চ্চ তারিখের পত্রে লিখিয়া-ছিলেন, "গোঁসাইজী বড় ভাল নাই। তাঁহার শরীর কিছু অসুস্থাবস্থায় আছে, বোধ করি সত্বর তিনি স্বাস্থ্যলাভ করিবেন। আমার শরীর এখনও বড় দুর্ব্বল, স্নান সহ্য হয় না।" মাঝে মাঝে গোঁসাইজীর সহিত তাঁহার ভগবৎপ্রসঙ্গ হইত।

ব্রহ্মানন্দ উত্তরাখণ্ডে যাইবেন এই আশাতেই সুবোধানন্দ বিবেকানন্দের আদেশে তাঁহার সঙ্গী হইয়াছিলেন। তিনি বলরাম-বাবুর পত্রে জানিতে পারিলেন যে, একে একে তাঁহার গুরুভ্রাতারা

অনেকেই হরিদ্বারে চলিয়া গিয়াছেন। সুবোধানন্দও তথায় যাইবার জন্য ব্যগ্র হইলেন। তিনি দেখিলেন ব্রহ্মানন্দ অহর্নিশ এত তন্ময় হইয়া থাকেন, তাঁহার উত্তরাখণ্ডে যাওয়া হইবে কিনা সন্দেহ। একদিন সুবোধানন্দ তাঁহার নিকট হরিদ্বার গমনের প্রস্তাব উঠাইলেন; তিনি উত্তরে তাঁহাকে বলিলেন, "আমি হেঁটে এত পথ বোধ হয় যেতে পারব না, তাই এবার সেখানে যাবার সঙ্কল্প ত্যাগ করলুম। তোর যদি যাবার ইচ্ছে হয়ে থাকে তবে তুই যা। আমার জন্য তোকে ভাবতে হবে না। রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড ব্রজপরিক্রমা শেষ করে যাস।" সুবোধানন্দ তখন তরুণ যুবক। তিনি ব্রহ্মানন্দের আদেশ ও অভিপ্রায় জানিতে পারিয়া একদিন ব্রজ-মণ্ডলাদি পরিক্রমার উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড এবং ব্রজমণ্ডলের কতকাংশ পরিক্রমা করিয়া আর তিনি ফিরিয়া আসিলেন না, পদব্রজে উত্তরাখণ্ডের দিকে রওনা হইলেন।

ব্রহ্মানন্দ এখন ব্রজধামে একাকী বাস করিতে লাগিলেন। সুবোধানন্দ নাই, আর কে তাঁহাকে ভিক্ষা করিয়া আনিয়া খাওয়াইবে? ব্রহ্মানন্দ সেজন্য বিন্দুমাত্র অসুবিধা বোধ করিলেন না। যেদিন আহার করিবার খেয়াল হইত সেদিন তিনি জীবনধারণের জন্য কখনও মাধুকরী বা কখন কোন কুঞ্জে ভিক্ষা করিতেন। একাকী নিঃসঙ্গ হইয়া কঠোর তপস্যায় তিনি আত্মনিয়োগ করিতে লাগিলেন।

একদিন সহসা রাখাল দেখিলেন শ্রীযুত বলরামের জ্যোতির্ময় মূর্ত্তি। বলরাম যেন হাসিতে হাসিতে দিব্যলোকে চলিয়া

যাইতেছেন। ব্রহ্মানন্দ বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া ভাবিলেন, "এ কি? তবে কি বলরামবাবু মর্ত্যধাম ছাড়িয়া গেলেন?" ব্রহ্মানন্দের মন তাঁহার জন্য চিন্তাভারাক্রান্ত হইল। তিনি যে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রিয়তম অন্তরঙ্গ ভক্ত, রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের একান্ত হিতৈষী বন্ধু, তিনি যে তাঁহার পরমাত্মীয় গুরুভ্রাতা! তাঁহার মনে বলরামবাবুর সম্বন্ধে কত অতীত স্মৃতি জাগ্রত হইল! তিনি যে তাঁহাকে সহোদরাধিক ভালবাসিতেন, শ্রীরামকৃষ্ণকে লইয়াই তাঁহার সহিত যে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। এ তো মায়িক বন্ধন নয়, এ যে আধ্যাত্মিকতার পরম প্রেমসূত্র। ব্রহ্মানন্দ তাঁহার জন্য উদ্বিগ্ন হইলেন। পরদিন তিনি তারযোগে সংবাদ পাইলেন যে বলরামবাবু সত্য সত্যই পূর্ব্বদিন অর্থাৎ ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ১৩ই মে দেহত্যাগ করিয়াছেন।

ব্রহ্মানন্দ হৃদয়ে দারুণ আঘাত পাইলেন। এই বৃন্দাবনে তাঁহার কত স্মৃতি বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। তিনি অন্তরে অন্তরে অনুভব করিলেন, ইহাও মহামায়ার বন্ধন—সোনার শৃঙ্খল! মনের এই স্রোতকেও নিরুদ্ধ করিতে হইবে। ইহার কয়েক দিন পরে ব্রহ্মানন্দ সংবাদ পাইলেন যে ঠাকুরের অন্তরঙ্গ ভক্ত সুরেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় ২৫শে মে রাত্রিতে দেহত্যাগ করিয়াছেন। স্বামিজী ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে ৺কাশীর প্রমদাদাস মিত্র মহাশয়কে লিখিয়াছিলেন, সুরেশবাবু বলরামবাবু দুজনে চলে গেলেন। এখন জি, সি, (গিরিশচন্দ্রকে জি, সি, বলিয়া তিনি ডাকিতেন) মঠকে সাহায্য করছে। তিনি হিমালয়ের বিজন পার্ব্বত্য-প্রদেশে একাকী কঠোর সাধনায় সমাহিত হইয়া থাকিবার জন্য দৃঢ়সংকল্প

হইলেন। বৃন্দাবনে কয়েক মাস অবস্থান করিয়া ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বরের শেষ ভাগে ব্রহ্মানন্দ ব্রজভূমি ত্যাগ করিয়া হরিদ্বার অভিমুখে পদব্রজে যাত্রা করিলেন।

একাদশ পরিচ্ছেদ

প্রত্যাবর্ত্তন

পুণ্যসলিলাগঙ্গাবিধৌত হিমালয়ের সুপবিত্র পরম রমণীয় তপোভূমি হরিদ্বারে আসিয়া ব্রহ্মানন্দ আনন্দিত হইলেন। সম্মুখে পশ্চাতে আশেপাশে নিকটে ও দূরে অভ্রভেদী শৈলশ্রেণী, পাদপ-লতাগুল্ম-পরিবৃত বিজন অরণ্য এবং মাঝে মাঝে সর্ব্বত্যাগী সাধু-তপস্বীদের কুটীর তাঁহার মনে এক শান্ত গম্ভীর ভাব উদ্রেক করিয়া দিল। তিনি জনকোলাহল-বর্জ্জিত কনখলের এক নিভৃত স্থানে একটী পর্ণকুটীরে বাস করিয়া কঠোর সাধনায় নিরত হইলেন। কোন দিন তিনি ভিক্ষায় বাহির হইতেন আবার কোন কোন দিন সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্টভাবে ক্ষুধাতৃষ্ণা প্রভৃতি বাহ্যবিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়া ধ্যানে তন্ময় থাকিতেন। কঠোর সংযম ও একাগ্র ধ্যানে সমগ্র ইন্দ্রিয়দ্বার নিরোধপূর্ব্বক শান্ত সমাহিত চিত্তে তিনি সর্ব্বদা এক অতীন্দ্রিয় রাজ্যে বিচরণ করিতেন। দিনের পর দিন তিনি এইরূপ একাসনে গভীর তন্ময়তার মধ্যে নিমগ্ন হইয়া তথায় অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। উত্তরকালে তাঁহার এই তপস্যাপূত স্থানেই রামকৃষ্ণ মিশনের সুবৃহৎ সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

ব্রহ্মানন্দের গুরুভ্রাতারা অনেকেই তখন হৃষীকেশে তপস্যা ও সাধনভজনে নিরত ছিলেন। বিবেকানন্দ বরাহনগর মঠ হইতে অখণ্ডানন্দকে সঙ্গে লইয়া ভাগলপুর, বৈদ্যনাথ, গাজীপুর, কাশী, অযোধ্যা, নাইনীতাল হইয়া আগষ্টের প্রারম্ভে

আলমোড়াতে পৌঁছিলেন। তথায় বদরীনারায়ণ দর্শন করিয়া সারদানন্দ অবস্থান করিতেছিলেন। তপস্যার অভিপ্রায়ে স্বামিজী গাড়োয়াল যাত্রা করিলেন। তথা হইতে শ্রীনগর গিয়া তাঁহারা প্রায় দেড় মাস থাকিলেন। পরে সকলে পদব্রজে টিহিরিতে চলিয়া গেলেন। তাঁহারা টিহিরিতে প্রায় ১৫।২০ দিন বাস করিয়া সাধন-ভজন করিতে লাগিলেন। এইখানে অখণ্ডানন্দ অসুস্থ হওয়ায় স্বামিজী-সঙ্কল্পিত ভ্রমণ ত্যাগ করিয়া তাঁহারা মুসৌরী গমন করিলেন। তথায় তাজপুরে তুরীয়ানন্দের সহিত সাক্ষাৎ হইল। তার পর দেরাদুনে অখণ্ডানন্দকে চিকিৎসাধীনে রাখিয়া তাঁহারা হৃষীকেশে গিয়া কঠোর তপশ্চর্য্যা আরম্ভ করিলেন। বিবেকানন্দ তথায় গুরুতর পীড়িত হইলেন এবং একদিন বাহ্যসংজ্ঞা হারাইয়া মৃতবৎ শয্যায় পড়িয়া ছিলেন। গুরুভ্রাতারা চিকিৎসক অভাবে তাঁহার জন্য মহা চিন্তিত ও ব্যস্ত হইলেন। এমন সময় তাঁহাদের ঝুপড়ীর দ্বারদেশে একটী সাধু আসিয়া মধু দিয়া পিপ্পলীচূর্ণ তাঁহাকে সেবন করাইতে বলিলেন। উক্ত ঔষধ সেবনের কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার চেতনার সঞ্চার হইল। গুরুভ্রাতারা লক্ষ্য করিলেন তাঁহার মুখমণ্ডল যেন দিব্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত। কয়েক দিন পরে তাঁহার শরীর সুস্থ হইলে তাঁহারা হকিমী চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে দিল্লী লইয়া যাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিলেন। তৎকালে তাঁহারা শুনিতে পাইলেন যে ব্রহ্মানন্দ কনখলে তপস্যায় নিরত রহিয়াছেন। তাঁহাকে দেখিবার জন্য বিবেকানন্দের প্রবল আকাঙ্ক্ষা হইল। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি গুরুভ্রাতাদিগকে সঙ্গে লইয়া কনখলে ব্রহ্মানন্দের নিকট

গমন করিলেন। অনেক দিন পরে পরস্পরের সাক্ষাৎ হওয়ায় সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। বিবেকানন্দ তাঁহাকে বলিলেন, "চল, এখানে আর নয়, আমাদের সঙ্গে তোমাকে যেতে হবে।" বোধ হয় নিজের রুগ্ন অবস্থা দেখিয়া তাঁহার আশঙ্কা হইয়াছিল, পাছে কঠোর তপস্যা করিতে করিতে ব্রহ্মানন্দ হঠাৎ এই জনহীন স্থানে তাঁহার মত রোগাক্রান্ত হন। এখানে তাঁহাকে দেখিবার কেহ নাই। ব্রহ্মানন্দ নিরুত্তর হইয়া রহিলেন। বিবেকানন্দের এই প্রীতির আহ্বান তিনি আর উপেক্ষা করিতে পারিলেন না; বিশেষতঃ তাঁহাকে রুগ্ন ও ভগ্নস্বাস্থ্য দেখিয়া ব্রহ্মানন্দও মনে মনে ক্লেশ অনুভব করিতেছিলেন। তিনি শুনিতে পাইলেন, তাঁহার চিকিৎসার জন্যই তাঁহারা সকলে মিলিয়া দিল্লী যাইতেছেন, সুতরাং উদ্বিগ্নচিত্তে তিনিও তাঁহাদের সঙ্গী হইলেন।

অখণ্ডানন্দ স্বাস্থ্যলাভের জন্য মীরাটে আছেন শুনিয়া ব্রহ্মানন্দ তাঁহাকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিলেন; কেন না অনেক দিন তাঁহার সহিত দেখাসাক্ষাৎ নাই। ব্রহ্মানন্দের আগ্রহ দেখিয়া তাঁহারা সকলে মিলিয়া সাহারাণপুর হইতে মীরাটে চলিয়া গেলেন। স্বামিজীর স্বাস্থ্যের জন্য তথায় তাঁহারা মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত অবস্থান করিলেন। সেখানে ধ্যান ভজন শাস্ত্রপাঠ নিয়মিতভাবে চলিতে লাগিল। এইরূপে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে বিবেকানন্দ সুস্থ বোধ করিয়া একাকী দিল্লী চলিয়া গেলেন। গুরুভ্রাতারাও তাঁহার জন্য উদ্বিগ্ন হইয়া দিন দশ পরে তাঁহার নিকট তথায় গমন করিলেন। বিবেকানন্দ তাঁহাদিগকে দেখিয়া প্রীত হইলেন। হঠাৎ একদিন তিনি তাঁহাদিগকে বলিলেন, "তোমরা আমার

সঙ্গ ত্যাগ কর। আমি ভিতর থেকে ইঙ্গিত পাচ্ছি, আমাকে একা থাকতে হবে। তোমরা যাও, যেমন ধ্যান-ভজন তপস্যা করছ—তেমনি কর। আমি এবার একলা বেরুব। কোথায় থাকব, কাউকে সন্ধান দেব না। প্রভুর ইচ্ছা হলে আবার সকলে মিলিত হব।" বিবেকানন্দ একাকী চলিয়া গেলেন।

ইহার প্রায় আট দিন পরে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ব্রহ্মানন্দ তুরীয়ানন্দকে (হরি মহারাজ) বলিলেন, "জ্বালামুখী দেখতে ইচ্ছে হয়েছে। যদি আপনি যান তো যাই।" তুরীয়ানন্দ সানন্দে স্বীকৃত হইলেন। তাঁহারা উভয়ে জ্বালামুখী যাত্রা করিলেন। ব্রহ্মানন্দের মনে পড়িল যে শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহাকে তুরীয়ানন্দের পবিত্র সঙ্গ করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। তীর্থভ্রমণে তাহা পূর্ণরূপে পালিত হইয়াছিল। জীবনে তাঁহারা একত্রে প্রায় ছয় বৎসরকাল বিভিন্ন সময়ে বহু স্থানে সাধনভজন ও তীর্থপর্য্যটন করিয়াছিলেন। তুরীয়ানন্দ জ্ঞান-ভক্তির সমুজ্জ্বল মূর্ত্তি ছিলেন। শাস্ত্রে ইঁহার গভীর জ্ঞান ও অভিনিবেশ ছিল। একাধারে কঠোর তপস্যা, গভীর ধ্যানতন্ময়তা এবং তীব্র বৈরাগ্য তাঁহার সমগ্র জীবনকে মহিমান্বিত করিয়াছিল। ব্রহ্মানন্দ তাঁহার সঙ্গলাভে বড়ই আনন্দ পাইতেন।

পাহাড়ের পাদতলে গোপীনাথপুরে জ্বালামুখীর মন্দির অবস্থিত। জ্বালামুখীতে তাঁহারা কিছুকাল বাস করেন। তাঁহাদের কঠোর বৈরাগ্য ও ধ্যাননিষ্ঠা দেখিয়া মন্দিরের প্রধান পুরোহিত ও স্থানীয় কতিপয় বিশিষ্ট লোক মুগ্ধ হইয়াছিলেন। জ্বালামুখী হইতে তাঁহারা কাংড়া বৈজনাথে এবং তথা হইতে

পাঠানকোট, গুজরাণওয়ালা, লাহোর, মণ্টগুমরী, মূলতান ও সক্করের নিকট সাধুবেলায় যান। সাধুবেলার মঠ একটি দ্বীপের উপর অবস্থিত। তথাকার মোহান্ত তাঁহাদের কঠোর বৈরাগ্য ও একান্তভাবে সাধনভজনে দৃঢ় অনুরাগ দেখিয়া তাঁহাদের বিশেষ যত্ন করেন এবং কিছুদিন তথায় থাকিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। তীর্থভ্রমণকালে তাঁহারা প্রত্যেক তীর্থে দেব-মন্দিরে কয়েকদিন করিয়া অবস্থান করিতেন। ব্রহ্মানন্দ যে তীর্থে যাইতেন এবং মন্দিরে যে দেবদেবীর বিগ্রহ দর্শন করিতেন সেইভাবে তন্ময় হইয়া যাইতেন। প্রত্যেক তীর্থেই একাহারী হইয়া নিষ্ঠার সহিত অহর্নিশ জপধ্যান ও সাধনভজনে নিমগ্ন থাকিতেন। সাধুবেলা হইতে তাঁহারা করাচীতে চলিয়া যান এবং তথা হইতে জাহাজে বোম্বাই গমন করিলেন।

বোম্বাই সহরে প্যাখেল রোডে (Packell Road) তাঁহারা শ্রীরামকৃষ্ণের পরম অনুরাগী ভক্ত শ্রীযুত কালীপদ ঘোষের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যান। তথায় অপ্রত্যাশিতভাবে বিবেকানন্দের সহিত তাঁহারা মিলিত হন। চিকাগো ধর্ম্ম-মহাসভায় গমন করিবার উদ্দেশ্যে বিবেকানন্দ বোম্বাই আসিয়াছিলেন। গুরুভ্রাতাদের নিকট তখন তাঁহার অজ্ঞাতভ্রমণ চলিতেছিল। বহুদিন পরে ব্রহ্মানন্দকে দেখিয়া তিনি যারপরনাই প্রীতিলাভ করিলেন।

এদিকে ক্ষেত্রীর জনৈক রাজকর্ম্মচারী বিবেকানন্দকে ক্ষেত্রীতে লইয়া যাইবার জন্য মান্দ্রাজ হইতে তাঁহার সঙ্গে ছিলেন। ক্ষেত্রীর রাজাসাহেবের একান্ত অনুরোধে নবজাত রাজকুমারকে আশীর্ব্বাদ করিতে তিনি বোম্বাই হইতে ক্ষেত্রী অভিমুখে রওনা হইলেন।

ব্রহ্মানন্দ ও তুরীয়ানন্দ আবুরোড ষ্টেশন পর্য্যন্ত তাঁহার সঙ্গে গমন করেন। তাঁহারা উভয়ে আবুরোড ষ্টেশনে নামিয়া পড়িলেন। কয়েক দিন পরে ফিরিবার সময় বিবেকানন্দের সহিত উভয়ের পুনরায় আবুরোড ষ্টেশনে সাক্ষাৎ হইল। কারণ তাঁহারা উভয়ে নির্দ্দিষ্ট দিনে তাঁহার সহিত দেখা করিবার জন্য তথায় প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি উভয়কে দেখিয়া উৎফুল্ললোচনে গাড়ী হইতে নামিলেন। তিনি তুরীয়ানন্দকে বলিলেন, "রাজাকে ছেড়ে দাও, সে একলা বেড়াক। তুমি মঠে ফিরে যাও, সেখানে অনেক কাজ আছে।" ট্রেন ছাড়িতেছে দেখিয়া তাঁহারা পরস্পরের নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন।

আবুপাহাড়ে ব্রহ্মানন্দ সাধনভজনে এত তন্ময় হইয়া থাকিতেন যে শরীরের দিকে তাঁহার আদৌ দৃষ্টি থাকিত না। বিবেকানন্দের আদেশ থাকা সত্ত্বেও তুরীয়ানন্দ এই অবস্থায় ব্রহ্মানন্দকে একাকী ফেলিয়া যাইতে পারিলেন না। তুরীয়ানন্দ ভিক্ষা করিয়া ব্রহ্মানন্দকে খাওয়াইতেন এবং সর্ব্বদা তাঁহার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন। তিনি নিজেও কঠোর সাধনভজনে নিরত থাকিতেন। আবুপাহাড়ে যোধপুরের দেওয়ান শ্রীযুত শরৎচন্দ্র চৌধুরী তাঁহাদের নিকট যাইতেন এবং বিশেষ যত্ন লইতেন। কিছুদিন পরে তাঁহারা পাহাড় হইতে নামিয়া আবুরোডে চলিয়া আসেন। তাঁহারা সংবাদ পাইলেন যে অখণ্ডানন্দ বোম্বাই সহরে আসিয়াছেন। ব্রহ্মানন্দ তাঁহাকে তাঁহাদের নিকট আসিবার জন্য পত্র লিখেন। অখণ্ডানন্দ এতদিন পর্য্যন্ত বিবেকানন্দের সন্ধানে তাঁহার অনুসরণ করিতেছিলেন। তিনি ভাবনগরে আসিয়া

শুনিলেন যে বিবেকানন্দ মার্কিণ যাত্রা করিয়াছেন। এইরূপ আশাভগ্ন হওয়াতে তিনি মনে মনে অতিশয় ক্ষুণ্ণ এবং অবসন্ন বোধ করিতে লাগিলেন। তথায় কিছুদিন থাকিবার পর নড়িয়াড হইয়া বোম্বাই সহরে তিনি আসিলেন। সেখানে একমাস অবস্থান করিয়া পুণায় চলিয়া যান। পরে পুনরায় বোম্বাই সহরে তিনি ফিরিয়া আসিলেন। এইরূপ বিষণ্ণ ও অবসন্ন অবস্থায় "রাজার" সাদর আহ্বান পাইয়া তিনি অবিলম্বে তাঁহার নিকট আবুরোডে চলিয়া গেলেন। অনেক দিন পরে গুরুভ্রাতাদের পরস্পরের সাক্ষাৎ হওয়াতে তাঁহাদের অন্তরে আনন্দের প্রবাহ বহিয়া গেল। কথাপ্রসঙ্গে স্বামিজীর মার্কিণ যাত্রার কথা উত্থাপিত হইলে ব্রহ্মানন্দ অখণ্ডানন্দকে বলিলেন, "স্বামিজী আমেরিকায় কেন গেছেন জান?" তিনি বলিলেন, "না"। ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, "স্বামিজী যখন পশ্চিমঘাট পর্ব্বত ও মহারাষ্ট্র প্রদেশ ঘুরে বেড়ান তখন তিনি সাধারণ লোকের দুঃখদারিদ্র্য আর বড়লোকের অত্যাচার দেখে সর্ব্বদা কাঁদতেন। আমাদের বলেছেন, "দেখ ভাই, এদেশে দুঃখ-দারিদ্র্য যেরকম, তাতে এখন ধর্ম্মপ্রচারের সময় নয়। যদি কখনও এদেশের দুঃখদারিদ্র্য দূর করতে পারি তখন ধর্ম্মকথা বলব। সেইজন্য কুবেরের দেশে যাচ্ছি, দেখি যদি কিছু উপায় করতে পারি।" স্বামিজীর মহান উদারতার প্রসঙ্গ তুলিয়া ব্রহ্মানন্দ অখণ্ডানন্দের মনের অবসাদ দূর করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু বহুস্থানে পর্য্যটনহেতু ও নানা কঠোরতায় অখণ্ডানন্দকে ভগ্নস্বাস্থ্য দেখিয়া তিনি দুঃখিত ও

চিন্তিত হইলেন। তিন চারিদিন তথায় থাকিয়া তাঁহারা তিনজনেই আজমীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। আজমীরে ব্রহ্মার মন্দির ও প্রসিদ্ধ সুফী ফকির চিস্তিসাহেবের দরগা দর্শন করিয়া তাঁহারা জয়পুরে চলিয়া আসিলেন; তথায় গোবীনজীর বিগ্রহ এবং অম্বরের মন্দিরে বঙ্গের প্রতাপাদিত্য-প্রতিষ্ঠিত যশোরেশ্বরীর দেবীমূর্ত্তি প্রভৃতি দর্শন করিলেন। জয়পুরের সর্দ্দার হরি সিং শুনিতে পাইলেন যে বিবেকানন্দের কয়েকজন গুরুভ্রাতা আজমীরে আছেন। তিনি ইতিপূর্ব্বে তাঁহার মুখে গুরুভ্রাতাদের পরিচয় শুনিয়াছিলেন। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া তাঁহাদিগকে নিজ গৃহে লইয়া আসিলেন। তথায় তাঁহারা মাসাবধি ছিলেন। ব্রহ্মানন্দ তখন মনে মনে শ্রীবৃন্দাবনে যাইবার জন্য ব্যাকুল। ধনী গৃহী সাদর অভ্যর্থনা ও আন্তরিক ভক্তি দেখাইলেও ব্রহ্মানন্দের সাধনানুরাগী মন তথায় তিষ্ঠিতে পারিতেছিল না। অখণ্ডানন্দের স্বাস্থ্যের উন্নতির জন্যই তিনি এতদিন তথায় ছিলেন।

অবশেষে একদিন ব্রহ্মানন্দ অখণ্ডানন্দকে বলিলেন, "তোমার উদরাময় ও সর্দ্দিকাসি দুই ব্যাধিরই আরোগ্যের পক্ষে রাজপুতানা খুব উত্তম স্থান। খেতড়ির রাজা স্বামিজীর শিষ্য, আমার পরম ভক্ত। আমি বলে দিচ্ছি, তুমি সেইখানে যাও—তোমাকে পরম যত্নে রাখবে।" অখণ্ডানন্দ তদনুযায়ী ক্ষেত্রী চলিয়া গেলেন। অনন্তর ব্রহ্মানন্দ ও তুরীয়ানন্দ উভয়ে ত্বরায় শ্রীবৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনে পৌঁছিয়া তুরীয়ানন্দ ভাবে পূর্ণ হইয়া ব্রহ্মানন্দকে

বলিলেন, "আজ ভিক্ষা করতে বেরুব না, দেখি রাধারাণী উপবাসী রাখেন কিনা।" দুইজনেই ধ্যানে তন্ময় হইয়া থাকিলেন। দিনরাত্রি এইভাবে কাটিয়া গেল, কাহারও ক্ষুধাতৃষ্ণার জন্য কোন চাঞ্চল্য নাই। পরদিন বেলা নয়টার সময় জনৈক ভক্ত শেঠ অযাচিতভাবে তাঁহাদের জন্য প্রচুর খাদ্যসামগ্রী লইয়া আসিলেন। "জয় রাধারাণীর জয়" বলিয়া সানন্দে তাঁহারা আহার করিলেন। কিছুদিন শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিয়া তাঁহারা ব্রজমণ্ডল পরিক্রমায় বহির্গত হইলেন। উভয়ে পদব্রজে রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড নন্দগ্রাম বর্ষাণা প্রভৃতি স্থান দর্শন করিয়া অবশেষে কুসুমসরোবরে আসিলেন। তথায় তাঁহারা তপস্যার জন্য কিছুদিন বাস করিতে লাগিলেন। কুসুমসরোবরে শ্যামদাস বাবাজী নামক জনৈক বৈষ্ণব সাধুর উদারতায় ও যত্নে তাঁহারা মুগ্ধ হইয়াছিলেন। শ্রীবৃন্দাবনে তুরীয়ানন্দ স্বয়ং ভিক্ষা করিয়া ব্রহ্মানন্দকে খাওয়াইতেন। তাঁহাকে তিনি কখনও ভিক্ষা করিতে দিতেন না। একদিন কুসুমসরোবরে তিনি ভিক্ষায় কয়েকখানা শুকনো রুটী পাইয়াছিলেন—অপর কিছু ব্যঞ্জন বা গুড় কিম্বা চিনি পাওয়া যায় নাই। একটী কূপের ধারে দুইজনে জলে ভিজাইয়া সেই রুটী খাইতেছিলেন। খাইতে খাইতে তুরীয়ানন্দ বলিলেন, "মহারাজ! আপনাকে ঠাকুর কত আদর যত্ন করতেন। ক্ষীর, সর, ননী খাওয়াতেন আর আজ আপনাকে আমি শুকনো রুটী খাওয়াচ্ছি"—ইহা বলিতে বলিতে ভাবাবেগে তিনি অশ্রুধারায় প্লাবিত হইলেন। কিন্তু ব্রহ্মানন্দের এই সব বিষয়ে কোন দৃষ্টি ছিল না এবং কোন বাহ্য বিষয়ে ক্লেশ-

বোধ করিতেন না। সর্ব্বদা তিনি তন্ময়ভাবে অতীন্দ্রিয় ভাবরাজ্যে বিচরণ করিতেন। যাহা পান তাহাই তিনি উদারভাবে আহার করেন। কুসুমসরোবর তপস্যা ও সাধনার অনুকূল স্থান—ইহারই সন্নিকটে রাধাকুণ্ড ও শ্যামকুণ্ড। ব্রজবালকেরা বাঙ্গালী তীর্থ-যাত্রীদের নিকট কিছু ভিক্ষা পাইবার আশায় বলিয়া থাকে, "শ্যামকুণ্ড রাধাকুণ্ড গিরিগোবর্দ্ধন। মধুর মধুর বংশী বাজে এ্যায়াসা বৃন্দাবন।" ভক্তি-পিপাসু বৈষ্ণব ভক্তেরা ইহা শুনিয়াই আনন্দ করিয়া থাকেন। ব্রজধামে এই প্রেমভক্তির উচ্ছ্বাস যেন গগনে পবনে প্রতিনিয়ত মুখরিত হইয়া থাকে। ব্রহ্মানন্দ ও তুরীয়ানন্দ অহরহ এই অপার্থিব ভাবে তন্ময় হইয়া থাকিতেন। শ্রীবৃন্দাবনে ফিরিয়া আসিবার কয়েকমাস পরে মঠে যাইবার জন্য তুরীয়ানন্দের নিকট ঘন ঘন তাগিদ আসিতে লাগিল। মঠের পত্রেই তুরীয়ানন্দ জ্ঞাত হইলেন যে, মার্কিণে চিকাগো ধর্ম্ম-মহাসভায় স্বামী বিবেকানন্দ প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সমবেত বুধ-মণ্ডলীর সম্মুখে জলদমন্দ্রে হিন্দুধর্ম্মের জয়ধ্বনি তুলিয়াছেন, তাঁহার অপূর্ব্ব ব্যাখ্যায় দিকে দিকে একটা সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। নগ্ন কৌপীনধারী গৈরিকবসনপরিহিত গৈরিকউষ্ণীষধারী সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের নাম জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার অপূর্ব্ব বাগ্মিতা, অদ্ভুত প্রাঞ্জল ভাবপূর্ণ শব্দলালিত্য, তাঁহার তেজোময় আকৃতি, তাঁহার প্রতিভা-দীপ্ত আকর্ণ-বিস্তৃত নয়ন তথায় সকলকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়াছে। পাশ্চাত্য জগতে কতিপয় নরনারী তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া আধ্যাত্মিকভাবে জীবনগঠনে প্রয়াসী হইয়াছে। ভারতেও তাহার

প্রবল তরঙ্গ আসিয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের জয়ধ্বনিতে দশদিক পরিপূরিত হইয়াছে। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসের প্রারম্ভে বরাহনগর হইতে আলমবাজারে একটী ভাড়াটিয়া বাড়ীতে মঠ এখন স্থানান্তরিত এবং তথায় নানাদিক হইতে ভক্তসমাগম হইতেছে। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মমহোৎসব সাধারণভাবে যোগানন্দের উদ্যমে ও চেষ্টায় দক্ষিণেশ্বরে মহাসমারোহে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মঠের পত্রাদিতে এই সকল সংবাদ জ্ঞাত হইয়া তুরীয়ানন্দ ব্রহ্মানন্দকে জানাইলেন। ইহা শুনিয়া ব্রহ্মানন্দ আনন্দিত হইলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব্ব লীলামাহাত্ম্য স্মরণ করিতে লাগিলেন। মঠে যাইবার জন্য তুরীয়ানন্দের নিকট পুনঃ পুনঃ তাগিদ আসায় বিবেকানন্দের আদেশ তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইল। কতদিন ইহা উপেক্ষা করিয়া এখানে তিনি থাকিতে পারিবেন? অথচ ব্রহ্মানন্দকে একাকী ফেলিয়াই বা কি করিয়া চলিয়া যাইবেন? ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে একদিন ব্রহ্মানন্দকে সবিস্তার সমুদায় কথা তিনি জ্ঞাপন করিলেন এবং মঠে যাইবার জন্য অনুমতি চাহিলেন। তিনি সানন্দে ইহাতে সম্মতি জানাইয়া বলিলেন, "আমার জন্য কোন চিন্তা করবেন না। আপনার সেখানে অবিলম্বে যাওয়া দরকার। আপনি চলে যান—সেখানে ঠাকুরের কাজে আপনার ডাক পড়েছে!" তাঁহারা জানেন রণে, বনে, দুর্গমে ও সঙ্কটে একমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণই তাঁহাদের ভরসা। তাঁহার নাম স্মরণ করিয়াই দুইজনে পরস্পর বিদায় গ্রহণ করিলেন। ইহার পর প্রায় বৎসরাবধি ব্রহ্মানন্দ ব্রজধামে বাস করিয়াছিলেন।

শ্রীবৃন্দাবনধামে ব্রহ্মানন্দ এখন একাকী কঠোর সাধনভজনে

নিরত হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি, মাসের পর মাস কোথা দিয়া চলিয়া যাইত, তাহা তিনি অনেক সময়ে জানিতে পারিতেন না। একাসনে গভীর ধ্যানে তিনি তন্ময় হইয়া থাকিতেন। এই সময় ব্রহ্মানন্দ অজগর-বৃত্তি অবলম্বন করিয়াছিলেন। কোন দিন তাঁহার আহার জুটিত, আবার কোন দিন তাহাও দুর্ঘট হইত। একজন ব্রজবাসী ভক্ত শেঠ তাঁহাকে প্রায় প্রত্যহ আহার্য্য দিয়া যাইত। তিনি তৎকালে কাহারও নিকট কোন বিষয়ে যাচ্ঞা করিতেন না। তিনি মৌনভাবেই একাকী বসিয়া থাকিতেন। একদিন কোন শেঠ তাঁহাকে একখানি কম্বল দিয়া চলিয়া গেল; আবার কিছুক্ষণ পরে অপর একজন আসিয়া তাঁহাকে কিছু না বলিয়াই সেই কম্বলখানি লইয়া চলিয়া গেল! ব্রহ্মানন্দ নীরবে সব দেখিতেছিলেন। ইহাও মহামায়ার অদ্ভুত লীলা জানিয়া তিনি মনে মনে হাসিলেন।

একদিন রাসযাত্রা উপলক্ষে ব্রহ্মানন্দ লালাবাবুর কুঞ্জে গিয়া দেখিলেন যে সুসজ্জিত রাসমঞ্চের সম্মুখে ভজনকীর্ত্তন ও নৃত্য চলিতেছে। বহু নরনারী ভক্তিভাবে প্রণোদিত হইয়া তথায় বসিয়া আছেন। মঞ্চের সম্মুখে আসীন জনৈক বৃদ্ধ বাবাজী তাঁহাকে দূরে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া হস্তদ্বারা ইঙ্গিত করিয়া তাঁহাকে নিকটে আহ্বান করিলেন এবং সযত্নে তাঁহার পার্শ্বে তাঁহাকে বসাইলেন। বাবাজী নৃত্য ও ভজনাদির মধ্যেও জপে একাগ্রভাবে রত ছিলেন। ব্রহ্মানন্দ স্থিরভাবে রাসমঞ্চে দেববিগ্রহ দর্শন ও নৃত্যসহ ভজনাদি শ্রবণ করিতে করিতে তন্ময়ভাবে নিমগ্ন হইতেছিলেন, এমন সময়ে বাবাজী ঝোলা হইতে মালাসমেত হাত বাহির করিয়া মালার

মেরুটী ব্রহ্মানন্দের ললাটে স্পর্শ করাইলেন। স্পর্শের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ অপূর্ব্ব পুলকে রোমাঞ্চিত হইল। এইরূপভাবে জপান্তে প্রতিবার বাবাজী তাঁহাকে মেরু স্পর্শ করাইতে লাগিলেন এবং প্রত্যেক স্পর্শই তাঁহার সর্ব্বশরীরে পুলকে রোমাঞ্চ এবং অন্তরে ভাবের তন্ময়তা আনিয়া দিতে লাগিল। ঈদৃশ কত অতীন্দ্রিয় দর্শন ও অনুভূতি তৎকালে তাঁহার হইত কে তাহা বলিবে?

এইরূপ কঠোর সাধনভজন ও তন্ময়ভাবে থাকিতে থাকিতে একদিন তাঁহার অন্তরলোক সহসা দিব্যালোকে সমুদ্ভাসিত হইয়া আনন্দরসে পরিপ্লাবিত হইয়া উঠিল। মনের যে অশান্তি, যে অভাব, যে দুঃখ-নৈরাশ্য তাঁহার হৃদয়কে অধিকার করিয়াছিল তাহা যেন কোথায় অন্তর্হিত হইল। গভীর প্রশান্তি তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে প্রকাশ পাইল এবং আনন্দের নির্ঝর যেন নিরবচ্ছিন্ন ধারায় চারিদিকে প্রবাহিত হইতে লাগিল। সমগ্র বিশ্ব এক অতীন্দ্রিয় ভাবস্পন্দনে স্পন্দিত হইল। কে বলিবে ইহা কি?

ব্রহ্মানন্দ ব্রজমণ্ডলে দিব্য বিদেহভাবে বিভোর হইয়া থাকিতেন। অহর্নিশ নাম জপ করিতে করিতে কখন ধ্যানে তন্ময় হইয়া যাইতেন, কখন তাঁহার অশ্রু রোমাঞ্চ পুলকাদির সঞ্চার হইত, আবার কখন দিব্যভাবে পরমানন্দে আত্মহারা হইয়া বাহ্যসংজ্ঞা সম্পূর্ণ হারাইয়া ফেলিতেন। এইরূপ ভাবে কয়েকদিন অতীত হইল। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে অগ্রহায়ণ মাসে একদিন তিনি সহসা ব্রজধাম ত্যাগ করিয়া কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ইহাই কি তাঁহার প্রতি শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দ্দেশ, ইঙ্গিত বা আদেশ? ঠাকুরের

গতিমুখর লীলাচক্রে তাঁহার আদেশে তাঁহারই শক্তি-মূর্ত্তি বিবেকানন্দ যে মহাকার্য্য প্রবর্ত্তন করিয়াছেন সেই লীলায় সহায়তা করিবার জন্যই কি তিনি কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন ?

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

সঙ্ঘনায়ক

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘে বিবেকানন্দ ও ব্রহ্মানন্দকে যথাক্রমে 'স্বামিজী' ও 'মহারাজ' নামে অভিহিত করা হয়। অতঃপর তাঁহাদিগকে সেই নামেই উল্লেখ করা হইবে। গুরুভ্রাতারা প্রায়ই মহারাজকে 'রাজা' বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

শ্রীবৃন্দাবন হইতে মহারাজ আলমবাজার মঠে প্রত্যাগমন করিলে গুরুভ্রাতাদের মধ্যে একটা মহা আনন্দের সাড়া পড়িল। বহুদিন পরে তাঁহাদিগকে দেখিয়া মহারাজও অত্যন্ত উৎফুল্ল ও আনন্দিত হইলেন। রাজার শান্ত সুসমাহিত তন্ময় দিব্য আনন্দঘন মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহারা সকলে বিমুগ্ধ হইয়া গেলেন। তাঁহার আগমনে সমগ্র মঠ যেন সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দ্দেশমতই স্বামিজী ইতিপূর্ব্বে মঠের ভার বা দায়িত্ব মহারাজের উপর অর্পণ করিয়াছিলেন। তিনি সকলের নিকট তাঁহাকেই সঙ্ঘনায়ক বলিয়া উল্লেখ করিতেন। এমন কি মার্কিণ যাত্রার অব্যবহিত পূর্ব্বে খেতড়ী হইতে তিনি জুনাগড় রাজ্যের দেওয়ান শ্রীযুক্ত হরিদাস বিহারীদাস দেশাইকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতে সুস্পষ্টভাবে লিখিয়াছিলেন, "As to the other two Swamis, they were my Gurubhais who went to you last at

Junagad, of them one is our leader. I met them after three years and we came together as far as Abu and I left them. If you wish I can take them on my way to Bombay to Nadiad." অর্থাৎ অপর দুইজন স্বামিজী যাঁহারা গতবারে জুনাগড়ে আপনার নিকট গিয়াছিলেন, তাঁহারা আমার গুরুভাই এবং তন্মধ্যে একজন আমাদের নেতা। তিন বৎসর পর তাঁহাদের সহিত আমার সাক্ষাৎ হইল এবং আমরা একসঙ্গে আবু পর্য্যন্ত আসিয়াছিলাম। আপনার যদি ইচ্ছা হয় তবে আমার বোম্বে ও নডিয়াডের পথে তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া যাইতে পারি। এই দুইজনের নাম স্বামী তুরীয়ানন্দ এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দ। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে স্বামিজীর আমেরিকা যাত্রার কিছুদিন পরেই মহারাজ শ্রীবৃন্দাবনে গমন করিয়া তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে মহারাজ বৃন্দাবন হইতে আলমবাজার মঠে ফিরিয়া আসিয়াছেন শুনিয়া স্বামিজী অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। মঠ ও সঙ্ঘের সুপরিচালনা সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন। উক্ত সময়ে মঠে কোন গুরু-ভ্রাতাকে লিখিয়াছিলেন—"রাখালকে ও হরিকে আমার আলিঙ্গন প্রণাম জানাইবে। তাঁহাদের বিশেষ যত্ন করিবে। তোমরা রাখালকে দিন দুই জবরদস্ত ব্রত করিয়া দিয়াছ নাকি?......... রাখাল ঠাকুরের ভালবাসার জিনিষ একথা ভুলো না।"

মহারাজ কলিকাতায় আসিয়া দেখিতে পাইলেন যে শ্রীরাম-কৃষ্ণের প্রচার চারিদিকেই বেশ আরম্ভ হইয়াছে। দলে দলে

শিক্ষিত চরিত্রবান ধর্ম্মানুরাগী ও ঈশ্বরলুব্ধ যুবকেরা আলমবাজার মঠে নিয়মিতরূপে যাতায়াত করিতেছেন এবং তাঁহারা অনেকেই শ্রীরামকৃষ্ণের শিষ্য ত্যাগী সন্ন্যাসিবৃন্দের পবিত্রতা, জ্ঞান, প্রেম ও অমায়িকতায় মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইয়াছেন। তাঁহারা প্রথমে কেহ কেহ চিকাগো ধর্ম্মমহাসভায় রামকৃষ্ণ-শিষ্য জগদ্বরেণ্য স্বামী বিবেকানন্দের নাম ও তাঁহার বক্তৃতা সংবাদপত্রে পাঠ করিয়া কৌতূহল-বশতঃ শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্ন্যাসিমণ্ডলীর সহিত পরিচিত হইতে আসিয়াছিলেন, আবার কেহ কেহ তাঁহাকে যুগাবতার জ্ঞানে ও বিশ্বাসে আলমবাজার মঠে গমন করিতেন। মহারাজ তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ অলৌকিক সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখিতে পাইলেন—শ্রীরামকৃষ্ণ যে মহাশক্তির দিব্য তেজ উদ্দীপিত করিয়া গিয়াছেন তাহার তড়িৎসঞ্চারী শক্তিকণা জগতের চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে এবং তাহার স্পন্দনে সমগ্র বিশ্ব আন্দোলিত হইতেছে। ভাবী কালে ইহা বিরাট মানবজাতির হৃদয় এক অভিনব আধ্যাত্মিক আলোকরেখায় সমুজ্জ্বল করিবে।

শ্রীবৃন্দাবন হইতে ফিরিবার কিছুদিন পরে তিনি বলরামের গৃহে একদিন তাঁহার গুরুভ্রাতা যোগানন্দ ও প্রেমানন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,"আমি বৃন্দাবনে বেশ ছিলুম। যাতে মঠের ভিতর তাঁর সেই প্রেম ভক্তি ভাব জীবনে বিকাশ পায়, যাতে তাদের দেখে ঠাকুরের কথা সবাই স্মরণ করতে পারে তাই বৃন্দাবন ছেড়ে তাদের সেবা করতে এলুম। এমন সময়, এমন যুগ তো আর সহজে মিলবে না। তোমাদের জীবন, তোমাদের মঠ দেখে জগতের লোক জুড়ুতে আসবে, ঠাকুরের আশ্রয় নিয়ে তারা

ত্রিতাপজ্বালা থেকে শান্তি পাবে। তাইতো বৃন্দাবন থেকে ফিরে এসেছি।” সকলেই স্তব্ধ হইয়া তাঁহার কথাগুলি শুনিলেন। বাস্তবিকই তখন তাঁহাকে দেখিলে এবং তাঁহার কথা শুনিলে মনে হইত তিনি যেন আধ্যাত্মিক রত্নগুলি বিতরণ করিবার জন্য উন্মুখ হইয়া রহিয়াছেন।

এই সময়ে শ্রীশ্রীমার স্বাস্থ্য তেমন ভাল যাইতেছে না জানিয়া মহারাজ তাঁহাকে কলিকাতায় আনাইয়া রাখিবার জন্য বাগবাজার অঞ্চলে গঙ্গার সমীপবর্ত্তী একটি বাড়ী ভাড়া করিলেন। কামার-পুকুর ও জয়রামবাটী প্রভৃতি স্থানসমূহ ম্যালেরিয়ার জন্য প্রসিদ্ধ। শ্রীশ্রীমাকে জয়রামবাটী হইতে আনাইয়া মহারাজ উক্ত ভাড়াটিয়া বাড়ীতে তাঁহার বাস করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এই বাড়ীটীর নিম্নতলে একটী হলুদ গুদাম ছিল বলিয়া লোকে উহাকে ‘গুদামবাড়ী’ বলিত। দ্বিতল ও ত্রিতল বাসোপযোগী ছিল। গোপালের মা ও গোলাপ মা প্রভৃতি স্ত্রীভক্তদের লইয়া মা ত্রিতলে বাস করিতেন; সেখান হইতে বেশ গঙ্গাদর্শন করা যাইত। শ্রীশ্রীমার সেবা ও যত্নের কোন ত্রুটি না হয় তজ্জন্য স্বামী যোগানন্দ ও অপর দুই একজন সাধু-ব্রহ্মচারী সহ মহারাজ স্বয়ং দ্বিতলে বাস করিতে লাগিলেন। এই বাড়ীর দ্বিতলে একটী হল ঘর ছিল, মহারাজ তথায় বসিয়া ভক্তদের সহিত ভগবৎপ্রসঙ্গ করিতেন। এই বাড়ীতে তিনি কাহাকে কাহাকেও দীক্ষা দিয়াছেন। মহারাজের গুরু ও আচার্য্যের ভাব এইরূপে ধীরে ধীরে প্রকাশ পাইতে লাগিল।

১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে সংবাদ আসিল পাশ্চাত্য দেশ হইতে

স্বামিজী স্বদেশে ফিরিয়া আসিতেছেন। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে ১৫ই জানুয়ারী তারিখে স্বামিজী কলম্বোয় পৌঁছিলে পর নানাস্থানে তাঁহার বিরাট অভ্যর্থনা, বক্তৃতা ও মানপত্র-প্রদানের বিবরণ সংবাদপত্রে মুদ্রিত ও প্রচারিত হইল। স্বামিজীর জন্মভূমি কলিকাতা মহানগরীতে যাহাতে বিপুল সমারোহে অভ্যর্থনা ও মানপত্র-প্রদান করা হয় তৎসম্বন্ধে ভক্তমণ্ডলীর বলবতী ইচ্ছা ছিল। তাঁহারা একদিন মহারাজের নিকট উক্ত প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। তিনি তাঁহাদিগকে উৎসাহ দিয়া উক্ত অভিপ্রায়ে ত্বরায় একটী অভ্যর্থনাসমিতি গঠন করিতে বলিলেন। এই সমিতি যাহাতে যথার্থ প্রতিনিধিমূলক হয় তৎসম্বন্ধে তাঁহাদিগকে সমুচিত সদুপদেশ প্রদান করিলেন। মহারাজ সর্ব্বাগ্রে তার পাইলেন যে স্বামিজী ২০শে ফেব্রুয়ারী ষ্টীমারযোগে ডায়মণ্ড হারবারে পৌঁছিবেন। তিনি ইহা পত্রে লিখিয়া জনৈক ভক্তের মারফত অভ্যর্থনা সমিতির প্রধান উদ্যোক্তা ছোট নরেন্দ্রের নিকট পাঠাইলেন। স্বামিজীর সুখস্বাচ্ছন্দ্য সম্বন্ধে যত্ন লইবার জন্য তিনি স্বামী ত্রিগুণাতীতকেও তথায় পাঠাইয়া দিলেন। বহুদিন পরে আবার তাঁহাদের পরস্পর সাক্ষাৎ ও মিলন হইবে ইহা মনে করিয়া মহারাজের হৃদয়ে অপূর্ব্ব আনন্দের প্রবাহ চলিতেছিল। পরদিন শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে সমগ্র রাজপথে বিপুলভাবে অভ্যর্থিত ও পুষ্পসম্ভারে সজ্জিত হইয়া স্বামিজী যখন বাগবাজারে পশুপতি বসুর প্রাসাদোপম অট্টালিকার দ্বারদেশে উপনীত হইলেন তখন মহারাজ স্বামিজীর কণ্ঠে একটী সুন্দর পুষ্পমাল্য পরাইয়া দিলেন। স্বামিজী তাঁহার পাদবন্দনা করিলেন। মহারাজকে লক্ষ্য করিয়া

স্বামিজী সহাস্যবদনে বলিলেন, "গুরুবৎ গুরুপুত্রেষু।" মহারাজ মৃদুহাস্যে বলিলেন, "জ্যেষ্ঠভ্রাতা সম পিতা।"

দর্শনার্থী লোকের জনতায় এবং পরিচিত বন্ধুবান্ধবের সহিত কথোপকথনে স্বামিজীকে ক্লান্ত দেখিয়া মহারাজ বুঝিলেন তাঁহার বিশ্রাম আবশ্যক। অপরাহ্ণে মহারাজ স্বামিজীকে আলমবাজার মঠে লইয়া গেলেন। বহুদিন পরে গুরুভ্রাতারা স্বামিজীকে মঠে একান্তে পাইয়া আনন্দে মাতিয়া উঠিলেন। স্বামিজীও দীর্ঘ প্রবাসের পর তাঁহাদিগকে দেখিয়া পরম উৎফুল্ল হইলেন। পাশ্চাত্য দেশ হইতে সংগৃহীত অর্থাদি মহারাজের নিকট গচ্ছিত রাখিয়া স্বামিজী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, 'এদ্দিন যার জিনিষ বয়ে বেড়িয়েছি, আজ তাকে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হলুম।' সেদিন মঠে অপূর্ব্ব প্রীতির হিল্লোল বহিল। কলিকাতা অভ্যর্থনা সমিতি পাশ্চাত্য শিষ্যদের সহিত স্বামিজীর থাকিবার জন্য কাশীপুরে গোপাল শীলের বাগান বাড়ী বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। আলমবাজার মঠ হইতে প্রতিদিন প্রাতঃকালে স্বামিজী তথায় সমস্ত দিন অবস্থান করিয়া দর্শনার্থী ও জিজ্ঞাসুদের সহিত আলাপ-আলোচনা করিতেন। সন্ধ্যার পর তিনি মঠে ফিরিয়া আসিতেন। মহারাজ দেখিলেন যে, স্বামিজী একপ্রকার ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়াই কলিকাতায় আসিয়াছেন। গুরুতর পরিশ্রমে ও দর্শনপ্রার্থী লোকের সমাগমে ক্রমশঃই তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। তাই কলিকাতায় অভ্যর্থনা সমিতির উদ্যোগে দুইটী বক্তৃতার আয়োজন হইয়াছিল—একটী ২৮শে ফেব্রুয়ারী রবিবার রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের সুবিস্তৃত প্রাঙ্গণে মানপত্র-দান ও

স্বামিজীর অভিভাষণ, অপরটী ষ্টার রঙ্গমঞ্চে "বেদান্ত" সম্বন্ধে বক্তৃতা। ইহার পর মহারাজ স্বামিজীকে আর বক্তৃতা করিতে দিলেন না। তিনি স্বামিজীর রীতিমত চিকিৎসা আরম্ভ করাইলেন। ডাক্তারদের পরামর্শে ও ব্যবস্থানুসারে জলবায়ু পরিবর্ত্তন এবং একান্ত বিশ্রামের জন্য দার্জ্জিলিং যাইবার বন্দোবস্ত করা হইল। শ্রীশ্রীঠাকুরের উৎসবের পরই মহারাজ, হরি মহারাজ, গিরিশবাবু ও সুযোগ্য শিষ্যসেবক সঙ্গে লইয়া স্বামিজী দার্জ্জিলিং যাত্রা করিলেন।

স্বামিজী চাহিতেন শ্রীরামকৃষ্ণের প্রচার ও সঙ্ঘ যাহাতে সুনিবদ্ধ প্রণালীতে স্থায়ী ভাবে পরিচালিত হয়—যাহাতে দেশের জনসাধারণ উন্নত, স্বাধীনতাপ্রিয় এবং আধ্যাত্মিক ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় শিক্ষিত হইতে পারে এবং যাহাতে শ্রীরামকৃষ্ণের নবালোকসম্পাতে আধ্যাত্মিক রত্নসমূহ জগতে বিতরণ করিয়া ভারত সমগ্র মানব জাতির হিতার্থে আচার্য্য পদে বৃত হইয়া শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করে। ইহাই ছিল স্বামিজীর অহর্নিশ চিন্তা। এই বিষয়গুলি মহারাজ ও গিরিশবাবুর সহিত আলোচনা করিবেন বলিয়া স্বামিজী তাঁহাদিগকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন। একদিন তথায় এইরূপ পরিকল্পনার খসড়া লইয়া স্বামিজী তাঁহাদের সহিত আলাপ-আলোচনা করিতেছিলেন, এমন সময়ে মহারাজ একটী অভিমত প্রকাশ করেন—স্বামিজী অমনি তাহা লিখিয়া লইলেন। মহারাজ তাহা দেখিয়া স্বামিজীকে বলিলেন, "এই বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার জন্যই আমি বলেছি—তা না করে তুমি একেবারে লিখে ফেল্লে!" তদুত্তরে স্বামিজী বলিলেন, "তুই

যা বলিবি তাই করবো। এমন কি তুই যদি আগাগোড়া সব বদলে দিতে চাস—তাই হবে।" পরে স্বামিজী মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "এ কথা কেন বলছি তা কি তোর মাথায় ঢুকলো?" মহারাজ তখন গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "তবে আমি আর কিছু বলব না।" উপস্থিত সকলেই ইঁহাদের দুইজনের কথাবার্ত্তা শুনিয়া আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন। দার্জ্জিলিং শৈলশিখরে বসিয়া ইঁহারা মিলিতভাবে একটী পরিকল্পনা করেন এবং তাঁহার স্থায়ী রূপ দিবার জন্য তিনি কয়েকদিন পরেই কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন।

১লা মে বলরামের গৃহে ঠাকুরের ভক্তশিষ্যবৃন্দ এবং মঠের সন্ন্যাসিগণ আহূত হইয়া সমবেত হন। স্বামিজী তাঁহার প্রস্তাবিত উদ্দেশ্য সকলকে বুঝাইয়া দিলে এবং সভায় গিরিশচন্দ্র তাহা অনুমোদন করিলে সর্ব্বসম্মতিক্রমে ইহা গৃহীত হয়। এইভাবে রামকৃষ্ণ মিশন প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার সাধারণ সভাপতি স্বামিজী এবং কলিকাতা কেন্দ্রের সভাপতি হইলেন মহারাজ। উক্ত সভায় ইহাও স্থির হইল যে প্রত্যেক রবিবার অপরাহ্ণে মিশনের নিয়মিতরূপে অধিবেশন হইবে। সুতরাং কলিকাতা কেন্দ্রের সভাপতিরূপে মহারাজকেই মিশনের কার্য্যক্ষেত্রে সর্ব্বপ্রথমে অবতীর্ণ হইতে হইল।

মিশন-প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই মুর্শিদাবাদে দুর্ভিক্ষ-মোচন-কার্য্যের আরম্ভ। অখণ্ডানন্দ মঠে পত্র লিখিয়া জানাইলেন যে মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে দারুণ দুর্ভিক্ষ এবং বহুলোক অনাহারে মরিতেছে। কি প্রণালীতে তিনি দুর্ভিক্ষে সাহায্য করিবার পরিকল্পনা

করিয়াছেন, তাহা সবিস্তার গুরুভ্রাতাদের নিকট জ্ঞাপন করিলেন। অখণ্ডানন্দের পত্র পাইয়া স্বামিজী অত্যন্ত প্রীত হইলেন। অবিলম্বে অখণ্ডানন্দের দুর্ভিক্ষ-মোচন-কার্য্যে যথোচিত সাহায্য করিতে মহারাজকে নির্দ্দেশ দিলেন। তদনুযায়ী মহারাজ মঠ হইতে জনৈক সন্ন্যাসী ও একজন ব্রহ্মচারীকে কিছু অর্থসহ তথায় পাঠাইয়া দিলেন। রামকৃষ্ণ মিশনের অপূর্ব্ব নিঃস্বার্থপর দুর্ভিক্ষ-মোচন-কার্য্য দেখিয়া উচ্চ রাজকর্ম্মচারীরা মুগ্ধ হইলেন। পরে গবর্ণমেণ্ট সস্তাদরে মিশনকে চাউল সরবরাহ করিতে স্বীকৃত হইলে মহারাজ স্বামী অখণ্ডানন্দকে লিখিলেন, "You will enlist such people as you think really deserving the charity and will not be guided by any other people either in private charity or in public." অর্থাৎ গোপন বা প্রকাশ্য সাহায্যে তুমি নিজে যাহাদিগকে দানের উপযুক্ত পাত্র মনে কর তাহাদিগকে সাহায্যের তালিকা-ভুক্ত করিবে, কাহারও কথায় বা অনুরোধে পরিচালিত হইও না।

দুর্ভিক্ষ-মোচন-কার্য্য সুচারুরূপে পরিচালিত হইতেছে জানিতে পারিয়া মহারাজ অখণ্ডানন্দকে উৎসাহ দিয়া লিখিলেন, "Heartএর development না হইলে কোন কাজই হয় না। তোমাদের এই প্রকার কার্য্য মহান্ হৃদয়ের পরিচায়ক। 'ধনানি জীবিতঞ্চৈব পরার্থে প্রাজ্ঞ উৎসৃজেৎ'—এই মহৎ শ্লোকের যথার্থ application তোমাদের কার্য্যে দেখা যাইতেছে। তোমরা আরও দিন দিন উৎসাহের সহিত কার্য্য কর। আমার দৃঢ় বিশ্বাস নিঃস্বার্থ-

ভাবে কোন কাজে ব্রতী হইলে স্বয়ং ভগবান তাহার সহায়তা করেন।” রামকৃষ্ণ মিশনের এই সর্ব্বপ্রথম লোকহিতকর অনুষ্ঠানের সুপরিচালনায় মহারাজ এত আহ্লাদিত হইয়াছিলেন যে অখণ্ডানন্দকে তিনি সোৎসাহে উৎফুল্ল হইয়া লিখিয়াছিলেন, “তোমাকে কি বলিব খুঁজিয়া পাইতেছি না। তুমি এখানে আসিলে grand reception এবং আমরা কোলে করিয়া নাচিব।” মহারাজ এইরূপ আনন্দোৎসাহেই কর্ম্মের কঠোরতা ও শুষ্কতাকে সরস করিয়া তুলিতেন এবং যাঁহারা কর্ম্ম করিতেন তাঁহাদের হৃদয়ে একটা অপূর্ব্ব আনন্দের প্রবাহ সঞ্চার করিয়া দিতেন।

দুর্ভিক্ষমোচন-কার্য্য শেষ হইলে প্রথমে মহুলা গ্রামে এবং পরে সারগাছিতে স্থায়ীভাবে অনাথাশ্রম স্থাপিত হয়।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে দিনাজপুরের ভীষণ দুর্ভিক্ষের কথা শুনিয়া মহারাজ ত্রিগুণাতীত স্বামীকে তথায় পাঠাইয়া দিলেন। দিনাজপুর জেলার অধিবাসীরা দুর্ভিক্ষ-মোচন-কার্য্য শেষ হইলে এক মহতী সভা আহ্বান করিয়া স্বামী ত্রিগুণাতীতকে একটী মানপত্র দান করেন। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ বোনহাম কাটার সভাপতিরূপে রামকৃষ্ণ মিশনের দুর্ভিক্ষ-সাহায্য-কার্য্য-প্রণালীর ভূয়সী প্রশংসা করেন। মানপত্রের উত্তরে History and Philosophy of Famine সম্বন্ধে স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ দুই ঘণ্টা ব্যাপী সুদীর্ঘ সারগর্ভ বক্তৃতা করেন—উহা ইংরেজী দৈনিক ইণ্ডিয়ান মিরর পত্রিকায় সবিস্তার প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সময় কলিকাতায়, আলমবাজারে ও দক্ষিণেশ্বরে অনশনক্লিষ্ট

অনেক দুঃস্থ ব্যক্তিকেও নিয়মিতভাবে সাহায্য করিতে হইত। সাঁওতাল পরগণায় বৈদ্যনাথ দেওঘরে ভীষণ দুর্ভিক্ষের কথা শুনিয়া তিনি সাহায্যবিতরণের জন্য স্বামী বিরজানন্দকে তথায় পাঠাইয়া দিলেন। রামকৃষ্ণ মিশন মাত্র কয়েকমাস পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু মহারাজের অদ্ভুত কর্ম্মকুশলতায় এবং সাধু ব্রহ্মচারী কর্ম্মিগণের আপ্রাণ চেষ্টায় মিশনের দুর্ভিক্ষ-মোচনকার্য্যে একটা সুনাম চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। এমন কি জনসাধারণ এবং সরকার বাহাদুর রামকৃষ্ণ মিশনের কার্য্যপ্রণালী ও জাতিনির্ব্বিশেষে সেবাকার্য্য বিস্ময়ে শ্রদ্ধাপ্লুত হৃদয়ে দেখিতে লাগিলেন। সমগ্র জাতির মধ্যে এক নূতন আদর্শ ও প্রেরণা জাগিয়া উঠিল।

দার্জ্জিলিং পাহাড়ে স্বামিজীর স্বাস্থ্যের কোন উন্নতি না হওয়ায় চিকিৎসকগণের পরামর্শানুসারে তিনি মিশন প্রতিষ্ঠা করিয়াই ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে আলমোড়া যাত্রা করিলেন। মঠ ও মিশনের সমুদায় বিবরণ প্রতি সপ্তাহে মহারাজ তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিতেন। প্রয়োজনীয় চিঠিপত্রাদির উত্তর স্বামিজীর নির্দ্দেশানুসারে তিনি লিখিয়া পাঠাইতেন। এই সময় মহারাজের অসাধারণ কর্ম্মশক্তি প্রকাশ পাইয়াছিল। মিশনের নিয়মিত সাপ্তাহিক অধিবেশন, দুর্ভিক্ষ-মোচনাদি যাবতীয় সেবাকার্য্যের জন্য অর্থসংগ্রহ ও ব্যবস্থা, স্বামিজীর প্রবর্ত্তিত নিয়মানুযায়ী মঠের পরিচালনা, মঠ ও মিশনের চিঠিপত্র ও বাহিরের লোকের চিঠিপত্রে নানা প্রশ্নের উত্তর প্রেরণ, প্রস্তাবিত মিশনের মুখপত্রস্বরূপ বাংলা পাক্ষিক পত্রিকার প্রকাশ সম্বন্ধে সহায়তা, স্বামিজীর চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় ডাক্তারদের

সহিত পরামর্শ করিয়া ঔষধ ও পথ্যাদির ব্যবস্থা পাঠান, যোগানন্দের চিকিৎসা এবং শুশ্রূষার বন্দোবস্ত ও তত্ত্বাবধান, পাশ্চাত্ত্য অতিথিদের যথোচিত সৎকার ও সম্বর্দ্ধনা, শ্রীশ্রীমার সেবা-পরিচালনা, ঠাকুরের গৃহস্থ ও নবাগত ভক্তদের প্রতি যথাযোগ্য সপ্রেম ব্যবহার, তরুণ যুবকদের মধ্যে আধ্যাত্মিক জীবনগঠনে প্রেরণা ও সাহায্যদান এবং বিভিন্ন স্থানে প্রচারকেন্দ্র স্থাপন ও পরিচালনার পর্য্যবেক্ষণ প্রভৃতি নানাবিষয়ক ব্যাপারে তিনি যেন শতহস্ত হইয়া কাজ করিতেন। তাঁহার এই অপূর্ব্ব কার্য্যদক্ষতায় স্বামিজী বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন, "এই আট ন' মাস তুমি যে কাজ করেছ—খুব বাহাদুরি দেখিয়েছ।"

তাঁহাকে দেখিলে বোধ হইত না যে তিনি এতগুলি কার্য্যে জড়িত আছেন। বাহিরে তাঁহার প্রশান্ত সহাস্য মূর্ত্তি, কর্ম্মজনিত কোন উদ্বেগ বা চিন্তার রেখা তাঁহার বদনমণ্ডলে দেখা যাইত না—সেখানে আশার মাদকতা বা নিরাশার বিষাদময় চিহ্ন কখনও ফুটিয়া উঠিত না, কর্ম্মতরঙ্গের কোন বাহ্যিক চাঞ্চল্যই স্ফূর্ত্তি পাইত না। তাঁহার কথায় কোন আবেগের ভাষা বা তাড়না নাই, নেতৃত্বের কোন অভিমান নাই, কর্ত্তৃত্ব-প্রকাশের চেষ্টা নাই। কিন্তু কর্ত্তব্যপালনে ছিলেন তিনি অটল ও নির্ভীক এবং কার্য্য-পরিচালনায় তাঁহার সূক্ষ্ম দৃষ্টি, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, গভীর শ্রদ্ধা ও প্রগাঢ় অনুরাগ প্রকাশ পাইত।

এই সকল কাজকর্ম্মের মধ্যে থাকিয়াও মহারাজ আলমবাজার মঠে শ্রীরামকৃষ্ণের জ্বলন্ত আদর্শ ও বাণী সমবেত সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিবৃন্দের সম্মুখে প্রাণস্পর্শী ভাষায় বলিতেন। সামান্য ছোট

ছোট কথায় বলিলেও তাহা অগ্নিকণার ন্যায় অন্তরের সমস্ত সংশয় ও মলিনতাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিত। তিনি আবিষ্ট ও তন্ময় হইয়া তাঁহাদিগকে আধ্যাত্মিক ভাবে উদ্দীপিত করিয়া বলিতেন, "যখন কোন বক্তৃতা দিবে তখন পরমহংসদেবের কথা যত বলতে পার বলবে, কারণ উহা অতি সহজ ব্যাখ্যা।" শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনের আলোকসম্পাতে এবং তাঁহার সরল সহজ কথায় শাস্ত্র ও দর্শনাদির মর্ম্ম যে জনসাধারণের অনায়াসে বোধগম্য হইবে ইহাই তাঁহার বলিবার উদ্দেশ্য। যুগাবতারের যুগবাণী সহজেই লোকের অন্তর স্পর্শ করিয়া থাকে। কিন্তু ইহাতে কোন রকম গোঁড়ামি না প্রবেশ করে তাই সতর্ক করিয়া ঠাকুরের কথা তাঁহাদের স্মরণ করাইয়া মহারাজ বলিলেন, "তিনি বলতেন, 'আমি খোসামোদ চাইনে। যে তাঁকে (ঈশ্বরকে) প্রকৃতভাবে ডাকে তাকে আমি ভালবাসি। তাঁকে ডাকলে কোথায় সব দোষ চলে যায়।' সরল ভাবের লোককে তিনি ভালবাসতেন। বক্তৃতায় ঠাকুরের শুধু উচ্চ প্রশংসা বা স্তবগান করলেই তিনি সন্তুষ্ট হবেন না, তিনি চান প্রকৃত সরল ঈশ্বরানুরাগী মন।" মহারাজ ঠাকুরের জীবন উল্লেখ করিয়া বলিলেন, "বাজে কথা তিনি মোটে বলতে পারতেন না। তিনি রাত্রে আধঘণ্টার অধিক প্রায় ঘুমুতেন না—কখনও সমাধিতে থাকতেন, কখন সংকীর্ত্তনে, কখন হরিনামে। তিনি বলতেন, অনুরাগ আবশ্যক। অনুরাগ কি প্রকার? ঋষি খ্রীষ্ট যেমন এক বৃদ্ধকে আকণ্ঠ জলমগ্ন করে তার ব্যাকুলতা দেখিয়ে সেই ব্যাকুলতা ঈশ্বরের জন্য করতে বলেন। দেখেছি তাঁর প্রায় এক বা দেড় ঘণ্টা সমাধি হয়ে গিয়েছে। কখন

কখন সেই অবস্থায় কথা বলবার চেষ্টা করেও বলতে পারতেন না। বলতেন, 'কথার ঘর আমার কখন বন্ধ হয় খুঁজে পাইনে'।" ঈশ্বরোদ্দেশ্যে কিরূপ ব্যাকুল হইতে হইবে তাহা তিনি ঠাকুরের কথায় প্রকাশ করিয়া বলিলেন, "ভগবানের জন্য কিরূপ প্রেম চাই? যেমন পাগলা কুকুরের মাথায় ঘা হলে ছট ফট করে।" ইহা বলিতে বলিতে তিনি ভাবাবেগে সতেজে বলিয়া উঠিলেন, "তিনি বারম্বার আমাদের মনে বিশেষ করে ধারণা করে দিয়েছেন যে বৈষয়িক জ্ঞান অতি তুচ্ছ, অধ্যাত্ম জ্ঞান, ভক্তি, এবং অনুরাগই সাধন করতে হবে।" মঠের সাধুদের মধ্যে কেহ তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন, "মহারাজ, ঠাকুরের সমাধি কিরূপ হত?" উত্তরে মহারাজ বলিলেন, "তাঁর বিভিন্ন প্রকার সমাধি হত। কোন অবস্থায় তাঁর সমস্ত শরীর কাঠের ন্যায় শক্ত হয়ে যেত, এ অবস্থা থেকে তিনি সহজে বেশ সাধারণ অবস্থায় আসতেন। কিন্তু যখন তিনি ভাবসমাধিতে মগ্ন হতেন তখন ভাবসম্বরণের পরও কিছুকাল যেন মাতালের মত কথাবার্ত্তা বলতেন।" ঠাকুরের সমাধি-প্রসঙ্গে মহারাজের অন্তরে যেন ব্রহ্মচৈতন্যের ভাব স্ফূর্ত্তি পাইল। 'সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম'—এইভাবেই মাতোয়ারা হইয়া মহারাজ সমবেত সাধু-ব্রহ্মচারীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তাঁর বিষয়ে অনেক ব্যাপার আছে। একজন সাধু রামলালা নামে এক মূর্ত্তি তাঁকে দেন, তিনি গঙ্গায় স্নানকালে ঐ মূর্ত্তি সঙ্গে নিয়ে যেতেন এবং সেই মূর্ত্তি জলে সাঁতার কাটত—একথা তিনি নিজেই বলেছেন। এরূপ অবস্থায় জড় এবং চৈতন্যের বিভাগ কি ভাবে করতে পার?"

ঠাকুরের প্রসঙ্গে মহারাজ একেবারে দিব্যভাবে তন্ময় হইয়া যাইতেন। সেই অবস্থায় কেহ প্রশ্ন করিলেন, 'মহারাজ, কালী, কৃষ্ণ প্রভৃতি রূপ যথার্থ কি ?' গম্ভীরভাবে তিনি উত্তর করিলেন, "হাঁ"। এইসব ভাবের কথায় তিনি কোন অতল সমুদ্রে ডুবিয়া যাইতেন, যাঁহারা শুনিতেন তাঁহারা শুধু আভাসে বুঝিতে পারিতেন যে এই আশ্চর্য্য বক্তা অতীন্দ্রিয় ভাবে আবিষ্ট হইয়া অস্ফুট ও অব্যক্তকে ব্যক্ত করিতে চাহিতেছেন। ছোট ছোট সহজ কথায় তিনি বলিতেন বটে, কিন্তু তাঁহার মুখ হইতে যখন ইহা বাহির হইত তখন শ্রোতাকেও কোন এক অজ্ঞাত ভাবরাজ্যে লইয়া যাইত। কোন রচনা কিংবা বর্ণনা তাহা প্রকাশ করিতে অসমর্থ।

মহারাজের এইসব আলাপ-আলোচনা সংক্ষিপ্তভাবে আলমবাজার মঠের দৈনিক লিপিতে কিছু লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু তাঁহার মুখ হইতে যাঁহারা না শুনিয়াছেন তাঁহারা তাঁহার সেই কথাগুলির তেজ ও শক্তি সহজে কল্পনায় আনিতে পারিবেন না।

রাণী রাসমণির দৌহিত্র, মথুরবাবুর পুত্র ত্রৈলোক্য বাবু অন্যান্য বারের মত ঠাকুরের জন্মোৎসব মন্দির-প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত হইতে দিতে চান না, পাছে সাহেব মেমের সংস্পর্শ হয়। মহারাজ ৩।১২।৯৭ তারিখে রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিয়াছিলেন, "এ বৎসর মহোৎসব কোথায় হইবে স্থির নাই। স্বামিজী আসিয়া কি একটা যা হউক স্থির করিবেন।" ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে ৫ই ফেব্রুয়ারী মহারাজ তাঁহাকে লিখিয়া জানান, "ত্রৈলোক্য বাবুর সর্ত্তে আমরা দক্ষিণেশ্বরে রাজী হই নি।" তিনি লিখিয়াছিলেন, "On the

river-side at Belur a land about 20 bighas has been entered into an agreement at about ₨ 40,000 for our Math purposes. If the deeds and documents of the said land be approved of by attorneys and other professional lawyers it will be purchased within a month. You keep it in private and need not give this out until we are able to purchase." অগত্যা পূর্ণচন্দ্র দাঁর ঠাকুর বাড়ীতে সে বৎসরে ঠাকুরের জন্ম-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।

১৮৯৮খৃঃ ৩রা ফেব্রুয়ারী তারিখে বেলুড়ে জমি কিনিবার বায়না হইবার পর আলমবাজার হইতে গঙ্গার পশ্চিম তীরে নীলাম্বর বাবুর বাড়ী ভাড়া লইয়া মঠ স্থানান্তরিত হইল। মঠগৃহ-নির্ম্মাণের যাবতীয় কাজ মহারাজকে দেখিতে হইত। ইতিপূর্ব্বে বিজ্ঞানানন্দ স্বামী ইঞ্জিনিয়ারের চাকরি ত্যাগ করিয়া আলমবাজার মঠে যোগদান করিয়াছিলেন। স্বামিজীর পরিকল্পনানুযায়ী মঠগৃহের প্ল্যান ও তাহার নির্ম্মাণকার্য্যে তিনি মহারাজের সহকারী হইলেন। আয়-ব্যয়ের সমুদয় হিসাব মহারাজ নিজেই রাখিতেন। ১৮৯৮ হইতে ১৯০২ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তাঁহার স্বহস্তলিখিত পাঁচখানি ডায়েরী দেখিতে পাওয়া যায়। উহাতে বিভিন্ন হিসাব ও বিশেষ কার্য্যের তালিকাদি লিপিবদ্ধ আছে। প্রত্যেক খুঁটিনাটি কার্য্য পর্য্যন্ত তিনি সুচারুরূপে করিতেন। মঠ ও মিশনের কার্য্য কিরূপ ভাবে করিতে হইবে তাহার আদর্শ পথ মহারাজ দেখাইয়া গিয়াছেন।

স্বাস্থ্য ভগ্ন হওয়ায় স্বামিজী প্রায়ই জলবায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য

নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। মহারাজ তাঁহাকে সর্ব্বদা মঠ ও মিশনের আনুপূর্ব্বিক বিবরণ নিয়মিতভাবে জানাইতেন। স্বামিজী তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাহা দেখিয়া লইতেন এবং কোন কার্য্যে সামান্য ত্রুটী বা শিথিলতা দেখিলে তিনি মহারাজকেই সতর্ক করিয়া দিতেন। যে সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিতেছিল তাহার গঠন যাহাতে দৃঢ় ও স্থায়ী ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়, এই ছিল স্বামিজীর অহর্নিশ চিন্তা। তাই তিনি মহারাজকে স্পষ্টভাবে কোন পত্রে লিখিয়াছিলেন, "আমার কেবল ভয় এই যে এখন ত একরকম খাড়া করা গেল, অতঃপর আমরা চলে গেলে যাতে কাজ চলে এবং বেড়ে যায় তাই দিনরাত আমার চিন্তা।" স্বামিজী বারংবার এই দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া মহারাজকে মঠ ও মিশন গড়িয়া তুলিতে বলিলেন। এইজন্য তিনি মহারাজকে তাঁহার পাশ্চাত্য অভিজ্ঞতা-লব্ধ মতামতগুলি জানাইয়া রাখিতেন। আমাদের দেশে কোন প্রতিষ্ঠান স্থায়ীরূপে কেন গড়িয়া উঠিতে পারে না তাহা চিঠিপত্রে ও কথাবার্ত্তায় তাঁহাকে বিশদরূপে বুঝাইতেন। তিনি মহারাজকে লিখিয়াছিলেন, "আমাদের India র ত্রুটী—great defect—we cannot make a permanent organisation and the reason is because we never like to share power with others and never think of what will come after we are gone"—অর্থাৎ আমাদের ভারতের একটি মহৎ দোষ যে আমরা কোন স্থায়ী প্রতিষ্ঠান গড়িতে পারি না, তার কারণ আমরা কখন অন্যান্য ব্যক্তিদের সহযোগে ক্ষমতার ভাগ

লইতে চাহি না এবং আমাদের মৃত্যুর পর কি হইবে সে সম্বন্ধে কখন চিন্তা করি না। আমাদের বর্ত্তমান ভারতবাসীর চরিত্র বিবেচনা করিয়াই স্বামিজী এইরূপ আশঙ্কান্বিত হইয়াছিলেন এবং পাছে কোন দোষ বা ক্রটীতে সঙ্ঘের দৃঢ়মূল শিথিল হয়, তাই কঠোরভাবে প্রত্যেক কার্য্যের দোষ-গুণ বিচার করিতেন। স্বামিজীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে এই সঙ্ঘকে স্থায়ীরূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে মহারাজই একমাত্র সক্ষম। স্বামিজী তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন, "এমন machineটি খাড়া কর যে আপনি আপনি চলে যায়— যে মরে বা যে বাঁচে।" জীবন ক্ষণভঙ্গুর। ভগ্ন স্বাস্থ্য লইয়া স্বামিজী তাঁহার পরিকল্পনার স্থায়ী রূপ দেখিবার জন্য ব্যাকুল ও চঞ্চল হইয়া উঠিতেন। তিনি মহারাজকে সঙ্ঘের বিস্তার এবং যথাযথ পরিচালনার নিমিত্ত নানাবিধ কার্য্যপ্রণালীর উপদেশ দিতেন। মহারাজও ধীরভাবে বিবেচনা করিয়া উহা যতটা কর্ম্মক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যাইতে পারে এবং ধীরে ধীরে স্বামিজীর পরিকল্পনাটীকে কেমন করিয়া স্থায়ী আকারে গঠন করিতে পারা যায় তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বাস্তবক্ষেত্রে কর্ম্মের পথে অগ্রসর হইতেন। স্বামিজী তাঁহার উপদেশ ও পরিকল্পিত কার্য্য-প্রণালী যথাযথভাবে প্রতিপালিত হইতেছে না দেখিলে রুষ্ট হইয়া নানা কটু ও রূঢ় বাক্যে মহারাজকে তিরস্কার করিতেন। কিন্তু পরক্ষণেই জানাইতেন, "তোমাদের উপর অত্যন্ত কটু ব্যবহার করেছি বুঝতে পারছি, তবে তুমি আমার সব সহ্য করবে আমি জানি, ও মঠে আর কেউ নেই যে সইবে।" মহারাজের সুবিবেচনার উপর স্বামিজীর এতটা নির্ভরতা ছিল যে তাঁহার

মতামত জানাইয়া পরে বলিতেন বা লিখিতেন, "তুমি যা ভাল বুঝবে তাই করবে।"

এই সময়ে কলিকাতায় প্রেস কিনিয়া উদ্বোধন পত্রিকা প্রকাশ করিবার সংকল্প হয়। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে মে মাসের প্রথম সপ্তাহে মহারাজ মাদ্রাজ মঠে রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিয়াছিলেন, "কলিকাতায় একটি Press করিয়া paper start করিতে হইবে, নচেৎ কলিকাতায় কার্য্য কিছু হইতেছে না।"

অমরনাথ ও ক্ষীরভবানী দর্শনের পরে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের প্রথম সপ্তাহে লাহোরে স্বামিজীর স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়ায় স্বামী সদানন্দকে লইয়া তিনি মঠে চলিয়া আসেন। মহারাজ তাঁহার চেহারা দেখিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন; স্বামিজী অল্পক্ষণ পরেই শয্যাগ্রহণ করিলেন। প্রাতঃকাল হইতে অপরাহ্ণ পর্য্যন্ত এই ভাবেই কাটিয়া গেল। গিরিশবাবু প্রমুখ ভক্তেরা সংবাদ পাইয়া বৈকালে মঠে স্বামিজীর সংবাদ লইতে আসিলেন। সকলেই তাঁহার শারীরিক অবস্থার কথা শুনিয়া চিন্তান্বিত হইলেন। সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে স্বামিজী ধীরে ধীরে বাহিরে বসিবার ঘরের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। গিরিশবাবু তাঁহাকে দেখিয়া চমকিয়া উঠিয়া বলিলেন, "এ কি স্বামিজী, তুমি নীচে নেমে এলে যে! শুনলুম, তোমার বড় অসুখ!" স্বামিজী মৃদুস্বরে তাঁহাকে বলিলেন, "কি করি বল? শুয়ে শুয়ে যতবার চোখ মেলেছি, দেখি রাজা প্যাঁচার মত মুখ করে বসে আছে। তার মুখখানার সেই ভাব দেখে আর শুয়ে থাকতে পারলুম না—আস্তে আস্তে উঠে এলুম। আমি হাঁটছি, বেড়াচ্ছি দেখে রাজার

মুখে যদি হাসি বেরোয়।" গিরিশবাবু অমনি তাঁহাকে বলিলেন, "রাজার মুখ ভার হবে না ত আর কার হবে?" এই সব কথাবার্ত্তার অল্পক্ষণ পরেই মহারাজ ব্যস্তভাবে আসিয়া স্বামিজীকে বলিলেন, "তুমি উঠে এলে যে! শরীর কিছু ভাল বোধ হচ্ছে?" স্বামিজী গিরিশবাবুর দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "রাজা শালা আমাকে রোগী করে রাখতে চায়! রোগ-ফোগ কি? যা, আমি এখন বেশ ভাল আছি।" মহারাজ চলিয়া গেলে নানা প্রসঙ্গের পর মঠ ও মিশনের কথা উঠিল। স্বামিজী গিরিশবাবুকে বলিলেন, "রাজার কাজ দেখে আমি অবাক হয়ে গেছি। কি সুন্দরভাবে মঠ-মিশনের কাজ চালাচ্ছে! রাজার রাজবুদ্ধির তারিফ করতে হয়। ঠাকুর বলতেন, 'রাখালের রাজবুদ্ধি, একটা প্রকাণ্ড রাজ্য চালাতে পারে।' তা ঠিক।" গিরিশবাবু বলিলেন, "তাঁর ত ছেলে, হবে না কেন?" স্বামিজী ইহা শুনিয়া আনন্দে বিগলিত হইয়া বলিলেন, "রাজার spirituality আঁকড়ে পাওয়া যায় না। ঠাকুর যাকে ছেলে বলে কোলে করতেন, আদর করে খাওয়াতেন, এক সঙ্গে শয়ন করতেন, তার কি তুলনা হয়? রাজা আমাদের মঠের প্রাণ—সত্যিই আমাদের রাজা!"

স্বামিজী কিছুদিন পরে অনেকটা সুস্থ হইয়া উঠিলেন। একদিন অপরাহ্ণে ধর্ম্মপিপাসু একজন সাহেব মঠে আসিয়া উপস্থিত হন। মহারাজ তখন একাকী গঙ্গার ধারে বসিয়া ছিলেন। সাহেব তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া কয়েকটী প্রশ্নের মীমাংসা করিতে চাহিলে তিনি তাঁহাকে স্বামিজীর নিকট পাঠাইয়া দেন। স্বামিজী তাঁহার সহিত কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা বলিয়া উক্ত

প্রশ্নসমূহের উত্তর পাইবার জন্য মহারাজের নিকট যাইতে বলেন। সাহেব পুনরায় তাঁহার নিকট আসিয়া প্রশ্নগুলির উত্তর চাহিলে মহারাজ অনেক বুঝাইয়া স্বামিজীর নিকট পাঠাইয়া দিলেন। ভদ্রলোকটী পুনরায় ফিরিয়া আসিলে, 'ব্রহ্মানন্দ তোমার এই প্রশ্নগুলির সুন্দর সমাধান করিয়া দিবেন'—এই বলিয়া স্বামিজী সাহেবকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "There is a dynamo working and we are all under him." সাহেবের ঐকান্তিক আগ্রহ দেখিয়া মহারাজ তাঁহার প্রশ্নগুলির উত্তর দিলেন। মহারাজের কথা শুনিয়া সাহেবের সমুদায় সংশয় ছিন্ন হইল—তিনি আনন্দিত হইলেন। উপযুক্ত ব্যক্তিকে দেখাইয়া দেওয়ায় সাহেব স্বামিজীর নিকট পুনরায় আসিয়া তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন এবং গভীর কৃতজ্ঞতার সহিত জানাইলেন যে, তাঁহার ভারতবর্ষে আগমন সার্থক হইয়াছে।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের প্রারম্ভে বেলুড় মঠের গৃহনির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইয়া গেল। ৯ই ডিসেম্বর, বাংলা ১৩০৫, ২৪শে অগ্রহায়ণ শুভদিন দেখিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরপ্রতিষ্ঠার দিন ধার্য্য হইল। সে দিন স্বামিজী প্রাতঃকালে নীলাম্বর বাবুর বাটীস্থিত মঠের ঠাকুরঘরে শ্রীশ্রীঠাকুরের পাদুকায় পুষ্পাঞ্জলি দিয়া ধ্যানস্থ হইলেন। পরে আত্মারামের কৌটাটী তিনি স্বয়ং বামস্কন্ধে লইয়া বেলুড় মঠের নূতন জমির দিকে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার গুরুভ্রাতারা ও অন্যান্য সাধুব্রহ্মচারিগণ শঙ্খঘণ্টা বাজাইতে বাজাইতে তাঁহার অনুগমন করিলেন। উপস্থিত ভক্তেরা পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন। মঠের জমিতে নির্দ্দিষ্ট স্থানে বেদীর

উপর একটি সুবৃহৎ আসনে আত্মারামের কৌটাটী স্থাপনপূর্ব্বক স্বামিজী সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন। স্বামিজী স্বয়ং পূজা ও হোম সম্পন্ন করিয়া ভোগ নিবেদন করিলেন। নূতন মঠে তখনও রীতিমত সেবা-পূজার বন্দোবস্ত হয় নাই বলিয়া শ্রীশ্রীঠাকুরকে ফিরাইয়া আনা হইল। ইতিপূর্ব্বে ১২ই নভেম্বর শ্রীশ্রীকালীপূজার দিন শ্রীশ্রীমা মহিলাভক্তদের সঙ্গে লইয়া নূতন মঠ ও ঠাকুরঘর দেখিতে আসিয়াছিলেন। নীলাম্বর বাবুর বাড়ীতে তখনও মঠ ছিল—তথায় অন্যান্য সাধু-ব্রহ্মচারীরা থাকিতেন। তথা হইতে প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরের প্রতিকৃতি নূতন মঠে আনা হইল এবং মা সেদিন সেইখানে ঠাকুরের পূজা করিয়া ভোগ নিবেদন করিলেন। সকলেই পরম তৃপ্তিসহকারে সানন্দে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ২রা জানুয়ারী নীলাম্বরবাবুর বাড়ী ত্যাগ করিয়া বেলুড়ের নূতন গৃহে মঠ উঠিয়া আসিল। স্বামিজী পরে একদিন মহারাজকে ষোড়শোপচারে ভোজন করাইয়া যুক্তকরে বলিলেন, "রাজা, তোর আদর তিনিই জানতেন, আমরা কি জানি যে তোর আদর করব?"

এই বৎসর বেলুড় মঠে খুব সমারোহে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম-মহোৎসব সম্পন্ন হইল।

কিছুদিন পরে পীড়িত যোগানন্দ স্বামীর অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় স্বামিজীপ্রমুখ গুরুভ্রাতাগণ উদ্বিগ্ন হইলেন। মহারাজ অধিকাংশ সময় কলিকাতায় বলরাম-গৃহে থাকিয়া তাঁহার চিকিৎসা এবং সাধু ও ভক্ত যুবকদিগের দ্বারা দিনরাত্রি যথাযথ

সেবা-শুশ্রূষার ব্যবস্থা করিলেন। যোগানন্দ তখন বোসপাড়ায় শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর বাড়ীর নিম্নতলস্থ প্রকোষ্ঠে থাকিতেন। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ২৮শে মার্চ্চ মঙ্গলবার বেলা ৩টার সময় তিনি মহাসমাধিতে লীন হইলেন। স্বামিজী শোকার্ত্ত হইয়া বলিয়াছিলেন, "আমাদের ইমারতের একখানি ইট খসল।" যোগানন্দের দেহ-ত্যাগে মহারাজ অধিকাংশ সময় গম্ভীর ও মৌন হইয়া থাকিতেন এবং চারি মাস পর্য্যন্ত নিরামিষ আহার করিয়াছিলেন।

এদিকে স্বামিজীর স্বাস্থ্য পুনরায় ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে দেখিয়া মহারাজ ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। যথারীতি চিকিৎসা ও সেবা-শুশ্রূষায় তাঁহার শারীরিক উন্নতি হইতেছে না দেখিয়া চিকিৎসক-দের পরামর্শানুসারে মহারাজ স্বামিজীকে পাশ্চাত্য ভূখণ্ডে পুনরায় যাইতে অনুরোধ করিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন, সমুদ্রযাত্রায় তাঁহার স্বাস্থ্যের উন্নতি হইবে। স্বামিজীও ইহাতে সম্মত হইলেন। অবশেষে স্থির হইল তুরীয়ানন্দ স্বামী এবং নিবেদিতা তাঁহার সঙ্গে যাইবেন। ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ২০শে জুন স্বামিজী ইঁহাদের সমভিব্যাহারে মার্কিণ যাত্রা করিলেন। উক্ত তারিখেই স্বামিজী পূর্ব্বের উইলাদি নাকচ করিয়া মহারাজের নামে মঠ ও তৎসংক্রান্ত সম্পত্তি লিখিয়া দিলেন। তাঁহার গুরু-ভ্রাতারা সাক্ষীস্বরূপে উহাতে সহি করিলেন। মহারাজ ইহাতে সম্মত হইলেন না। পরে গুরুভ্রাতাদের ট্রাষ্টী নিয়োগ করাই পরামর্শসঙ্গত হইল। তদনুসারে আইনানুযায়ী দলিল প্রস্তুত হইলে ১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে আগষ্ট মাসের প্রথম ভাগে স্বামিজীর স্বাক্ষর সম্পাদন করিবার জন্য প্যারিসে প্রেরিত হইল। স্বামিজী

প্রচলিত আইনানুযায়ী ব্রিটিশ কন্সালের (British Consul) সম্মুখে উহা স্বাক্ষর করিয়া ফেরত পাঠাইলেন।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে ২৫শে আগষ্ট স্বামিজী সিষ্টার নিবেদিতাকে লিখিতেছেন, "Now I am free as I have kept no power or authority or position for me in the work. I also have resigned the Presidentship of the Ramakrishna Mission. The Math etc. belong now to the immediate disciples of Ramakrishna except myself. The Presidentship is now Brahmananda's—next it will fall on Premananda in turn.' অর্থাৎ আমি এখন স্বাধীন, যেহেতু কার্য্যতঃ আমি কোন ক্ষমতা কর্ত্তৃত্ব বা পদ রাখি নাই। রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতিত্বেও আমি ইস্তফা দিয়াছি। এখন আমি ব্যতীত রামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ শিষ্যেরাই মঠ প্রভৃতির অধিকারী। বর্ত্তমান সভাপতিত্ব ব্রহ্মানন্দের, পরে ইহা যথাক্রমে প্রেমানন্দের উপর পড়িবে।

কয়েক মাস পর ৯ই ডিসেম্বর রাত্রিতে স্বামিজী আমেরিকা ও ইউরোপ পর্য্যটন করিয়া বিনা সংবাদে হঠাৎ বেলুড় মঠে উপনীত হইলেন। তাঁহাকে আকস্মিকভাবে আসিতে দেখিয়া মঠের সকলেই অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। স্বামিজী একদিন মহারাজপ্রমুখ অন্তরঙ্গ গুরুভ্রাতাদিগকে বলিয়াছিলেন, "প্রথম বারে পাশ্চাত্য দেশে ওদের সঙ্ঘবদ্ধতা দেখে বড় ভাল লেগেছিল। কিন্তু এবার দেখলুম তাদের সব প্রতিষ্ঠানের ভিতর

ব্যবসাদারী বুদ্ধি, আর নিজ নিজ স্বার্থসিদ্ধিতে ভরে রয়েছে। স্ব স্ব প্রাধান্য আর ক্ষমতা-লোভে যেন সবাই ঘুরে বেড়াচ্ছে। গরীব দুর্ব্বলদের পিষে ফেলে ধনীরা নিজেদের সুখ সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যের যোগাড় করে নিচ্ছে। এই দেখে এবার জ্ঞান হল— ওসব যেন সাক্ষাৎ নরক।" অকপট হৃদয়ে নিঃস্বার্থ প্রেমকে ভিত্তি করিয়া যে মঠ ও মিশনের কার্য্য পরিচালিত হইতেছে, ইহা দেখিয়া তিনি সন্তুষ্ট হইলেন। মঠে আসিয়া কয়েকদিন পরে তিনি কাপ্তেন সেভিয়ারের মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া মায়াবতী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

মহারাজ এখন স্বামিজীর স্বাস্থ্যের জন্য বিশেষ উদ্বিগ্ন ও চিন্তিত হইলেন। মঠ-মিশনের কার্য্যের জন্য তাঁহাকে কোন প্রকার উদ্বেগ পাইতে না হয় সে বিষয়ে সতর্ক দৃষ্টি রাখিয়া মহারাজ সমুদায় কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। কিসে স্বামিজীর নষ্ট স্বাস্থ্যের উন্নতি হয়, কিসে তাঁহাকে কোন বিষয়ে চিন্তা না করিতে হয়, কিসে তাঁহার পরদুঃখ-কাতর মহান উদার মনকে পরিহিতকর কার্য্যের দ্বারা শান্ত রাখা যায়, ইহাই ছিল মহারাজের অহর্নিশ চিন্তা। প্লেগের সময় সেবাকার্য্যে অর্থ-সংগ্রহের প্রশ্ন উঠিলে স্বামিজী মঠের জমি বিক্রয় করিয়াও তাহা চালাইতে বলিয়াছিলেন, দরিদ্র অসহায়দিগের দুঃখ-কষ্ট দেখিয়া কখন কখন তিনি তাহাদের সেবার উদ্দেশ্যে মঠ প্রভৃতি সব বিক্রয় করিবার জন্য প্রবল ইচ্ছা প্রকাশ করিতেন। মহারাজ সেই সময়ে নানাস্থান হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া এই সব কার্য্য এমনভাবে চালাইতে লাগিলেন যে মঠ বা জমি বিক্রয়ের প্রশ্নই উঠিল না। মহারাজ নানা জনহিতকর কার্য্যের

দ্বারাই স্বামিজীর সাধ পূর্ণ করিয়া সঙ্ঘ ও মঠের উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন।

১৯০১ সনের ১০ই ফেব্রুয়ারী পূজ্যপাদ স্বামিজীর উপস্থিতি-তেই বেলুড় মঠের ট্রাষ্টী-গণের প্রথম সাধারণ সভায় মহারাজ সভাপতি ও স্বামী সারদানন্দ সম্পাদক নির্ব্বাচিত হইলেন। ইহার চারি দিন পূর্ব্বে অর্থাৎ ৬ই ফেব্রুয়ারী স্বামিজী ট্রাষ্ট ডিড রেজেষ্টারী করিয়া দিয়াছিলেন। কিছু দিন পরে স্বামিজী পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম অভিমুখে যাত্রা করিলেন। ব্রহ্মপুত্রে স্নান ও ৺কামাখ্যা পীঠ দর্শন করিয়া মে মাসের মধ্যভাগে তিনি ফিরিয়া আসিলেন। ঢাকা, গৌহাটি ও শিলং প্রভৃতি স্থানে সহস্র সহস্র লোক তাঁহাকে দর্শন করিয়াছিল এবং তাঁহার বক্তৃতা ও উপদেশ শুনিয়া কৃতার্থ হইয়াছিল। সর্ব্বত্রই তাঁহার আদর, অভ্যর্থনা ও অভিনন্দনের আয়োজন হইয়াছিল।

পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম পরিভ্রমণ করিবার পর স্বামিজীর স্বাস্থ্য আশঙ্কাজনক হইয়া পড়িল। ডাক্তার স্যাণ্ডার্স কোনপ্রকার দৈহিক ও মানসিক পরিশ্রম করিতে তাঁহাকে নিষেধ করিলেন।

১৯০১ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভেই স্বামিজী মঠ ও মিশনের সাধারণ সভাপতির পদ ত্যাগ করিয়া সমুদায় ভার মহারাজের উপর অর্পণ করিলেন। সর্ব্বসাধারণের সম্মুখে এখন তিনি সঙ্ঘনায়করূপে পরিচিত হইলেন।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

স্বামিজী ও মহারাজ

স্বামিজী ও মহারাজ প্রায় সমবয়স্ক। বয়সের হিসাবে স্বামিজী মহারাজের অপেক্ষা নয় দিনের বড়। শ্রীরামকৃষ্ণের সংস্পর্শে আসিবার পূর্ব্বে কিশোরকাল হইতে ইঁহারা ছিলেন ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ বন্ধু। কিন্তু দুইজনের প্রকৃতি ছিল ভিন্ন ধরণের। স্বামিজী ছিলেন দৃপ্তসিংহের মত তেজস্বী, সাগরের মত অপার গভীর জ্ঞান-বৈরাগ্য ও বিদ্যা-বুদ্ধির আধার, তারুণ্যশক্তির দুকূলপ্লাবী উত্তাল উদ্বেল তরঙ্গে সতত চঞ্চল; মহারাজ ছিলেন ধীর প্রশান্ত অচঞ্চল আকাশের মত উদার, অপরিমেয়, অসীম ভাবতন্ময়, কমনীয় বালস্বভাবের মাধুর্য্যে কোমল। একজন ছিলেন প্রচণ্ড আধ্যাত্মিক কর্ম্মশক্তির দীপ্যমান ভাস্কর, অপরে ছিলেন অন্তর্মুখী ভাবদ্যুতির বিমল স্নিগ্ধ জ্যোতি। একজনের বাণী প্রাণস্পর্শী বিদ্যুদ্বাহী শক্তিকণা, অপরের অন্তঃসলিলা ফল্গুর পূত প্রবাহ। একজনের বিশাল আকর্ণবিস্তৃত নয়নে বিশ্বগ্রাসী প্রেমপূর্ণ প্রখর দিব্যতেজ, অপরের ধ্যানস্তিমিত লোচনে সকরুণ, অপার্থিব, ঠাকুরের কথায়—"ফ্যালফেলে দৃষ্টি, যেন ডিমে তা দিচ্চে"। এই দুই বিরাট পুরুষের হৃদয় এক অটুট অপরিচ্ছেদ্য প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ। উভয়ে উভয়ের প্রতি অগাধ বিশ্বাস, অপরিসীম ভালবাসা ও গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করিতেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ ও তাঁহার সঙ্ঘ ইঁহাদের ছিল ধ্যান, জ্ঞান ও প্রাণ;

উহার প্রচারে ও বিস্তারে ইঁহারা আধ্যাত্মিক ভাণ্ডারের অপূর্ব্ব রত্ন-সমূহ জগতের হিতকল্পে এবং ত্রিতাপদগ্ধ জীবের প্রতি প্রবল অনুকম্পায় দুই হস্তে অকুণ্ঠিতভাবে বিতরণ করিয়াছেন। সমগ্র মনুষ্যজাতিকে ইহা দিবার জন্য ইঁহারা ব্যাকুল হইয়া বেড়াইয়াছেন।

স্বামিজী ও মহারাজের পরস্পরের আচরণ ও ব্যবহার অত্যন্ত মাধুর্য্যমিশ্রিত ছিল। ইঁহাদের হাস্য-পরিহাস যেমন কৌতুকপ্রদ, আবার প্রেমকলহ বা স্বামিজীর ভৎর্সনা তেমনি এক মধুর রসে অনুরঞ্জিত থাকিত। এই সকলের অন্তরালে উভয়ের মধ্যে একটা প্রচ্ছন্ন গভীর প্রেম ও দিব্যভাব পরিস্ফুট হইয়া উঠিত।

স্বামিজী ব্যঙ্গ করিয়া মহারাজকে একবার লিখিয়াছিলেন, "তুমি ত রাজা হে, তোমার মন্ত্রিবর্গ হচ্ছে ন্যাংটা পোঁদা চার বৎসরের বাগবাজারের ছেলেগুলো, আমার তোমা অপেক্ষাও যত কাপুরুষ-দল।" এই রঙ্গরহস্য ছাড়া কারণে অকারণে স্বামিজীর অনেক তিরস্কার মহারাজকে শুনিতে হইত, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। এখানে তাহার দুই চারিটী ঘটনা উল্লেখ করিলে তাঁহার মধ্যে যে কিরূপ মাধুর্য্য ও গভীর ভালবাসা নিহিত ছিল তাহা কতকটা বুঝা যাইবে।

একবার বলরামবাবুর গৃহে স্বামিজী ও মহারাজ একসঙ্গে ছিলেন; একদিন স্বামিজীর বাল্যকালের পুরাতন দাসী আসিয়া তথায় উপস্থিত হয়। স্বামিজী সেই সময় বহুমূত্র রোগে অত্যন্ত পীড়িত, এবং প্রায় সমস্ত রাত্রি তাঁহার অনিদ্রায় কাটিত। মহারাজ অতি সতর্ক হইয়া তাঁহার তত্ত্বাবধান করিতেন। দাসী

আসিয়া মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিল, "নরেন কোথায় ?" মহারাজ দ্বারের পার্শ্বে উঁকি মারিয়া দেখিলেন স্বামিজী নিদ্রা যাইতে-ছেন। তাঁহার এই অসুস্থ অবস্থায় তিনি নিদ্রা ভঙ্গ করা অনুচিত মনে করিলেন। দাসীকে তাহা বুঝাইয়া বলিলে সে চলিয়া গেল। স্বামিজী ঘুম হইতে উঠিলে মহারাজ তাঁহাকে বলিলেন, "তোমাদের পুরানো ঝি এসেছিল, তুমি ঘুমুচ্ছ শুনে চলে গেলে।" ইহা শুনিয়া ক্রোধে স্বামিজীর মুখমণ্ডল আরক্তিম হইল। তিনি অতি কর্কশ বাক্যে মহারাজকে তিরস্কার করিলেন। স্বামিজী ভাবিলেন, বোধ হয় তাঁহার মাতা বিশেষ কোন কারণে তাঁহাদের ঝিকে তাঁহার নিকট পাঠাইয়া-ছিলেন, বৃথা তাহাকে 'রাজা' ফিরাইয়া দিয়াছেন। স্বামিজী গম্ভীর মুখে তৎক্ষণাৎ একটী গাড়ী আনাইয়া মাতার নিকট চলিয়া গেলেন। স্বামিজী তথায় পৌঁছিয়াই ব্যস্তভাবে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, তুমি ঝিকে কেন পাঠিয়েছিলে ?" মা সবিস্ময়ে স্বামিজীকে বলিলেন, "না, ঝিকে তো আমি তোর কাছে পাঠাইনি।" স্বামিজী অমনি তাঁহার পুরাতন দাসীকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁরে, তুই আমার কাছে গিয়েছিলি কেন ?" সে উত্তরে বলিল, "আমি বাগবাজার চিৎপুর অঞ্চলে বেড়াতে গিয়েছিলুম, ভাবলুম একবার নরেনকে দেখে আসি। রাখাল আমাকে বল্লে তুমি ঘুমুচ্ছ, তাই ফিরে চলে এলুম।" বৃদ্ধার কথা শুনিয়া স্বামিজীর চক্ষু হইতে অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িল। তিনি সজলনয়নে তাঁহার মাতাকে সব কথা খুলিয়া বলিলেন এবং তাঁহার নাম করিয়া রাখালকে গাড়ী পাঠাইয়া ডাকিয়া আনিতে অনুরোধ

করিলেন। মাতা পুত্রের কথামত গাড়ী পাঠাইয়া দিলেন। স্বামিজী মহারাজের আসার প্রতীক্ষায় সেই বাড়ীতে অবস্থান করিতে লাগিলেন। মহারাজ উপস্থিত হইলে স্বামিজী ব্যথিত ও অনুতপ্ত কণ্ঠে তাঁহাকে বলিলেন, "রাজা, বড় অন্যায় করেছি। তোকে শুধু শুধু গালাগাল দিয়েছি। কেবল তুই বলেই আমি ওরকম কটু কথা বলতে পেরেছি।" মহারাজ হাসিয়া সব উড়াইয়া দিলেন এবং সরল বাক্যে স্বামিজীকে উৎফুল্ল করিতে লাগিলেন।

এইরূপ আর একটী ঘটনার কথা পূজ্যপাদ স্বামী বিজ্ঞানানন্দ উল্লেখ করিয়াছেন। বেলুড় মঠে গঙ্গার ধারের কতকাংশে পোস্তা বাঁধিয়া একটী ঘাট নির্ম্মাণ করিবার স্বামিজীর ইচ্ছা হইয়াছিল। তিনি তাঁহাকে একটী প্ল্যান ও খরচ-পত্রাদির একটী আনুমানিক এষ্টিমেট করিতে বলেন। বিজ্ঞানানন্দ প্ল্যান-সহ ভয়ে ভয়ে কম করিয়া তিন হাজার টাকা ব্যয়ের আনুমানিক হিসাব তৈয়ার করিয়া স্বামিজীর নিকট দিলেন। স্বামিজী অত্যন্ত খুশি হইয়া মহারাজকে ডাকিয়া বলিলেন, "কি বল রাজা, এই সামনাটাতে একটা ঘাট ও পোস্তা হলে বেশ হবে। 'পেসন' তো বলছে যে তিন হাজার টাকায় হয়ে যাবে। তুমি বল ত কাজ সুরু হতে পারে।" মহারাজ উত্তরে বলিলেন, "তিন হাজার টাকায় হয় তো তা যোগাড় হয়ে যাবে।" স্বামিজীর ইচ্ছানুযায়ী মহারাজ ভিত্তি স্থাপন করিলেন। মহারাজ অর্থাদি সংগ্রহ করিয়া নির্ম্মাণ-কার্য্য পরিদর্শন করিয়া রীতিমত হিসাবপত্র রাখিতেন। বিজ্ঞানানন্দ দেখিলেন তিনি যে এষ্টিমেট দিয়াছিলেন তার অনেক বেশী খরচ হইবে। তিনি ভয়ে ভয়ে মহারাজকে তাহা জানাইলেন। মহারাজ

তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন, "তার আর কি করা যাবে? কাজে যখন হাত দেওয়া হয়েছে, যে করেই হোক শেষ করতেই হবে। তুমি তার জন্য ভেব না। কাজ যাতে ভাল ভাবে হয়, তাই তুমি কর।" একদিন স্বামিজী মহারাজের নিকট হিসাব দেখিতে গিয়া দেখিলেন যে, তিন হাজারের ঢের বেশী টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে, অথচ কাজ শেষ হইতে এখনও অনেক বাকি। স্বামিজী অকথ্য ভাষায় মহারাজকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন। গালি দিবার সময় স্বামিজীর কথার কোন বাঁধন থাকিত না। মহারাজ নীরবে গম্ভীর হইয়া সব গালাগালি শুনিয়া যাইতে লাগিলেন। স্বামিজী চলিয়া যাইবার পর মহারাজ তাঁহার স্বীয় কক্ষে গিয়া দরজা বন্ধ করিলেন। কিছুক্ষণ পরে স্বামিজী বিজ্ঞানানন্দকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখত পেসন, রাজা কি করছে?" তিনি মহারাজের ঘরের কাছে গিয়া দেখিলেন যে দরজা জানালা বন্ধ। দুই একবার "মহারাজ" "মহারাজ" বলিয়া ডাকিলেন—কোন সাড়া না পাইয়া তিনি স্বামিজীকে তাহা জানাইলেন। স্বামিজী খুব উত্তেজিত হইয়া বিজ্ঞানানন্দকে ধমক দিয়া বলিলেন, "তুই তো ভারি বোকা! তোকে বললুম দেখতে রাজা কি করছে, আর তুই কিনা এসে বলছিস তার ঘরের জানালা দরজা সব বন্ধ! দেখ শিগগির রাজা কি করছে? বিজ্ঞানানন্দ তাড়াতাড়ি মহারাজের ঘরের সম্মুখে আসিয়া তাঁহাকে ডাকিয়া কোন সাড়া পাইলেন না। আস্তে আস্তে তিনি দরজা খুলিয়া দেখেন যে মহারাজ বিছানার উপর বালিশে মুখ গুঁজিয়া ফোঁপাইয়া কাঁদিতে-ছেন। তিনি ধীরে ধীরে মহারাজের নিকটে আসিয়া বলিলেন,

"মহারাজ, আপনি আমার জন্য এত কষ্ট পেলেন।" মহারাজ তখনও কাঁদিতেছিলেন। আস্তে আস্তে মুখ তুলিয়া তিনি বিজ্ঞানানন্দকে বলিলেন, "দেখত হরিপ্রসন্ন, আমার কি দোষ বল ত? অথচ এক এক সময় এমন কড়া কথা বলে যে তা আর সহ্য হয় না। এক একবার মনে হয় সব ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে চলে যাই পাহাড়ে।"

বিজ্ঞানানন্দ স্বামিজীকে জানাইলেন যে মহারাজ বিছানায় শুইয়া কাঁদিতেছেন। শুনিবামাত্র স্বামিজী উন্মত্তের মত দৌড়াইয়া মহারাজের ঘরের দিকে গেলেন। ঘরে প্রবেশ করিয়াই স্বামিজী মহারাজকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন, "রাজা, রাজা, আমায় ক্ষমা কর। আমি কি অন্যায় না করেছি! তোমায় গালাগাল করেছি—আমায় ক্ষমা কর।" স্বামিজীর কান্না দেখিয়া মহারাজ একেবারে হতভম্ব হইয়া গেলেন। তিনি স্বামিজীকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন, "তুমি অমন করছ কেন? আমায় গালাগাল দিয়েছ—তাতে হয়েছে কি? তুমি ভালবাস, তাইত এইসব বলেছ।" স্বামিজী তখনও মহারাজকে বুকে জড়াইয়া আছেন। মহারাজের এই সান্ত্বনাবাক্য শুনিয়াও তিনি বলিলেন, "না, না, তুমি আমায় ক্ষমা কর। তোমায় ঠাকুর কত আদর করতেন, কখন তোমায় তিনি একটা কড়া কথা বলেন নি। আর আমি কি না ছাই কাজের জন্য তোমায় গালাগাল করলুম—তোমার মনে কষ্ট দিলুম। আমি আর তোমাদের সঙ্গে থাকবার যোগ্য নই। চলে যাই হিমালয়ে—কোথাও গিয়ে নির্জ্জনে থাকব।" মহারাজ অমনি বলিয়া উঠিলেন, "সে কি,

তোমার গালাগাল যে আমাদের আশীর্ব্বাদ। তুমি কোথায় চলে যাবে? তুমি আমাদের মাথা। তুমি চলে গেলে আমরা কি নিয়ে থাকব?"

এই ভাবে দুই বন্ধু পরস্পর পরস্পরকে সান্ত্বনা দিতে দিতে শান্ত হইলেন।

একবার কোন প্রসঙ্গে ঋষিদের সম্বন্ধে স্বামিজীর কোন মন্তব্যের যথার্থ মর্ম্ম বুঝিতে না পারিয়া বিজ্ঞানানন্দ উত্তেজিত কণ্ঠে তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "আপনি কি তাঁদের চাইতে বড়? তাঁদের তুলনায় আপনি নগণ্য।" ইহা শুনিয়া স্বামিজী আরক্তিম মুখমণ্ডলে গম্ভীর ভাবে নীরবে বসিয়া রহিলেন। মহারাজ তাঁহাদের নিকটেই পাদচারণা করিতেছিলেন। স্বামিজী তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলেন, "রাজা, পেসন বলে আমি কিছুই বুঝি না, আমি নগণ্য।" মহারাজ অমনি উত্তরে বলিলেন, "পেসনের কথা কি ধর্ত্তব্যের মধ্যে, ও তো ছেলে মানুষ, ও কি বোঝে? ও কি বলতে কি বলে ফেলেছে।" বিজ্ঞানানন্দ বলেন, "মহারাজের কথায় স্বামিজী অমনি ঠাণ্ডা হয়ে গেলেন।"

অন্য একদিন স্বামিজীর কোন কার্য্য মনঃপূত না হওয়াতে তিনি মহারাজকে যথেষ্ট তিরস্কার করিলেন। মহারাজ সবই নীরবে সহ্য করিলেন। তিনি স্বামিজীর সহিত কোন বাদানুবাদ বা তর্ক করিতেন না—ইহার কারণ স্বামিজীর স্বাস্থ্য। কোনরূপ উত্তেজনা বা দুশ্চিন্তা স্বামিজীর স্বাস্থ্যের উন্নতির পক্ষে অন্তরায় —ইহা মনে করিয়া তিনি সর্ব্বদা সতর্ক হইয়া চলিতেন। তাঁহার গালাগালি বা তিরস্কার অঙ্গের ভূষণ বলিয়া মহারাজ মনে করিতেন।

যদি স্বামিজীর কথন কোন বাক্য বা ব্যবহার তাঁহাকে আঘাত করিত তবে তিনি নিঃশব্দে কোথাও বসিয়া থাকিতেন বা অশ্রুমোচন করিয়া তাহা সহ্য করিয়া লইতেন। স্বামিজীর স্বভাব, গভীর প্রাণঢালা ভালবাসা, অকৃত্রিম সৌহৃদ্য এবং তাঁহার মেজাজ ও ভাষা মহারাজ কৈশোর বয়স হইতেই জানিতেন। তাই মহারাজ তাহাতে বিচলিত হইতেন না, কিন্তু অন্তরে অন্তরে অনুভব করিতে লাগিলেন, পীড়ার জন্যই স্বামিজীকে রুক্ষ ও খিটখিটে করিয়া তুলিয়াছে। যাহা হউক, সেদিনকার তিরস্কারের পর মহারাজকে কার্য্যানুরোধে কলিকাতায় গিয়া কয়েকদিন বলরামবাবুর গৃহে থাকিতে হইয়াছিল। এদিকে স্বামিজী রাজাকে মঠে না দেখিতে পাইয়া অস্থির হইলেন। বিশেষ তাঁহাকে রূঢ়ভাষায় গালাগালি দিবার পর স্বামিজীর মনে অনুতাপ হইতেছিল। মহারাজ মঠে আসিতেছেন না দেখিয়া তিনি কলিকাতায় গমন করিলেন এবং পথে খাবারের দোকান হইতে উৎকৃষ্ট মিষ্টদ্রব্য কিনিয়া বলরামবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইলেন। তথায় মহারাজকে দেখিয়াই সোল্লাসে স্বামিজী উচ্চকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, "রাজা, তোর জন্য এই খাবার নিয়ে এয়েছি—তুই খা।" মহারাজ এই প্রীতি উপহার সাগ্রহে গ্রহণ করিলেন। তাঁহারা হাস্য কৌতুক রঙ্গে সেদিন কাটাইয়া পরদিন উভয়েই মঠে ফিরিয়া আসিলেন। এইরূপ প্রীতি—শুধু প্রীতি নয়—গভীর অগাধ অপরূপ প্রেম জগতে দুর্লভ।

একবার স্বামিজী বিশেষ ভাবে তিরস্কার করায় মহারাজ ক্ষুণ্ণমনে মঠ হইতে চলিয়া যাইবার জন্য ফটকের দিকে অগ্রসর

হইতেছিলেন, কিন্তু বেলতলা দেখিয়া তথায় বসিয়া পড়িলেন। মহারাজ কিছুকাল ধ্যানমগ্ন হইয়া থাকিবার পর তাঁহার অন্তর প্রসন্ন হইল—যে বিষাদমেঘ পুঞ্জীভূত হইতেছিল, তাহা কোথায় ভাসিয়া গেল! এই মঠ, সঙ্ঘ সব যে ঠাকুরের—তিনি যে স্বয়ং এখানে আছেন, ইহা ফেলিয়া তিনি কোথায় যাইবেন? তখন তাঁহার মনে হইল, স্বামিজীর বকাবকিতে কি আসে যায়? "সে বকেছে তো হয়েছে কি?" হাস্যমুখে তিনি মঠ-গৃহে প্রবেশ করিলেন।

মহারাজ জানিতেন স্বামিজী রূঢ় বা কটু কথা বলিয়া গালাগালি দিলেও তাঁহার অন্তরে অগাধ ভালবাসা। স্বামিজী তাঁহাকে এক পত্রে লিখিয়াছিলেন, "You know my heart, whatever my lips may say"—অর্থাৎ আমি মুখে যাই বলি না কেন তুমি আমার অন্তর জান। স্বামিজী তাঁহার আকৈশোর বন্ধু এবং সর্ব্বোপরি ঠাকুরের সহস্রদলকমল। পক্ষান্তরে স্বামিজীও জানিতেন যে মহারাজ তাঁহার বাল্যকাল হইতে অকপট বন্ধু, আজীবন অচ্ছেদ্য প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ, অসাধারণ ধৈর্য্য ও সহ্য-শক্তির প্রতীক এবং তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রেমাস্পদ ঠাকুরের বড় আদরের রাখালরাজ। তাই স্বামিজী সকলের সম্মুখে মুক্তকণ্ঠে বলিতেন, "আমাকে সবাই ত্যাগ করতে পারে কিন্তু আমি জানি, রাজা আমাকে কখন ছাড়বে না। আর দুনিয়ায় যদি কেউ আমার গালাগাল সহ্য করে থাকে—সে একমাত্র রাজা।"

স্বামিজীর স্বাস্থ্য সম্পূর্ণ নষ্ট হইয়া যাওয়াতে মহারাজ কোন কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে সতর্ক হইয়া যাইতেন। এমন কি

তাঁহাকে দেখিলে স্বামিজী আবার ঐ সব বিষয়ের প্রসঙ্গ নিজেই উত্থাপন করেন, তাই আশঙ্কায় অনেক সময় তাঁহার সহিত দেখা-সাক্ষাৎ করিতেন না বা তাঁহাকে এড়াইয়া চলিতেন। যাইবার সময় শিষ্য-সেবকদের প্রায়ই তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন, "এখন স্বামিজীর মেজাজ কেমন?" ইহাতে কেহ কেহ মনে করেন যে মহারাজ বোধ হয় স্বামিজীর গালাগালির ভয়ে তাঁহার নিকট যাইতে সাহসী হইতেন না। কিন্তু স্বামিজীর শারীরিক অবস্থা দেখিয়াই তিনি এরূপ করিতেন। তাঁহার মত নীরবে স্বামিজীর তিরস্কার অপর কাহাকেও সহ্য করিতে হয় নাই। পীড়াতে ভুগিতে ভুগিতে এবং অনবরত গুরুতর কঠোর মানসিক ও শারীরিক পরিশ্রমে স্বামিজীর অবস্থা এমন হইয়াছিল যে তিনি যাহা বলিতেন বা আদেশ করিতেন তাহা তৎক্ষণাৎ প্রতি বর্ণে পালিত না হইলে একেবারে অধৈর্য্য হইয়া পড়িতেন। সে সময়ে তাঁহার যাহা মুখে আসিত তাহাই বলিতেন। কিন্তু এইরূপ উত্তেজনায় তাঁহার শরীর আরও ভাঙ্গিয়া পড়িত। ইহা ব্যাধির একটী লক্ষণ। নতুবা স্বামিজীর মত প্রেমভরা হৃদয়ের কি তুলনা হয়? মহারাজের কথা দূরে থাকুক, যাঁহারা তাঁহার তিরস্কার-লাভেরও সৌভাগ্য পাইয়াছেন, তাঁহারা অন্তরে অন্তরে মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতেন যে ইহা তাঁহার অগাধ প্রেমেরই একটা বাহ্য আকার। ইহা গালাগালি নহে—প্রেমের পূর্ণ অভিব্যক্তি। মহারাজ তাহা জানিতেন বলিয়াই তাঁহার কোন মানসিক বিকার বা চাঞ্চল্য ঘটিলে তৎক্ষণাৎ তাহা শান্ত হইয়া যাইত।

স্বামিজী দেহের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া অহর্নিশ কেবল

জীবহিতকল্পে চিন্তা করিতেন। সকলের দুঃখ মোচন তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী হইতে পারিতেছে না বলিয়াই নিজের ভগ্ন স্বাস্থ্যের দরুণ উত্তেজিত হইতেন এবং তাঁহার মানসিক দুঃখজনিত উত্তেজনা ক্রোধের আকারে সময়ে সময়ে বাহির হইয়া পড়িত। সর্ব্বাপেক্ষা যিনি প্রিয়তম বন্ধু ও সুহৃৎ, তাঁহাকেই ইহা সহ্য করিতে হইত। তাই স্বামিজী মহারাজকে লিখিয়াছিলেন, "তবে তুমি আমার সব সহ্য করবে আমি জানি ও মঠে আর কেউ নেই যে সইবে!"

১৯০১ খৃষ্টাব্দে সেপ্টেম্বর মাসে স্বামিজী তাঁহার কোন পাশ্চাত্য শিষ্যকে নিম্নলিখিত মর্ম্মে লিখিয়াছিলেন, "মঠের প্রাঙ্গণে জল-নিকাশের জন্য একটী নর্দ্দমা কাটার সাহায্য করে এই ফিরছি। কোথাও কোথাও বৃষ্টির জল কয়েক ফুট উঁচু হয়ে জমেছে। আমার বড় সারসটী আনন্দে ভরপুর, পাঁতিহাস, রাজহাঁসদের তেমনি আনন্দ। মঠ থেকে হরিণটী পালিয়ে যাওয়ায় তার খোঁজে আমাদের কয়েকদিন কেটেছে। দুঃখের বিষয় গতকল্য একটী হাঁস মারা গেছে। আমাদের একজন পুরাণো সুরসিক সাধু বলছেন, 'মশায়, এই কলিযুগে বৃষ্টিতে ঠাণ্ডা লেগে যখন হাঁসের সর্দ্দি হয় আর ব্যাং হাঁচতে থাকে তখন আমাদের বেঁচে থাকা বৃথা।' একটী রাজহাঁসের সব পালক পড়ে গিয়েছে। কোন উপায় না দেখে অল্প মাত্রায় কারবলিক মিশিয়ে এক টব জলে কয়েক মিনিট চুবিয়ে রেখেছিলাম—এতে মরুক কি সারুক এই মনে করে। এখন সে বেশ সেরে উঠেছে।"

মহারাজের বাল্যকাল হইতে ফল ফুল বৃক্ষলতার দিকে অত্যন্ত

প্রীতি ছিল। তিনি আগ্রহের সহিত মঠের বাগানে ফলফুল শাকসবজি তত্ত্বাবধান করিতেন। আবার এদিকে স্বামিজীও ছেলেবেলায় জীবজন্তু প্রভৃতি ভালবাসিতেন। এই সময়ে তিনি মঠে গাভী, হাঁস, কুকুর, ছাগল, সারস, হরিণ ও লালমাছ প্রভৃতি আনিয়া রাখিয়াছিলেন এবং বাঘা, মটরু, হংসী প্রভৃতি নামে তাহাদিগকে ডাকিতেন। তিনি পাঁচ বৎসরের বালকের ন্যায় তাহাদের সহিত খেলা ও দৌড়াদুড়ি করিতেন।

এই সময়ে একদিন হাবড়ার কালেক্টর কুক সাহেব কোন কার্য্যোপলক্ষে দুপুর বেলা মঠে আসেন। সাহেব ফটকে প্রবেশ করিতেই সারসটী ডাকিয়া উঠিল এবং তাহার ডাক শুনিয়া কুকুরটীও তথায় উপস্থিত হইল। একপার্শ্বে সারস ও অপর পার্শ্বে কুকুর সহ সাহেব মাঠ পার হইয়া মঠগৃহের নিকট আসিয়া উপনীত হইলে স্বামিজী ও মহারাজ প্রভৃতি তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। কুক সাহেব বলিলেন, "আপনাদের পূর্ব্বেই সারস ও কুকুর আমাকে অভিবাদন করিয়া সঙ্গে লইয়া আসিয়াছে। জীবনে এমন সাদর অভ্যর্থনা কখনও পাই নাই।"

মঠের বাগানের পার্শ্বে খোলা মাঠজমিতে স্বামিজীর গাভী, ছাগল প্রভৃতি চরিয়া বেড়াইত। স্বামিজী ও মহারাজ এই মাঠ এবং বাগানের একটী সীমা বিভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। যদি স্বামিজীর গাভী, ছাগল প্রভৃতি উক্ত সীমা অতিক্রম করিয়া বাগানে আসিত তবে মহারাজ অনধিকার প্রবেশ লইয়া প্রবল আপত্তি তুলিতেন। ইহা লইয়া তাঁহাদের মধ্যে তুমুল প্রেমকলহ উপস্থিত হইত। পরস্পরের এই অদ্ভুত বালকবৎ

আচরণে তাঁহাদের গুরুভ্রাতারা এবং মঠের সাধু-ব্রহ্মচারীরা আনন্দে আপ্লুত হইতেন। মনে হইত যেন দুইটি দিব্যভাবাপন্ন বালক অপরূপ খেলায় মত্ত হইয়াছেন। ইঁহাদের একজন বিশ্ব-বিজয়ী আচার্য্যশ্রেষ্ঠ স্বামী বিবেকানন্দ এবং অন্যজন মঠ-মিশনের সঙ্ঘনায়ক স্বামী ব্রহ্মানন্দ। দুইজনেই প্রায় প্রৌঢ়-সীমায় উপনীত। অথচ ইঁহাদের দুইজনের বালকের মত বাহ্যিক প্রীতি-কলহের অন্তরালে কি গভীর প্রেম প্রকাশ পাইত! হায়! এই মাধুর্য্যময় ক্রীড়া বেশী দিন স্থায়ী হইল না!

১৯০১ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার চার পাঁচ দিন পূর্ব্বে মহারাজ মঠের সম্মুখে বসিয়া সহসা দেখিলেন, যেন মা দুর্গা দক্ষিণেশ্বরের দিক হইতে গঙ্গাবক্ষে চলিয়া মঠের বিল্বতলায় গিয়া উঠিলেন। এই সময়ে কলিকাতা হইতে স্বামিজী নৌকা করিয়া মঠে আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজা কোথায়?" মহারাজকে দেখিতে পাইয়াই বলিলেন, "এবার প্রতিমা আনিয়া মঠে দুর্গাপূজা করতে হবে, সব আয়োজন কর।" মহারাজ বলিলেন, "তোমাকে দুদিন পরে কথা দেব—এখন প্রতিমা পাওয়া যায় কি না দেখতে হবে—সময় একেবারে সংক্ষেপ, দুটো দিন সময় দাও।" স্বামিজী তাঁহাকে তখন বলিলেন যে তিনি ভাবচক্ষে দেখিয়াছেন, মঠে দুর্গোৎসব হইতেছে এবং প্রতিমায় মার পূজা হইতেছে। মহারাজও তাঁহাকে তাঁহার নিজ দর্শনের কথা সবিস্তার বলিলেন। মঠে ইহা শুনিয়া হৈ চৈ পড়িয়া গেল। ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলালকে মহারাজ প্রতিমার সন্ধানে কলিকাতায় কুমারটুলীতে পাঠাইলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়, কৃষ্ণলাল

তথায় গিয়া দেখিলেন একটী মাত্র সুন্দর প্রতিমা তৈয়ারী হইয়া রহিয়াছে। তিনি কারিগরকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন যে যিনি উহা তাহাকে নির্ম্মাণ করিতে দিয়াছিলেন তিনি কোন কারণে এখন পর্য্যন্ত ইহা লইতে পারেন নাই। কৃষ্ণলাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এই প্রতিমাটী আমাদিগকে দিতে পার কি না?" কারিগর বলিল, "কাল আপনাকে বলব।" ইহা শুনিয়া কৃষ্ণলাল স্বামিজী ও মহারাজকে সমুদায় বৃত্তান্ত বলিলেন। স্বামিজী কৃষ্ণলালকে বলিলেন, "যেমন করেই হোক প্রতিমাখানি নিয়ে আসবে।" আশ্চর্য্যের বিষয়, যিনি ফরমাশ দিয়াছিলেন তিনি প্রতিমা লইতে আসিলেন না। প্রতিমা পাওয়া যাইবে শুনিয়া স্বামিজী মহারাজকে পূজার সমুদায় আয়োজন ও ব্যবস্থা করিতে বলিলেন।

পূজ্যপাদ প্রেমানন্দ স্বামী ব্রহ্মচারী কৃষ্ণলালকে লইয়া কলিকাতায় সর্ব্বাগ্রে শ্রীশ্রীমার নিকট গিয়া তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী তখন ১৬নং বোসপাড়া লেনে বাস করিতেন। তিনি সানন্দচিত্তে অনুমতি দিলেন। প্রেমানন্দ উক্ত প্রতিমার বায়না দিয়া কথাবার্ত্তা স্থির করিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই মহারাজ যথাবিধি পূজার আয়োজন ও প্রচুর দ্রব্যসম্ভারের ব্যবস্থা করিয়া ফেলিলেন। রামকৃষ্ণানন্দের পিতৃদেব সুপ্রসিদ্ধ তান্ত্রিকসাধক ঈশ্বরচন্দ্র তন্ত্রধারকের কাজ করিলেন। শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার মহোৎসবে বেলুড় মঠ মুখরিত হইল। ষষ্ঠীর দিন কলিকাতা হইতে প্রতিমা আনিয়া মঠের বিল্বমূলে বোধন হইল। মহাসমারোহে দুর্গোৎসবের চারদিন কাটিয়া গেল। হাজার হাজার

নর-নারী মঠে পূজা দর্শন করিয়া প্রসাদ ধারণ করিলেন। ষষ্ঠী হইতে পূজার কয়েকদিন শ্রীশ্রীমা শ্রীশ্রীঠাকুরের মেয়ে ভক্তদের সহিত মঠের সন্নিকটে নীলাম্বর বাবুর বাড়ীতে রহিলেন। তাঁহার নামেই সংকল্প করিয়া পূজা হইল এবং তাঁহার আদেশে পূজায় ছাগবলি হইল না। শ্রীশ্রীবিজয়া দশমীর দিন বিসর্জ্জনের জন্য যখন প্রতিমা নৌকায় উঠান হইল এবং ব্যাণ্ড প্রভৃতি নানাবিধ বাজনা বাজিতে লাগিল, মহারাজ তখন একটী বৃন্দাবনী চাদরের গাঁতি বাঁধিয়া সেই নৌকায় আরোহণ করিলেন। প্রতিমার সম্মুখে ভাবে বিভোর হইয়া তিনি তালে তালে মধুর নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই অপূর্ব্ব ভাব ও মনোরম নৃত্য দেখিয়া সকলে বিমুগ্ধ নেত্রে চাহিয়া থাকিলেন। অসুস্থ দেহে স্বামিজী মঠের উপরের বারান্দায় দাঁড়াইয়া পরমানন্দে অপলক নেত্রে তন্ময়ভাবে মহারাজের সেই অদ্ভুত মধুর নৃত্য দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার সেই ভাববিহ্বল মাতোয়ারা নৃত্যে চারিদিকে এক অপার্থিব আনন্দের তরঙ্গ উঠিল। দর্শকদিগের বোধ হইল যেন শ্রীশ্রীমহামায়ীর সম্মুখে সত্য সত্যই ব্রজের রাখালরাজ পরমপুলকে আত্মহারা হইয়া নৃত্য করিতেছেন!

পূজা নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইলে স্বামিজী সকলের সম্মুখে নিখুঁত ব্যবস্থা ও বিরাট আয়োজনের জন্য মুক্তকণ্ঠে রাজার ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন। সেই বৎসর মঠে প্রতিমা আনিয়া শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপূজা ও শ্রীশ্রীকালীপূজার আয়োজন হইয়াছিল। এই সব অনুষ্ঠানে মঠে আনন্দময় মহাপুরুষদের সংস্রবে একটা অপূর্ব্ব আনন্দের তরঙ্গ প্রবাহিত হইত। যাঁহারা সে পূজা দেখিয়াছেন

তাঁহারা কৃতার্থ বোধ করিয়াছেন। সে স্বর্গীয় ভাবের আনন্দোচ্ছ্বাস আর কোথাও সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না।

এই সব পূজার্চ্চনার পর নভেম্বর মাসের শেষ ভাগে স্বামিজী গুরুতরভাবে পীড়িত হইয়া পড়েন। ব্যাধির বিশেষ উপশম হইলে তিনি ৺কাশীধামে কিছুদিন বাস করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তথায় 'গোপাল লাল ভিলা' নামক একটী বাড়ী স্বামিজীর বাস করিবার জন্য স্থির করা হইল। এই সময়ে প্রসিদ্ধ জাপানী ওকাকুরা স্বামিজীকে একসঙ্গে বুদ্ধগয়ায় যাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। তিনিও তাহাতে সম্মত হইলেন। স্বামিজী বলিলেন যে বুদ্ধগয়া হইয়া ৺কাশীধামে কয়েকদিন তিনি বাস করিবেন। সেইরূপ বন্দোবস্ত হইল।

১৯০২ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে স্বামিজী ওডা, ওকাকুরা, নিবেদিতা এবং ধর্ম্মপালকে সঙ্গে লইয়া বুদ্ধগয়ায় যাত্রা করিলেন। পরে তিনি তথা হইতে কাশীধামে গেলেন। পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট গোপাল লাল ভিলায় তিনি বাস করিয়া প্রথমে বেশ সুস্থ বোধ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে স্বামিজীর ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া বারাণসীধামে কয়েকজন যুবক "কাশী দরিদ্র-দুঃখ-প্রতিকার সমিতি বা Benares Poor Men's Relief Association" নামে একটি প্রতিষ্ঠান পূর্ব্বেই স্থাপন করিয়া দরিদ্র রুগ্ন ও আর্ত্তের সেবা করিত। তাঁহারা স্বামিজীর বাসভবন গোপাল লাল ভিলায় গিয়া তাহাদের কার্য্যপ্রণালী সমুদায় তাঁহাকে জানাইল। স্বামিজী উক্ত নাম পরিবর্ত্তন করিয়া Benares Home Of Service রাখিতে বলিলেন। তিনি ইহাদের উৎসাহ, উদ্যম এবং

কার্য্যের বিবরণ শুনিয়া এতদূর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন যে বেলুড় মঠে 'মহারাজকে এই বিষয়ে সমুদায় জানাইয়া বলিয়াছিলেন, "রাজা, এই প্রতিষ্ঠানটীর উপর তোমার দৃষ্টি রেখো।" ইহাই পরে মহারাজের যত্নে ও চেষ্টায় সুবিখ্যাত 'কাশী রামকৃষ্ণ মিশন হোম অব্ সার্ভিস' (সেবাশ্রম) নামে সর্ব্বত্র বিদিত হইয়াছে।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারীর শেষ ভাগে কাশীধামে স্বামিজী পুনরায় অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পড়িলেন। কতকটা সুস্থ হইলে নিরঞ্জনানন্দ ও শিবানন্দ তাঁহাকে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মতিথির পূর্ব্বেই অতি যত্নে মঠে লইয়া আসিলেন। তাঁহার দেহে শোথের প্রাবল্য দেখিয়া কবিরাজী চিকিৎসা করা হইল। এই সময়ে মহারাজ তাঁহার গুরুভ্রাতা ও অন্যান্য সেবকদের সহিত দিবারাত্রি নিয়মিতভাবে স্বামিজীর সেবা করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে তিনি পরে অনেকের নিকট বলিয়াছিলেন, "ঠাকুরেরও এত সেবা করি নাই।" স্বামিজীর পীড়ার অনেকটা উপশম হইলে মহারাজের আনন্দের আর সীমা রহিল না।

এই সময়ে একদিন স্বামিজী অন্যান্য গুরুভ্রাতাদের সম্মুখে মহারাজকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "মাধুকরীর অন্ন অতি পবিত্র, মাধুকরী করে খেতে ইচ্ছে হচ্ছে।" স্বামিজীর কথা শুনিয়া তাঁহারা সকলেই মাধুকরী ভিক্ষায় বাহির হইলেন। মহারাজ পশ্চিমের সাধুদের মত গাঁতি বাঁধিয়া বেলুড়ের নিকটবর্ত্তী মাড়োয়ারীদের গৃহে ভিক্ষা করিতে গেলেন। তাঁহার সৌম্য প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া তাহারা নানাবিধ সুমিষ্ট খাদ্য প্রদান করিল। মহারাজ ও অন্যান্য গুরুভ্রাতারা তাঁহাদের ভিক্ষালব্ধ সামগ্রী

স্বামিজীর সম্মুখে রাখিলেন। স্বামিজী পরম আনন্দসহকারে সকলের ভিক্ষালব্ধ সামগ্রী হইতে কিছু কিছু গ্রহণ করিবার পরে তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "মাঝে মাঝে এই রকম মাধুকরী ভিক্ষা করতে তোমরা ভুলো না।"

১৯০২ খৃষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই শুক্রবার রাত্রিতে স্বামিজী অকস্মাৎ মহাসমাধিতে লীন হইলেন। সেদিন কার্য্যানুরোধে মহারাজ কলিকাতায় বলরাম মন্দিরে ছিলেন। এই নিদারুণ সংবাদ পাইয়াই তিনি তৎক্ষণাৎ গভীর রাত্রিতে বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসিলেন। অশ্রুনিরুদ্ধ চক্ষে মহারাজ দেখিলেন, তাঁহাদের আরাধ্যতম নেতা, শ্রীরামকৃষ্ণের লীলাসহচর—তাঁহার কথিত সপ্তর্ষিমণ্ডলের ঋষি, সাক্ষাৎ নরনারায়ণ, মহাপ্রাণ, মহাশক্তি আজ স্থূলদৃষ্টি হইতে অন্তর্হিত হইলেন। এই বিরহ তৎকালে তিনি সহ্য করিতে পারিলেন না। স্বামিজীর বক্ষের উপরে মহারাজ ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। পূজ্যপাদ স্বামী সারদানন্দ অতি কষ্টে তাঁহাকে ধীরে ধীরে তুলিয়া উঠাইয়া আনিলেন। বাষ্পগদগদ কণ্ঠে মহারাজ বলিলেন, "সামনে থেকে যেন হিমালয় পাহাড় অদৃশ্য হয়ে গেল!"

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

সঙ্ঘের বিস্তার

স্বামিজীর বিরহের আবেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হইলে মহারাজ, শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের কার্য্যে দৃঢ়ভাবে মনোনিবেশ করিলেন। সঙ্ঘের সংরক্ষণ, পুষ্টি ও বিস্তারের গুরু দায়িত্বভার তাঁহার উপর অর্পিত রহিয়াছে। এই মহাকার্য্য-সাধনই যে তাঁহার জীবনের মুখ্য ব্রত।

শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের অর্থ কি? ইহা একটি সংহতিবদ্ধ দল, না সম্প্রদায়বিশেষ? সাধারণতঃ মানব-অভিধানে এইরূপ অর্থই বুঝায়। কিন্তু রাকৃষ্ণ-সঙ্ঘ প্রকৃতপক্ষে সেরূপ কোন বিশিষ্ট দল বা সম্প্রদায় নহে। একটি জীবন্ত আধ্যাত্মিক মহাশক্তির স্ফুরিতাধারের রক্ষিবৃন্দ এই সঙ্ঘ। যে পারমার্থিক মহাশক্তি লোক-কল্যাণের নিমিত্ত শ্রীরামকৃষ্ণরূপে প্রকাশ পাইয়াছিল, অধ্যাত্ম জগতে যে পরমতত্ত্ব সেই অপূর্ব্ব লীলায় উদঘাটিত হইয়াছিল এবং যে মহারত্নের দিব্যদ্যুতিতে মানুষের অন্তরলোক আনন্দ-ধারায় উদ্ভাসিত হয়—সেই মহাশক্তি, সেই পরমতত্ত্ব, সেই মহারত্ন যে সম্পুটে রক্ষিত আছে, সে সম্পুটের ন্যাস-রক্ষকেরাই রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘ।

বিবেক, বৈরাগ্য, ত্যাগ, তপস্যা ও কঠোর সংযমের সাধনায় সিদ্ধিলাভ না করিলে কেহ অধ্যাত্মশক্তিকে ধারণ করিতে পারে

না। ঈশ্বরানুভূতিই মানবজীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য—চরম লক্ষ্য। যুগে যুগে মহাপুরুষগণ এই মহান্ সত্য প্রচার করিয়া যান। তাঁহারা তাঁহাদের জীবনের দিব্যালোকে সেই অমৃতকেই লোকসমক্ষে প্রচার করেন। সুপ্ত পারমার্থিক বোধকে উদ্বোধিত করিতে যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের আদর্শ ও প্রেমপূর্ণ সমন্বয়বাণী স্বামিজী বজ্রনির্ঘোষে জগৎ-সমক্ষে প্রচার করিয়াছিলেন। তিনি ঠাকুরের মূর্ত্ত বাণীরূপেই প্রকাশ পাইয়াছিলেন; তজ্জন্য স্বামিজী তাঁহার নিজের পরিচয় দিয়াছেন—"I am a voice without body" অর্থাৎ আমি অশরীরী বাণী। এই বাণীরই সচল রূপ দিয়াছিলেন মহারাজ। শ্রীরামকৃষ্ণ-প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘকে তিনি সংহত ও সুনিবদ্ধ করিয়া পুষ্ট ও বৰ্দ্ধিত করিয়াছিলেন। এই সংগঠনকার্য্যে তাঁহার অসাধারণ আধ্যাত্মিক শক্তি প্রকাশ পাইত।

ঠাকুরের লীলায় তাঁহার অন্তরঙ্গদের প্রত্যেকেরই একটী বিশেষ নির্দ্দিষ্ট স্থান আছে। স্বামিজী ইহা বুঝিয়া মহারাজ সম্বন্ধে গুরুভ্রাতাদের বলিতেন, "সে যতকাল বেঁচে থাকবে ততকাল প্রেসিডেণ্ট হয়েই থাকবে।" পূজ্যপাদ সারদানন্দ এই কথা অধিকতর স্পষ্ট ও বিশদভাবে লিখিয়া গিয়াছেন—"Indeed, if the Swami Vivekananda was loved and cherished by the Master as the instrument by which to proclaim to the world his great Mission in the realm of religion—the Swami Brahmananda was no less regarded by him

as the person to fill in an important and very responsible place in the scheme of his religious organisation." অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে স্বামী বিবেকানন্দ যদি তাঁহার গুরুদেবের মহতী বাণী জগতে প্রচার করিবার যন্ত্রস্বরূপ বলিয়া বিশেষ আদর ও স্নেহের পাত্র হইয়া থাকেন, তবে তাঁহার পরিকল্পিত ধর্ম্ম-সঙ্ঘে অতি প্রয়োজনীয় ও দায়িত্বপূর্ণ স্থান পূরণের যোগ্যপাত্র বলিয়া স্বামী ব্রহ্মানন্দও শ্রীরামকৃষ্ণদেবের কম স্নেহভাজন ছিলেন না। মহারাজের ভিতরে ঠাকুরের আধ্যাত্মিক শক্তি কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল বলিয়া গুরুভ্রাতারা তাঁহাকে তাঁহার উপযুক্ত প্রতিনিধিজ্ঞানে গভীর শ্রদ্ধা ও সম্মান করিতেন।

স্বামিজীর অভাবজনিত দুঃসহ শোক ও বিষাদ অপসারিত করিয়া মঠ ও মিশনকে দৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে মহারাজ উদ্যোগী ও যত্নবান হইলেন। তাঁহার গুরুভ্রাতারাও সমবেত চেষ্টায় স্বামিজীর প্রদর্শিত পথে সঙ্ঘের পরিচালনা করিতে সর্ব্বপ্রকারে তাঁহাকে সাহায্য করিতে লাগিলেন। মঠের অন্যান্য সাধু-ব্রহ্মচারীরা আধ্যাত্মিক প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হইয়া প্রবল তেজে ও বিপুল উদ্যমে এই মহোচ্চ আদর্শের সাধনায় আত্মাহুতি দিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

মার্কিণে প্রচারকার্য্যের জন্য স্বামিজীর পূর্ব্বনির্দ্দেশ মত স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ ক্যালিফর্ণিয়া অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি ১৯০২ খৃষ্টাব্দে নভেম্বরের প্রারম্ভে মাদ্রাজ, কলম্বো ও জাপান হইয়া ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ২রা জানুয়ারী তথায়

পৌঁছিলেন। বাংলা "উদ্বোধন" নামক পত্রিকার সর্ব্বপ্রথম সম্পাদক ও পরিচালক ছিলেন স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ। তাঁহার মার্কিণযাত্রার অনতিবিলম্ব পরেই পত্রিকার আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়ে। এমন কি অর্থাভাবে উহার প্রকাশ বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। তৎকালে মহারাজের উপদেশ ও নির্দ্দেশ মত ভক্তমণ্ডলীর নিকট ইহার জন্য অর্থ-সংগ্রহের চেষ্টা হইল। স্বামী শুদ্ধানন্দ পত্রিকাটীর পরিচালনার ভার গ্রহণ করিলেন। রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সন্ন্যাসিবৃন্দ এবং ভক্ত ও সুপণ্ডিত সাহিত্যিকদের রচনাসম্ভারে পত্রিকাটী সমৃদ্ধ ও পুষ্ট হইয়া পাঠকবর্গের চিত্ত আকর্ষণ করিত। মহারাজ নিজেও এই সময়ে 'গুরু' সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন এবং মাঝে মাঝে শ্রীরামকৃষ্ণের উপদেশগুলি প্রকাশ করিতেন। স্বামী সারদানন্দ উহাতে ধারাবাহিকভাবে নানা প্রবন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামিজীর আদর্শ প্রচার করিতে লাগিলেন। সঙ্ঘের সাধুবৃন্দের উদ্যোগে ও চেষ্টায় "উদ্বোধন" পাক্ষিক হইতে মাসিকে পরিণত হইল। ধীরে ধীরে উহা স্থায়ীভাবে সংস্থাপিত হইয়া স্বামিজীর ইংরাজী ও বাংলা রচনা, বক্তৃতা ও পত্রাবলীর অনুবাদ, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-লীলাপ্রসঙ্গ ও অন্যান্য মূল্যবান গ্রন্থ প্রচার করিয়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ভাবপ্রবাহে সমগ্র বাংলাদেশের আবালবৃদ্ধবনিতার চিত্ত প্রবলভাবে আলোড়িত করিল। বর্ত্তমানকালেও রামকৃষ্ণ-ভাব-প্রচারে বাংলাভাষায় ইহাই এখন মুখ্য পত্রিকা।

এদিকে বাংলা দেশে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের প্রচার বেশ প্রবলভাবেই

চলিতেছিল। ১৯০২ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে এলবার্ট হলে স্বামিজীর স্মৃতিসভায় যুবকদের দ্বারা 'বিবেকানন্দ সমিতি' গঠিত হইল। লোককল্যাণের জন্য যে কার্য্যপ্রণালীর আদর্শ স্বামিজী বঙ্গের যুবকদিগের সম্মুখে স্থাপন করিয়াছিলেন, তাহা শ্রীরামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের ত্যাগী সাধুদের সাহায্যে বাংলার ছাত্র ও তরুণ সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচার করাই সমিতির উদ্দেশ্য। মহারাজ এই সমিতির যুবকদের সংকল্পিত কার্য্যে উৎসাহ এবং পরামর্শ দান করিতেন।

কলিকাতার বিভিন্ন পল্লীতে, বাংলাদেশের নানাস্থানে এবং কোন কোন অন্তরঙ্গ ভক্তের গৃহে শ্রীরামকৃষ্ণ-মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। মহারাজ ও তাঁহার গুরুভ্রাতারা মঠের সাধু-ব্রহ্মচারীদের সঙ্গে লইয়া তথায় উপস্থিত হইতেন। তাঁহার আগমনে সকলের প্রাণে উৎসাহ সঞ্চারিত হইত এবং উৎসব-ক্ষেত্রে এক অপূর্ব্ব আনন্দময় আধ্যাত্মিক ভাবের প্রবাহ বহিত। তাঁহারা মনে করিতেন শ্রীরামকৃষ্ণের নাম, জীবনী ও বাণী প্রচার করিবার ইহা একটী প্রকৃষ্ট প্রণালী। ইহাতে ঠাকুরকে কেন্দ্র করিয়া প্রাচীন ও নবীন ভক্তমণ্ডলী পরস্পর পরিচিত হইয়া আধ্যাত্মিক আত্মীয়তাসূত্রে আবদ্ধ হইত এবং মঠ ও মিশনের মহান্ আদর্শে জনসাধারণ ক্রমশঃ আকৃষ্ট হইতে লাগিল।

বেলুড়, মান্দ্রাজ এবং মায়াবতীতে স্বামিজী রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের তিনটী স্থায়ী কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিলেন। কাশীধামে রামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রম তাঁহার মহাপ্রয়াণের প্রায় প্রাক্কালে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। স্বামিজী যখন ১৯০২ খৃষ্টাব্দের

প্রারম্ভে গোপাল লাল ভিলায় অবস্থান করিতেছিলেন তখন ভিঙ্গাররাজ তথায় একটী আশ্রম স্থাপন করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন। পূর্ব্ব হইতেই স্বামিজীর কাশীধামে একটী মঠ ও মিশনের কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা ছিল, সুতরাং এই প্রস্তাবে তিনি সম্মত হইলেন। উক্ত সদাশয় ব্যক্তি যে সামান্য অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন তাহা দ্বারা রামকৃষ্ণ অদ্বৈতাশ্রম স্থাপন করিবার জন্য স্বামিজী পূজ্যপাদ শিবানন্দকে কাশীধামে পাঠাইলেন। স্বামিজীর দেহত্যাগে এই সদ্য-প্রতিষ্ঠিত আশ্রমে নানা অভাব-অনটন আসিয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু স্বামিজীর সংকল্পিত কার্য্য ও আদেশ স্মরণ করিয়া যেরূপ কঠোর পরিশ্রম ও তপস্যা সহকারে শিবানন্দ উক্ত আশ্রমের কার্য্য পরিচালনা করিতেছিলেন তাহা চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়।

১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্য ভাগে মহারাজ সর্ব্বাগ্রে কাশীধামে যাত্রা করিলেন। তিনি তথায় গিয়া দেখিলেন আশ্রমে কার্য্য করিবার লোকাভাব, অর্থাভাব। উক্ত মঠের জন্য তাঁহার গুরু-ভ্রাতার দুঃসহ ক্লেশ, অটল ধৈর্য্য, অদম্য অধ্যবসায় এবং অবিচলিত নিষ্ঠা ও দৃঢ়তা তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন। মহারাজ একমাস তথায় অবস্থান করিয়া আর্থিক অনটন কতকটা লাঘব করিয়াছিলেন এবং কতিপয় ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তি আশ্রমের প্রতি আকৃষ্ট হওয়াতে কতক অসুবিধা দূরীভূত হইল। লাক্ষার জীর্ণ পুরাতন খাজাঞ্চী বাগানবাটী ভাড়া লইয়া অদ্বৈত আশ্রমের কার্য্য চলিতেছিল। মহারাজ উহাকে স্থায়ী ভবনে প্রতিষ্ঠিত করিতে যত্নবান হইলেন।

এই সময়ে কাশীর Poor Men's Relief Association রামাপুরার একটি ভাড়াটিয়া বাড়ীতে অবস্থিত ছিল। একটী স্থানীয় কমিটির তত্ত্বাবধানে কয়েকজন সেবাব্রতী যুবক ইহার কার্য্য চালাইতেছিলেন। ইঁহাদের কেহ কেহ স্বামিজীর কৃপাপ্রাপ্ত শিষ্য এবং তৎপ্রদর্শিত সেবাধর্ম্মে অনুরক্ত। কাশীধামে মহারাজের আগমনবার্ত্তা পাইয়া তাঁহারা আশ্রমে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাদের দেখিয়া স্বামিজীর কথা ও নির্দ্দেশ তিনি স্মরণ করিলেন। কাশী হইতে বেলুড়ে ফিরিয়া গিয়া স্বামিজী ইতিপূর্ব্বে মহারাজকে বলিয়াছিলেন, "এই প্রতিষ্ঠানটির উপর দৃষ্টি রেখো।" সেবাব্রতী যুবকদিগকে তিনি এই মহৎকার্য্যে বিশেষভাবে উৎসাহিত করিলেন—শ্রীশ্রীঠাকুর ও স্বামিজীর বাণীর অভিন্নতা তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন। তিনি বলিলেন, "স্বামিজী ও ঠাকুরের বাণী এক—অভিন্ন। জগতে স্বামিজীর ভিতর দিয়াই ঠাকুর প্রকাশ পাইয়াছেন। স্বামিজী যদি ঠাকুরকে সাধারণের উপযোগী করিয়া লোকসমক্ষে প্রচার না করিতেন, তবে সাধারণ মানুষের মন দিয়া তাঁহাকে কেহ ধরিতে পারিত না ; শ্রীরামকৃষ্ণ এতবড় মহাশক্তির আধার ছিলেন!" মহারাজের আধ্যাত্মিকভাবপূর্ণ সুমিষ্ট উপদেশ ও প্রেমপূর্ণ ব্যবহার দেখিয়া তাঁহারা মুগ্ধ হইলেন। প্রসঙ্গক্রমে তাঁহারা প্রতিষ্ঠানটী রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত করিতে ঐকান্তিক আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। এই বিষয়ে মহারাজ তাঁহাদিগকে যথোপযুক্ত উপদেশ ও সৎপরামর্শ দিলেন। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর একটী সাধারণ সভা কাশীর কারমাইকেল লাইব্রেরী হলে

আহূত হইল। উক্ত প্রতিষ্ঠানটী রামকৃষ্ণ মিশনের পরিদর্শনে ও তত্ত্বাবধানে পরিচালিত করিবার প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল। প্রতিষ্ঠানটীর পরিচালনার ভার মিশন গ্রহণ করিয়াই সঙ্গে সঙ্গে উহার নাম পরিবর্ত্তন করিয়া স্বামিজীর পূর্ব্বনির্দ্দেশ মত Home of Service বা সেবাশ্রম রাখিল। এই সময়ে সেবাশ্রমের গৃহনির্ম্মাণ ফণ্ডে কলিকাতা ইটালী নিবাসী উপেন্দ্র নারায়ণ দেব এককালীন চারি হাজার টাকা দান করিলেন। মহারাজের পরামর্শমত অদ্বৈতাশ্রমের সংলগ্ন জমি উহার জন্য খরিদ করিবার চেষ্টা হইতে লাগিল। এইরূপে সেবাশ্রমের ভিত্তি দৃঢ় হইল।

কাশীধাম হইতে মহারাজ হরিদ্বারে কনখল সেবাশ্রমে গমন করিলেন। তথায় ১৯০১ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে স্বামিজীর শিষ্য কল্যাণানন্দ আর্ত্ত ও পীড়িত সাধুদের জন্য এই আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। তখন তিনটী মাত্র চালাঘর ছিল—তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা একটী ছোট অংশে মহারাজ অবস্থান করিতেন। কলিকাতাবাসী কোন সহৃদয় ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি মহারাজের নিকট কনখল সেবাশ্রমের জন্য দুই কিস্তিতে দুই হাজার তিন শত টাকা দিয়াছিলেন। উহা হইতে দেড় হাজার টাকায় আশ্রমের জন্য পনর বিঘা জমি খরিদ করা হইল। ইহাতে সেবাকার্য্য সুন্দরভাবে চলিতে লাগিল এবং স্থায়ী আকারে গৃহনির্ম্মাণেরও সূত্রপাত হইল।

মহারাজ হরিদ্বার হইতে শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিলেন। এখানে স্বামী তুরীয়ানন্দ তপস্যা করিতেছিলেন। মহারাজ শ্রীবৃন্দাবনে

তাঁহার সহিত একসঙ্গে অবস্থান করিতে লাগিলেন। একদিন প্রসঙ্গক্রমে মহারাজ মঠের সাধু-ব্রহ্মচারীদিগের শিক্ষার ভার গ্রহণ করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। তাঁহার ন্যায় শাস্ত্রবিদ্, বৈরাগ্যবান, জ্ঞানভক্তিসমন্বিত তপোজ্জ্বল মহাপুরুষের সংস্পর্শে ও শিক্ষার প্রভাবে সাধু-ব্রহ্মচারীরা স্বামিজীর আদর্শে গঠিত হইতে পারিবে—ইহাই ছিল মহারাজের বিশেষ অভিপ্রায়। কিন্তু স্বামিজীর আকস্মিক দেহত্যাগে তাঁহার মন তখন গভীর শোকে নিমগ্ন ছিল এবং ব্যথিত হৃদয় তপস্যা ও সাধনভজনকে আশ্রয় করিয়া শান্তির জন্য লালায়িত হইয়াছিল। সুতরাং তিনি মহারাজের উক্ত প্রস্তাবে সায় দিতে পারেন নাই। মহারাজ তাঁহার মনোভাব বুঝিয়া ঐ সম্বন্ধে আর কিছু বলিলেন না।

ঠাকুরের পরম ভক্ত শ্রীযুত নবগোপাল সপরিবারে সে সময়ে বৃন্দাবনে বলরামবাবুর পূর্ব্বপুরুষের প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর বাড়ীতে (যাহা কালাবাবুর কুঞ্জ বলিয়া খ্যাত) বাস করিতেছিলেন। তাঁহার পুত্র নীরদ (অম্বিকানন্দ) প্রায়ই তাঁহাদের দর্শন করিতে আসিত। পূর্ব্ব হইতে পরিচয় থাকায় তুরীয়ানন্দের সহিত তাহার বেশী সঙ্গ হইত। মহারাজকে গম্ভীরপ্রকৃতি দেখিয়া তাঁহার নিকট যাইতে তাহার তত সাহস হইত না, দরজার সম্মুখে প্রণাম করিয়াই চলিয়া যাইত। তুরীয়ানন্দ ইহা লক্ষ্য করিয়া তাহাকে বলিলেন, "কিরে, তুই ভিতরে গিয়ে মহারাজের পাদস্পর্শ করে প্রণাম কর। বাইরে থেকে ওরকম করে চলে আসিস্ কেন?" নীরদ তুরীয়ানন্দের আদেশে ভয়ে ভয়ে

মহারাজের ঘরে প্রবেশ করিয়া প্রণাম করিলে মহারাজ "ভয় কি বাবা" বলিয়া তাহার পিঠে ও মাথায় হাত বুলাইতে লাগিলেন। সেই স্পর্শে নীরদের হৃদয় হইতে সকল ভয় চলিয়া গিয়া এক অদ্ভুত আনন্দ বোধ হইতে লাগিল। পরদিন হইতে নীরদ মহারাজকে প্রণাম করিয়া অধিকাংশ সময় তাঁহার নিকট অতিবাহিত করিত। ক্রমশঃ সে এতদূর আকৃষ্ট হইল যে তুরীয়ানন্দের নিকট প্রায় পূর্ব্বের মত বসিতই না। ইহাতে একদিন মহারাজ হাসিতে হাসিতে তুরীয়ানন্দকে বলিলেন, "আপনার চেলা যে বিগড়ে গেল!" তিনি হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "বেশ হয়েছে।"

এই সময়ে মহারাজ রাত্রি ১২টার সময় উঠিয়া প্রত্যহ ধ্যান-জপ করিতেন; দ্বার রুদ্ধ থাকা সত্ত্বেও প্রায় প্রতি রাত্রেই দেখিতে পাইতেন একটী বৈষ্ণব বাবাজী তাঁহার ঘরের মধ্যে জপের মালা হাতে দাঁড়াইয়া আছেন। একদিন রাত্রি ১২টার পূর্ব্বে মহারাজের নিদ্রাভঙ্গ হয় নাই দেখিয়া কে যেন তাঁহাকে ধাক্কা দিয়া উঠাইয়া দিলেন। নিদ্রা ভাঙ্গিলে তিনি চাহিয়া দেখেন যে সেই সূক্ষ্মদেহী বাবাজী দাঁড়াইয়া আছেন এবং জপাদি করিবার জন্য হাত দিয়া ইঙ্গিত করিতেছেন। তখন নহবৎ বাজিয়া উঠায় তিনি বুঝিলেন যে রাত্রি ১২টা বাজিয়া গিয়াছে। এই প্রসঙ্গে তিনি পরে বলিয়াছিলেন যে, দেহত্যাগের পরও সাধু-মহাত্মারা বৃন্দাবনে নিত্যলীলা দর্শন করিবার জন্য সূক্ষ্ম শরীরে অবস্থান করেন।" নীরদ সুন্দর গান গাহিতে পারিত। মহারাজ প্রায়ই তাহার গান শুনিতেন। একদিন

মহারাজ তাহাকে লইয়া শ্রীশ্রীরাধারমণজীর মন্দির দর্শন করিতে গেলেন। সেখানে তিনি ধ্যানতন্ময়ভাবে ভজন শুনিতে লাগিলেন; নীরদও কয়েকটা ভজন গাহিল। তাঁহারা মন্দির হইতে চলিয়া আসিতেছেন, এমন সময় এক ব্যক্তি এক চেঙ্গারী নানাবিধ মিষ্টান্ন প্রসাদ লইয়া আসিয়া নীরদের হাতে দিল। মহারাজ রহস্য করিয়া কিশোর নীরদকে বলিলেন, "তোকে আগে বলেছিলুম, ওরা সব ভাল ভাল ভোগ ঠাকুরকে দেয়—ঠাকুর দর্শন করবি, প্রসাদ পাবি। দেখলি, এই দ্যাখ কত প্রসাদ দিয়েছে।"

মহারাজ কলিকাতায় ফিরিবার পথে এলাহাবাদে ষ্টেসন রোডস্থ ব্রহ্মবাদিন ক্লাবে বিজ্ঞানানন্দের নিকট উঠিলেন। একদিন মাত্র তথায় থাকিয়া তিনি নীরদকে লইয়া বিন্ধ্যাচলে চলিয়া গেলেন। তথায় শ্রীযুত যোগীন্দ্রনাথ সেন নামক ঠাকুরের সময়কার জনৈক ভক্তের গৃহে মহারাজ অবস্থান করিতেন। এক অমাবস্যা নিশিথে তিনি নীরদের গাত্র স্পর্শ করিয়া জাগাইয়া তুলিলেন এবং বলিলেন, "তোর সব গরম জামা কাপড় বেশ করে পরে নে।" তখন শীত-কাল। পশ্চিমের সেই প্রচণ্ড শীতে মহারাজ সাধুদের মত শুধু গাঁতি বাঁধিয়া কাপড় পরিলেন এবং সর্ব্বাঙ্গে একটি কম্বল জড়াইয়া লইলেন। হাতে লাঠি লইয়া মহারাজ নীরদের হাতে একটা লণ্ঠন দিয়া বলিলেন, "চল, মহামায়াকে দর্শন করে আসি।" মন্দিরপথ অতিশয় অসমতল ছিল বলিয়া তিনি নীরদের হাত ধরিয়া বলিলেন, "দেখিস, সাবধানে চলিস।"

মহারাজ মন্দিরসম্মুখে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন বহু লোক বসিয়া আছে, কেহ জপ করিতেছে, আবার কেহ স্তোত্র পাঠ করিতেছে। শ্রীশ্রীমহামায়ার মন্দিরের দরজা তখনও বন্ধ। কিয়ৎক্ষণ পরে দ্বার খুলিলে সকলেই অগ্রে মন্দিরমধ্যে প্রবেশ করিবার নিমিত্ত চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু পাণ্ডারা মহারাজের তেজঃপূর্ণ প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিয়া তাঁহাকেই দেবীদর্শনের জন্য সাদরে সর্ব্বাগ্রে প্রবেশ করিতে দিল। তিনি নীরদকেও হাত ধরিয়া সঙ্গে লইয়া গেলেন। দেবীর শ্রীমূর্ত্তি সুন্দর পুষ্পমাল্যে সুশোভিতা হইয়া বিরাজ করিতেছিল। ভাবোন্মত্ত মহারাজ নীরদকে বলিলেন, "কৃপাময়ী কালকামিনী গানটা গা।"

নীরদ তাঁহার আদেশমত গাহিল—

"কৃপাময়ী কালকামিনী ঘোর কালভয়-নিবারিণী,
কালী মহাকাল-বক্ষঃবিহারিণী,
করালী ঘনবরণা শিবানী শবাসনা
নরমুণ্ডবিভূষণা,
শ্মশান-শোভনা প্রসীদ প্রিয়কামিনী।"

মা জগদম্বার সম্মুখে এই ভজন গীত হইল। গান শুনিতে শুনিতে "আহা! আহা! মা জগদম্বে, ব্রহ্মময়ী, দয়াময়ী" ইত্যাদি বলিয়া মহারাজ বালকের ন্যায় কাঁদিতে কাঁদিতে ধ্যানে তন্ময় হইলেন; মধ্যে মধ্যে তাঁহার দেহে পুলক কম্পনাদি প্রকাশ পাইল। তাঁহার সেই দিব্যভাবের অবস্থা দেখিয়া পাণ্ডারা সকলেই বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়া গেল এবং শ্রদ্ধাভরে তাঁহাকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল, যাহাতে অপর যাত্রীরা তাঁহার উপর না আসিয়া

পড়ে। গান বন্ধ হইবার কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি প্রকৃতিস্থ হইয়া "মা" "মা" রব উচ্চারণ করিতে লগিলেন।

বিন্ধ্যাচলে মহারাজ ত্রিরাত্র থাকিবার সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, কিন্তু যোগেন বাবুর একান্ত আগ্রহ ও যত্নে তাঁহাকে আরও কিছুদিন থাকিতে হইল। পাহাড়ের উপর যে স্থানে শ্রীশ্রীঅষ্টভুজা দেবীর মূর্ত্তি আছে তথায় সকলে মিলিয়া একদিন বনভোজন করিবেন, যোগেন বাবু মহারাজকে ইহা জানাইলেন। তিনি সানন্দে সম্মতি দিলেন। রন্ধনের সমস্ত উপকরণসহ একটী হারমোনিয়াম সঙ্গে লইয়া সকলে তথায় যাত্রা করিলেন। আমোদ-আহ্লাদ করিতে করিতে উদ্যোক্তারা রন্ধনের ব্যবস্থায় ব্যস্ত থাকিলেন। ইত্যবসরে মহারাজ নীরদকে সঙ্গে লইয়া একটী গুহার ভিতরে শ্রীশ্রীঅষ্টভুজা দেবীকে দর্শন করিতে গেলেন। তথায় উপস্থিত হইয়া তিনি দেবীর সম্মুখে প্রণত হইলেন। স্থানটী অতি নির্জ্জন—কোন জনপ্রাণী সে সময়ে ছিল না। মহারাজ নীরদকে বলিলেন, 'জানি না কি বলে ডাকি তোরে' গানটী গা।"

তাঁহার আদেশ শুনিয়া নীরদ গাহিল—

"জানি না কি বলে ডাকি তোরে (শ্যামা মা)
কখন শঙ্কর-বামে কভু হর-হৃদি 'পরে,
কখন বিশ্বরূপিণী কভু বামা উলঙ্গিনী,
কভু শ্যাম-সোহাগিনী—কভু রাধার পায়ে ধরে।
যে যা বলে শুনিব না,
(আমার) মা নামের নাই তুলনা,

"তাই বলে ডাকি 'মা' 'মা'
ঐ অভয় পদ পাবার তরে!"

গান শুনিতে শুনিতে মহারাজের প্রেমবিগলিত অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িল,—সমগ্র শরীরে কম্পন-পুলকাদি হইতে হইতে একেবারে তিনি স্থির নিস্পন্দ হইয়া গেলেন। গান থামিয়া গেল, তথাপি তাঁহার বাহ্যসংজ্ঞা নাই। কিছুক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হইলে নীরদকে তিনি বলিলেন, "চল, আর এক জায়গায় যাই।" পাহাড়ের শীর্ষদেশে আরোহণ করিয়া একটী কূর্ম্মপৃষ্ঠবৎ স্থান নির্ব্বাচন করিয়া মহারাজ পুনরায় ধ্যান করিতে বসিলেন। নীরদ স্থিরভাবে কিছুক্ষণ বসিয়া রহিল; পরে বালস্বভাববশতঃ ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। মহারাজের ধ্যানভঙ্গের পর নীরদকে লইয়া বনভোজনের স্থানে ফিরিয়া আসিলেন এবং আহারান্তে আনন্দ করিতে করিতে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। এইরূপে পরমানন্দে কয়েক সপ্তাহ অতিবাহিত করিয়া মহারাজ ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে বেলুড় মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

কার্য্যক্ষেত্র যেমন দিন দিন অধিকতর বিস্তৃত হইতে আরম্ভ করিল, তেমনি কোন বিষয়ে লোক ও অর্থেরও অভাব হইল না। মহারাজের অসীম প্রেম ও বিরাট হৃদয়ের স্পর্শ পাইয়াই দলে দলে শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত বংশের যুবকেরা সমস্ত জাগতিক ভোগসুখ ও প্রবৃত্তিমুখী বাসনা ত্যাগপূর্ব্বক জ্বলন্ত বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহারই উপদেশে ত্যাগের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া মঠ ও মিশনের পতাকাতলে দাঁড়াইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কাশীধাম, মান্দ্রাজ ও বিভিন্ন

স্থানে মঠ ও মিশনের কার্য্যের সহায়তার জন্য প্রেরিত হইলেন। মার্কিণ কেন্দ্রের কার্য্য সুচারুরূপে পরিচালনের জন্য মহারাজ একে একে নির্ম্মলানন্দ, বোধানন্দ ও প্রকাশানন্দকে পাঠাইয়াছিলেন।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে মার্চ্চমাসে শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মমহোৎসবের অত্যল্প কাল পরেই মহারাজ টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। চিকিৎসার সুবন্দোবস্তের জন্য তাঁহাকে কলিকাতায় বলরাম মন্দিরে আনা হইল। যথারীতি চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ফলে মহারাজ ধীরে ধীরে রোগমুক্ত হইয়া উঠিলেন। চিকিৎসক ও গুরুভ্রাতাদের পরামর্শানুসারে মহারাজ বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য স্বামী বিরজানন্দকে সঙ্গে লইয়া সিমুলতলায় গমন করিলেন। কিছুদিন তথায় থাকিয়া তিনি পুনরায় বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসিলেন।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দের শেষ ভাগে শীতের প্রারম্ভে ভাগলপুর সহরে ভীষণ ভাবে প্লেগ রোগের প্রাদুর্ভাব হইল। সহরের লোক—আবালবৃদ্ধবনিতা ঘর দ্বার ছাড়িয়া অন্যত্র পলাইতে লাগিল। এমন কি কেহ কেহ মুমূর্ষু রোগীকে ফেলিয়া গৃহ তালাবদ্ধ করিয়া চলিয়া গেল। এই বিপন্ন অবস্থায় ভাগলপুরের মিউনিসিপালিটী ও তথাকার স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা অগত্যা মিশনের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। মহারাজ স্বামী সদানন্দের নেতৃত্বাধীনে মঠের কয়েক জন সাধু, ব্রহ্মচারী ও ভক্ত যুবককে উক্ত সেবাকার্য্যের জন্য ভাগলপুরে পাঠাইয়া দিলেন। ইতিপূর্ব্বে যখন কলিকাতা মহানগরীতে প্লেগ দেখা দিয়াছিল তখন স্বামিজীর আদেশে স্বামী সদানন্দ সেবাকার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে

তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল বলিয়া তাঁহারই নির্দ্দেশ মতে কাজ করিতে মহারাজ সেবকবৃন্দকে উপদেশ দিয়াছিলেন। এই সেবাকার্য্যে মিশনের কর্ম্মিবৃন্দ যে পরিশ্রম, যত্ন, সাহস এবং জীবন উপেক্ষা করিয়া নিঃস্বার্থপর সেবার আদর্শ দেখাইয়াছিলেন, তাহাতে সকলের হৃদয়ে যুগপৎ প্রশংসা ও বিস্ময়ের উদ্রেক হইয়াছিল।

কনখল সেবাশ্রমের জন্য মোট পনর বিঘা জমি ক্রয় করা হইলে ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে মহারাজ আশ্রমের গৃহনির্ম্মাণের পরিকল্পনা করিয়া এলাহাবাদে বিজ্ঞানানন্দ স্বামীকে পত্র লিখিয়া জানাইলেন। মহারাজের উপদেশ মত তাঁহার তত্ত্বাবধানে কনখল সেবাশ্রমের গৃহ নির্ম্মিত হইল। কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ দুইজন ধর্ম্মপ্রাণ ব্যবসায়ী, বাবু ভজনলাল লোহিয়া এবং হর্ষমল শুকদেব গৃহনির্ম্মাণের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন। মহারাজ এইরূপে কনখল সেবাশ্রমকে সুদৃঢ়ভাবে স্থায়ী আকারে প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

ভারতে ও ভারতের বহির্ভূত প্রদেশে নানাস্থানে স্থানীয় ভক্তদের উদ্যোগে শ্রীরামকৃষ্ণের জন্মোৎসব অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। সাধারণতঃ উদ্যোক্তারা এই উপলক্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের ভাব প্রচারের জন্য মঠ হইতে কোন সন্ন্যাসীকে আনিবার চেষ্টা করিতেন এবং প্রকাণ্ড সভায় তাঁহার বক্তৃতারও আয়োজন হইত। ভক্তেরা মঠে জানাইলে মহারাজ স্বয়ং তাহার ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে বোম্বাইর কয়েকজন ভক্ত শ্রীশ্রীঠাকুরের জন্মোৎসব প্রকাণ্ডভাবে করিতে উদ্যোগী

হইলেন। তাঁহারা মাদ্রাজ হইতে স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে তথায় আসিবার জন্য বিশেষ অনুরোধ করিলেন। তিনি উক্ত প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়া মাদ্রাজ মহোৎসবের পর একটী দিন ধার্য্য করিয়া পাঠাইলেন। উদ্যোক্তারা মহোৎসাহে তাঁহার বক্তৃতার জন্য Cowasjee Jehangir Hall ভাড়া লইলেন এবং স্বামিজীর পরিচিত গুণমুগ্ধ ভক্ত ও বোম্বাই হাইকোর্টের এডভোকেট মিঃ সেটলুর প্রমুখ তথাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিরা ইহাতে যোগদান করিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু অকস্মাৎ রামকৃষ্ণানন্দ উদ্যোক্তাদের লিখিয়া জানাইলেন যে স্বামী ব্রহ্মানন্দের আদেশে রেঙ্গুণের উৎসবে তাঁহাকে উক্ত তারিখে বক্তৃতা করিতে হইবে, সুতরাং বোম্বে অনুষ্ঠানে যোগদান করা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। অগত্যা উদ্যোক্তারা আনুপূর্ব্বিক ঘটনা মহারাজের নিকট লিখিয়া জানাইলেন যে বোম্বের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তির একান্ত ইচ্ছা স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ আসিয়া তথায় কয়েকটি ধারাবাহিক বক্তৃতা করেন, কারণ বোম্বাই প্রদেশে তাঁহার বিশেষ খ্যাতি আছে। মহারাজ পত্রোত্তরে লিখিলেন যে পূর্ব্বে তাঁহাকে জানাইলে এরূপ গণ্ডগোল হইত না, সহসা রেঙ্গুণের ব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করা অসম্ভব। যাহা হউক, তাঁহাদের একান্ত অনুরোধে তিনি স্বামী রামকৃষ্ণানন্দকে রেঙ্গুণের উৎসবের পর বোম্বাইতে যাইবার জন্য লিখিয়া দিলেন। এই ঘটনা হইতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে তাঁহার অগোচরে, বিনা অনুমোদন বা অনুমতিতে সঙ্ঘের কোন কাজই হইতে পারিত না।

লোকমান্য তিলক, সার বালচন্দ্র পুরুষোত্তমদাস ও

মুরারজী প্রভৃতি গণ্যমান্য, সম্ভ্রান্ত ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিগণ রামকৃষ্ণানন্দের বক্তৃতা শুনিয়া মুগ্ধ হন এবং বোম্বাই সহরে একটী রামকৃষ্ণ মঠ স্থাপন করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন। রামকৃষ্ণানন্দ তাঁহাদের প্রার্থনা ও উৎসবের বিবরণ মহারাজের নিকট লিখিয়া জানাইয়াছিলেন। মহারাজ পত্র লিখিয়া বোম্বাইর উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে মে মাসের প্রথম ভাগে আমেরিকার স্যান-ফ্র্যান্সিসকোতে ভীষণ অগ্নিদাহের খবর তার যোগে ভারতবর্ষের সকল সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল। ইহা শুনিয়া মহারাজ স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দ এবং অন্যান্য প্রবাসী ভারতবাসীদের জন্য অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হন। তাঁহাদের সংবাদ পাইবার জন্য তিনি মার্কিণে স্বামী সচ্চিদানন্দকে তার করিলেন। কিন্তু যথাসময়ে উত্তর না আসায় তিনি অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তার করিবার প্রায় এক সপ্তাহ পরে ত্রিগুণাতীতানন্দের নিকট হইতে সংবাদ পাইলেন যে তাঁহারা সকলে ভাল আছেন। ইহা জানিয়া তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন।

১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ৫ই জুন প্রেমানন্দ সহ মঠ হইতে মহারাজ ভদ্রক হইয়া পুরী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। শিবানন্দ ও অখণ্ডানন্দ রথযাত্রার পূর্ব্বে তথায় উপনীত হন, এবং শশীনিকেতনে সকলে একত্র অবস্থান করেন। এই সময়ে জুলাই মাসের প্রারম্ভে অভেদানন্দ আমেরিকা হইতে মান্দ্রাজে আসিয়া পৌঁছিলেন। অভেদানন্দের বক্তৃতাগুলি মান্দ্রাজের সংবাদপত্রে মুদ্রিত হইলে মহারাজ রামকৃষ্ণানন্দকে তাহাদের cuttings (মুদ্রিতাংশ) তাঁহার নিকট পাঠাইতে

বলিলেন এবং অভেদানন্দ কোথায় কোথায় যাইবেন তাহা বিস্তারিতভাবে তাঁহাকে জানাইতে লিখিলেন। মান্দ্রাজ হইতে কলিকাতার পথে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ২৩শে আগষ্ট অভেদানন্দ নীলাচলে মহারাজকে দর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। দুইদিন পরে রামকৃষ্ণানন্দও আসিলেন। বহুদিন পর গুরুভ্রাতাদের পরস্পর মিলনে এবং সাধুভক্তদের সমাবেশে শশীনিকেতনে আনন্দোৎসব চলিতে লাগিল।

১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে মহারাজ পুরী হইতে কোঠারে গমন করিলেন। তৎকালে কোঠারের জমিদার পরমভক্ত রামকৃষ্ণ বাবু স্বয়ং তথায় উপস্থিত ছিলেন। মহারাজের আগমনোপলক্ষে তিনি তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য পত্রপুষ্প-শোভিত তোরণ নির্ম্মাণ ও বাদ্যাদির আয়োজন করিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ বাবু লোকজন সহ পরম সমাদরে ও ভক্তিভরে প্রণত হইয়া মহারাজকে তাঁহার সুবৃহৎ ভবনে লইয়া আসিলেন। তথাকার ধর্ম্মপিপাসু সম্ভ্রান্ত নরনারী তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিতেন এবং ভগবৎপ্রসঙ্গে তাঁহার সরল প্রাণপ্রদ উপদেশ শ্রবণে ও অমায়িক সরল ব্যবহারে মুগ্ধ হইতেন। কয়েকদিন কোঠারে অবস্থানের পর কলিকাতা হইতে সারদানন্দের তার পাইয়া তিনি জানিলেন যে মিসেস্ সেভিয়ার কলিকাতায় আসিয়াছেন এবং তথায় তাঁহার উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। ২৬শে ডিসেম্বর মহারাজ বেলুড় মঠে যাত্রা করিলেন।

এই সময়ে ত্রিপুরা, নোয়াখালী ও শ্রীহট্টে দারুণ অন্নকষ্ট দেখা দিল। বেলুড় মঠ হইতে দুর্ভিক্ষ-মোচন-কার্য্য ও সহস্র

সহস্র অনশনক্লিষ্ট নরনারীর সেবার জন্য সাধুব্রহ্মচারী ও কর্ম্মিবৃন্দ প্রেরিত হইল। চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত ডায়মণ্ডহারবার মহকুমায় অন্নকষ্ট উপস্থিত হওয়ায় তথায়ও সেবাকার্য্যের ব্যবস্থা হইল। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের কয়েক মাস পর্য্যন্ত এই সকল কার্য্য চলিয়াছিল।

সেবাশ্রমের ও অন্যান্য জনহিতকর কার্য্য যেমন দিন দিন বিস্তারলাভ করিতে লাগিল, মিশনের সেবা-ধর্ম্মে লোকের চিত্তও তেমনি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। কাশীধাম ও কনখলের সেবাকার্য্য দেখিয়া বৃন্দাবনের কতিপয় সহৃদয় ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি উক্ত আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তথায় একটী সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠা করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন ব্রজধামে অনেক তীর্থযাত্রী, সাধু, বৈরাগী এবং ব্রজবাসী রীতিমত চিকিৎসা, ঔষধ, পথ্য ও শুশ্রূষার অভাবে দারুণ কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে তাঁহারা কাশীর সেবাশ্রমের আদর্শে একটী সেবাশ্রম স্থাপন করিতে উদ্যোগী হইলেন। তাঁহারা বেলুড় মঠের সাহায্যের জন্য আবেদন করিলে ফেব্রুয়ারী মাসে বাবু যজ্ঞেশ্বর চন্দ্র (যিনি দমদম মাষ্টার বলিয়া রামকৃষ্ণমণ্ডলীতে পরিচিত), তাঁহার পুত্র ও ব্রহ্মচারী হরেন্দ্রনাথ সেবাকার্য্যের জন্য বৃন্দাবন গমন করিলেন। তথায় একটী কার্য্য পরিচালক সমিতি গঠিত হইল। পরে সেবাশ্রমের কার্য্য দিন দিন বিস্তৃত হইতে দেখিয়া উক্ত সমিতি ১৯০৮ সালের ১২ই জানুয়ারী তারিখে উহার কর্ত্তৃত্ব, তত্ত্বাবধান ও কার্য্যপরিচালনার ভার রামকৃষ্ণ মিশনের উপর সম্পূর্ণভাবে অর্পণ করিলেন।

এইরূপে শ্রীবৃন্দাবনধামে মিশনের একটী সেবাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইল।

মহারাজ ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ৬ই মে পুনরায় পুরীধামে গমন করিলেন। নীলাচলধামে অবস্থান করিতে তিনি ভালবাসিতেন। তাই মাঝে মাঝে তথায় যাইতেন। পুরীতে অবস্থানকালে পরম ভক্ত রামকৃষ্ণবাবুর আগ্রহে কখনও কখনও কোঠারে বা ভদ্রকে গিয়া তাঁহাদের বাড়ীতে কয়েকদিন থাকিতেন। কোঠারে বলরামবাবুদের বিস্তীর্ণ জমিদারী এবং তথায় তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষের স্থাপিত শ্রীবিগ্রহসেবার সুবন্দোবস্ত রহিয়াছে। শ্রীশ্রীমা কোঠারে একসময়ে কয়েকদিন ছিলেন। ঠাকুরের সন্তানগণ এবং মঠের সাধুব্রহ্মচারীরা মাঝে মাঝে তথায় স্বাস্থ্যলাভ ও একান্তে বাসের জন্য অবস্থান করিতেন। মাসাধিক কাল মহারাজ কোঠারে থাকিয়া পরে পুনরায় নীলাচলে চলিয়া আসিলেন। আবার ১লা ডিসেম্বর তিনি পুরী হইতে ভদ্রকে গমন করিলেন। উড়িষ্যার অন্তর্গত বালেশ্বর জেলায় ভদ্রক একটী মহকুমা। তথায় নয়া বাজারে রামকৃষ্ণবাবুদের কাছারী বাড়ীতে মহারাজ অবস্থান করিতে লাগিলেন। সহরের গণ্যমান্য শিক্ষিত ব্যক্তিরা মহারাজের নিকট আসিয়া শ্রদ্ধাবনত হৃদয়ে তাঁহার উপদেশ শুনিতেন। এই সময়ে ভদ্রকের চারিদিকে প্রবল বিসূচিকা রোগের প্রাদুর্ভাব হয়। মঠ হইতে গুরুভ্রাতারা এবং কলিকাতা হইতে সাধু ও ভক্তগণ তাঁহাকে অবিলম্বে পুরীতে চলিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু মহারাজ বিন্দুমাত্র বিচলিত হন নাই।

তিনি তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন এবং সকলকে স্বাস্থ্যবিধি পালন ও সাবধানতা অবলম্বন করিতে বলিলেন। একদিন কথাপ্রসঙ্গে মহারাজ বলিয়াছিলেন, "আমরা দেখি অনেকে nervous (স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যবশতঃ সহজেই আতঙ্কগ্রস্ত) কিন্তু তাহারা একবার nerves বা স্নায়ুগুলিকে একত্র সংহত (gather) করতে পারলে খুব শক্তিশালী হতে পারে।" কিছুদিন পরে কোঠারে গিয়া এক সপ্তাহ বাস করিয়া প্রেমানন্দ ও রামকৃষ্ণবাবুর সঙ্গে মহারাজ কলিকাতায় বলরাম মন্দিরে উঠিলেন। পরে তথা হইতে তিনি বেলুড় মঠে চলিয়া আসিলেন।

এই সময়ে বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনে সমগ্র দেশ প্রবল ভাবে আলোড়িত হইয়াছিল। বঙ্গের যুবশক্তির মধ্যে দেশাত্ম-বোধ জাগিয়া উঠিল। তাঁহাদের মধ্যে কর্ম্মপ্রবণতার জন্য একটা চাঞ্চল্য দেখা দিল এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দও তাঁহাদের রাজ-নৈতিক আদর্শে তাহাদিগকে পরিচালিত করিতে লাগিলেন। এই সময়ে মঠ ও মিশনের সংস্পর্শে আসিয়া বঙ্গের যুবকগণ ও কলিকাতার ছাত্রসমাজ শ্রীরামকৃষ্ণ ও স্বামিজীর অপূর্ব্ব জীবন ও বাণীতে দিন দিন প্রভাবান্বিত হইতে লাগিল। তাহাদের অন্তরে জাগিয়া উঠিল নূতন প্রেরণা, নূতন জাতীয় চেতনা, নূতন ভারতের আদর্শ এবং নূতন মনুষ্যত্বের বোধ। স্বামিজীর প্রবর্ত্তিত নূতন সাধনা সেবাধর্ম্ম তাঁহাদের হৃদয়কে স্পন্দিত ও মথিত করিয়া জনসেবায় উদ্বোধিত করিল। সুযোগ আসিয়াও উপস্থিত হইল। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসের প্রারম্ভে অর্দ্ধোদয় যোগে বাংলাদেশের নানাস্থান হইতে সহস্র সহস্র যাত্রীর দল গঙ্গাস্নান

করিতে কলিকাতায় আসিতে লাগিল। কলিকাতার বিভিন্ন পল্লীতে ঠাকুর ও স্বামিজীর নামে যে প্রতিষ্ঠানগুলি গড়িয়া উঠিয়াছিল তাহাদের সহযোগিতায় ও নির্দ্দেশে যুবকগণ সুগঠিত ও সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া অর্দ্ধোদয় যোগে স্নানার্থী আবালবৃদ্ধবনিতার যে অভূত-পূর্ব্ব সেবা করিয়াছিল তাহা দেখিয়া দর্শকেরা মুগ্ধ ও আকৃষ্ট হইল। সেইদিন হইতে বাংলার যুবকেরা জনসেবাকার্য্যে দীক্ষিত হইয়া আত্মনিয়োগ করিতে শিখিল। আজ শুধু বাংলাদেশে নয় ভারতের সর্ব্বত্র সর্ব্বজাতিতে সর্ব্বসম্প্রদায়ে এমন কি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে ও সর্ব্বধর্ম্মে এই প্রভাব বিস্তারিত হইয়াছে।

১৯০৮ সালের ৭ই এপ্রিল মহারাজ বেলুড় মঠ হইতে কাশীধামে সেবাশ্রমের ভিত্তিস্থাপন করিতে গমন করেন। ১৬ই এপ্রিল বেলা নয়টার সময় নূতন জমিতে ভিত্তি-স্থাপন হইয়াছিল। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে অচলানন্দ যখন কোঠারে ছিলেন মহারাজ তখন তাঁহাকে বলিয়া পাঠান যে কাশীর কাজের দিকে যেন মন থাকে। সেবাশ্রমের এক একটী ওয়ার্ড বা ঘরের সম্পূর্ণ ব্যয় বহনকারী দাতার নাম বা স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশে তাঁহার কোন প্রিয়জনের নাম পাথরে ক্ষোদিত থাকিবে, ইহা বলিয়া মহারাজ স্বয়ং কোন কোন ভক্তের নিকট হইতে গৃহনির্ম্মাণের জন্য অর্থসংগ্রহের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পরে তিনি সেবাশ্রমের কয়েকটী স্মৃতিভবন নির্ম্মাণ করাইতে অচলানন্দকে নিয়োগ করিয়াছিলেন। কাশী সেবাশ্রমের স্মৃতিভবনগুলি মহারাজেরই পরিকল্পনাপ্রসূত। অল্পব্যয়ে পরলোকগত প্রিয়জনের স্মৃতিরক্ষার এই অভাবনীয় সুযোগ কেহ কেহ লইতে লাগিলেন। মহারাজের

এই ভাবটী অতঃপর ভারতের নানা সেবাশ্রম ও শিক্ষায়তন নির্ম্মাণে অনুসৃত হইতেছে। ২৮শে এপ্রিল তিনি কাশীধাম হইতে বেলুড় মঠে রওনা হইলেন। পথে একবার দানাপুরে নামিয়াছিলেন। কাশাধাম হইতে প্রত্যাগত হইয়া মহারাজ মাসাধিককাল বেলুড় মঠে অবস্থান করিয়াছিলেন। সঙ্ঘের কার্য্যপ্রণালী তখন নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং প্রত্যেক বিভাগের কার্য্যের দায়িত্বভার এক এক জনের উপর অর্পিত ছিল। মঠ ও মিশনের সাধারণ কার্য্যাদি স্বামী সারদানন্দ দেখিয়া শুনিয়া ব্যবস্থা করিতেন এবং স্বামী প্রেমানন্দ সঙ্ঘের সর্ব্বপ্রধান কেন্দ্র বেলুড় মঠের কার্য্যপরিচালনা করিতে-ছিলেন। ইঁহারা সকল প্রয়োজনীয় বিষয় মহারাজের গোচরে আনিয়া তাঁহার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেন। মহারাজও পরামর্শ করিয়া প্রায় সকল বিষয়ে তাঁহাদের অনুমোদন ও সম্মতিক্রমে ব্যবস্থা করিয়া দিতেন। গুরুভ্রাতারাও মহা-রাজের যে কোন নির্দ্দেশ শ্রদ্ধার সহিত অকুণ্ঠিত চিত্তে মানিয়া লইতে কোন দ্বিধা বা ইতস্ততঃ করিতেন না। ইহাতে মঠ ও মিশনের কার্য্যপ্রণালী সুসংহত ও সুশৃঙ্খল ভাবে চলিয়া যাইত। স্বামিজী সঙ্ঘকে একটী সুপরিচালিত যন্ত্রের ন্যায় করিতে চাহিয়াছিলেন। মহারাজ তাঁহার অপূর্ব্ব কর্ম্মকৌশলে স্বামিজীর সেই সংকল্প ও পরিকল্পনাকে বাস্তবরূপে পরিণত করিয়াছিলেন। এখন হইতে তিনি ভারতের বিভিন্ন মঠ ও মিশনের কেন্দ্রগুলিতে ঘুরিয়া বেড়াইতেন এবং তাহাদের সর্ব্ববিধ উন্নতির জন্য যথাযথ উপদেশ দিতেন।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে মহারাজ রথযাত্রার কিছু পূর্ব্বে পুরীধামে গমন করিলেন। সেই বৎসর জলপ্লাবনে পুরীজেলার শস্যাদি নষ্ট হওয়ায় ভীষণ অন্নকষ্ট উপস্থিত হইল। মিশনের কর্ম্মীরা তথায় অবিলম্বে চলিয়া গেলেন। তাঁহাদের সেবাকার্য্য দেখিয়া জনসাধারণ ও সরকার বাহাদুর আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হইলেন।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে, রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সাধু-ব্রহ্মচারী এবং গৃহী ভক্তদের সম্মিলিত সহযোগিতায় ও চেষ্টায় শ্রীরামকৃষ্ণের প্রচার ও সেবাকার্য্য যাহাতে ভারতের সর্ব্বত্র সুচারুরূপে সম্পন্ন হয়, এই উদ্দেশ্যে স্বামিজী "রামকৃষ্ণ মিশন" গঠন করিয়াছিলেন। প্রতি রবিবার অপরাহ্নে বলরাম মন্দিরে ইহার সাপ্তাহিক অধিবেশন হইত। শ্রীরামকৃষ্ণের আলোকে শাস্ত্র ও ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে নানা প্রবন্ধে ও বক্তৃতায় আলোচনা হইত। স্বামিজী যখন কলিকাতায় আসিতেন তখন তিনি এই সব অধিবেশনে প্রায়ই উপস্থিত থাকিতেন। তিনি সরলভাবে শাস্ত্রের গূঢ় তাৎপর্য্য বুঝাইয়া দিয়া বর্ত্তমানকালে তাহার উপযোগিতা ও শ্রীরামকৃষ্ণের আবির্ভাবে যে নবযুগের সূচনা হইয়াছে তাহার সাধনা কি ভাবে করিতে হইবে তাহা প্রাণস্পর্শী ভাষায় নির্দ্দেশ করিয়া দিতেন। তাঁহার বাণীতে ফুটিয়া উঠিত তেজোময়ী প্রেরণা, বিদ্যুদ্বাহী উত্তেজনা ও হৃদয়মথনকারী প্রেমের নির্ঘোষ। শ্রোতারা অবাক বিস্ময়ে এই আশ্চর্য্য বক্তার, আচার্য্যবরিষ্ঠের জ্বলন্ত বাক্য শুনিয়া অপূর্ব্ব ভাবে উদ্দীপিত হইত এবং তাহাদের প্রাণে নূতন উৎসাহ ও শক্তি সঞ্চারিত হইত। অধিবেশনের কার্য্য সমাপ্ত হইলে কখন তিনি স্বয়ং, আবার কখন স্বামী সারদানন্দ দুই চারিটী

ভজনগান গাহিতেন। এইরূপ নিয়মিতভাবে মিশনের সাপ্তাহিক অধিবেশন প্রায় দুই বৎসর বেশ চলিয়াছিল।

মিশনের দুর্ভিক্ষমোচনকার্য্য বা জনহিতকর যে কোন কার্য্য মঠের সন্ন্যাসীরাই স্বামিজীর প্রেরণায় ও আদেশে করিতে লাগিলেন। মিশনের গৃহী সদস্যেরা বড় কেহ অগ্রণী হইয়া এইসব কার্য্যে সহযোগিতা করে নাই। কেহ কেহ অর্থদান বা অর্থসংগ্রহে সাহায্য করিয়াছেন। তিন বৎসর এইরূপ ভাবে চলিয়া ধীরে ধীরে মিশনের নামমাত্র বজায় থাকিল,—কালেভদ্রে কখনও দুই একবার অধিবেশন হইত। কিন্তু বেলুড় মঠের সাধুরাই মিশনের নাম বজায় রাখিয়া যাবতীয় প্রচার ও সেবাকার্য্য পরিচালনা করিয়া আশ্রম বা কর্ম্মকেন্দ্র গড়িয়া তুলিতেছিলেন। এইসব কার্য্য বা প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনার জন্য বিশেষ কোন সংগঠনমূলক নিয়ম বিধিবদ্ধ ছিল না। মিশনের সেবাশ্রম প্রভৃতি জনহিতকর প্রতিষ্ঠানে সাধু-ব্রহ্মচারীদের জাতিবর্ণনির্বিবশেষে নিঃস্বার্থ সেবা ও কর্ম্মোদ্যম দেখিয়া যখন সহৃদয় ধর্ম্মপ্রাণ মহোদয়েরা চিরস্থায়ী ভাবে অর্থদান বা endowment করিতে অগ্রসর হইলেন, যখন মিশনের নাম করিয়া জনসাধারণের নিকট প্রতারণা দ্বারা কেহ কেহ অর্থ সংগ্রহ করিয়া স্বীয় স্বার্থসিদ্ধি করিতে লাগিল, যখন আশ্রমের কার্য্যের জন্য সরকারের সহায়তার আবশ্যক হইল, তখন মহারাজ গুরুভ্রাতাদের সহিত পরামর্শ করিয়া মিশনকে প্রচলিত আইনের অন্তর্ভুক্ত প্রতিষ্ঠানরূপে গঠন করিতে উদ্যোগী হইলেন। এই উদ্দেশ্যে মহারাজ ১৯০৮ সালে স্বামী অখণ্ডানন্দ

ও শিবানন্দকে সঙ্গে লইয়া বলরাম মন্দিরে কিছুকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। সারদানন্দও প্রতিদিন তাঁহাদের সহিত মিশন সম্বন্ধে আলোচনা করিতে আসিতেন। মঠের অন্যান্য সাধুদের মধ্যে কেহ কেহ উপস্থিত থাকিয়া এই আলোচনায় যোগ দিতেন। এই বিষয়ে বিশেষ আইনজ্ঞ-দের মতানুসারে এবং অনুমোদনে রামকৃষ্ণ মিশনের উদ্দেশ্য ও নিয়মাবলী রচিত হইল। স্বামিজী মিশনের উদ্দেশ্য ও নিয়মগুলি যাহা স্বয়ং রচনা করিয়াছিলেন তাহা বজায় রাখিয়া আইনানুমোদিত করিবার জন্য কোন শব্দের যোজন, পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন তাঁহারা করিলেন। পরে বেলুড় মঠে মিশনের একটী সভা আহূত হইল। উক্ত সভায় বেলুড় মঠের আটজন ট্রাষ্টী মনোনীত করিয়া পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত নিয়মাবলী সহ মিশনকে রেজেষ্টারী করিবার প্রস্তাব সকলে অনুমোদন ও গ্রহণ করিলেন। এই ভাবে গঠিত মিশন ১৯০৯ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা মে তারিখে রেজেষ্টারী করা হইল।

এইরূপে ধীরে ধীরে স্বামিজীর পরিকল্পনা ও বাণী সঙ্ঘে রূপায়িত হইয়া উঠিল। "কর্ম্ম ও উপাসনা"—নবযুগের এই সাধনা, এই নূতন ভাবধারা প্রাচীন যুগের সংস্কৃতি ও সাধনার অপূর্ব্ব সমন্বয়ের মিলিত পূত প্রবাহ। ইহাই যুগধর্ম্ম, শ্রীরামকৃষ্ণের সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ে ইহার বীজ উপ্ত, স্বামিজীর অপূর্ব্ব জীবনাদর্শে ও বাণীতে ইহা অঙ্কুরিত এবং মহারাজের ঐকান্তিক অনুরাগে ও যত্নে ইহা পুষ্ট ও বর্দ্ধিত।

একদিন সমাধিমগ্ন শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন, "জীবে দয়া,

না না, দয়া নয়—সেবা, শিবজ্ঞানে জীবসেবা।” স্বামিজী এই দিব্য বাণীতে অপূর্ব্ব নূতন তত্ত্বের সন্ধান পাইলেন। স্বামিজী সেদিন তাঁহার জনৈক গুরুভ্রাতাকে বলিয়াছিলেন, “আজ এক নূতন আলোকে চিত্ত উদ্ভাসিত হইল—যদি সময় আসে তবে এই নূতন তত্ত্ব জগতে প্রচার করিব।” স্বামিজীর সাধনায়, স্বামিজীর বাণীতে, স্বামিজীর কর্ম্মে ফুটিয়া উঠিল নবযুগের মহামন্ত্র,—প্রত্যক্ষ জীবন্ত নারায়ণের সেবা।

“বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর!
জীবে প্রেম করে যেই জন—সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।”

“কর্ম্ম ও উপাসনার” দিব্যরূপ প্রকাশ পাইয়াছে সেবাধর্ম্মে। বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্যদেশ রজঃপ্রধান, কর্ম্মপ্রবণ; উহার শিক্ষা, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্প, কলা প্রভৃতি সমুদয় সংস্কৃতি ও সভ্যতা ভোগমুখী—অর্থাৎ ভোগকে কেন্দ্র করিয়াই তাহাদের গতি। আধুনিক সভ্য জাতি মনে করেন যে, ভোগ্যবস্তুকে সুলভ ও আয়ত্ত করিতে পারিলেই মনুষ্যজাতির সুখস্বাচ্ছন্দ্য,—সমগ্র মানবের কল্যাণ। ভারতবর্ষে সমুদায় সংস্কৃতি ও সভ্যতার গতি ত্যাগ ও বৈরাগ্য সহায়ে ঈশ্বরাভিমুখী। ঈশ্বরকে কেন্দ্র করিয়াই ভারতের সাধনা ও সংস্কৃতি বহুমুখী হইয়া সেই অনন্ত জ্ঞান ও প্রেমসমুদ্রে মিলিত হইয়াছে। কিন্তু কালে কর্ম্মে নিস্পৃহতা ও উদ্যমহীনতায় ভারতবাসী দিন দিন তমঃসমুদ্রে নিমগ্ন হইতে লাগিল। স্বামিজী প্রচার করিলেন এই তমোগুণ অপসারিত করিয়া রজোগুণ আশ্রয় না করিলে ভারত শুদ্ধ-সত্ত্বগুণসম্পন্ন হইয়া পরমার্থ লাভ করিতে সক্ষম হইবে না।

পাশ্চাত্যদেশকে বাঁচিতে হইলে আধ্যাত্মিক সাধনায় রজোগুণকে পরাহত করিয়া সত্ত্বগুণের আশ্রয় লইতে হইবে। ভারতকেও বাঁচিতে হইলে পূর্ণ কর্ম্মযোগী হইতে হইবে। পৃথিবী কর্ম্মক্ষেত্র—নিষ্কাম কর্ম্মের ইহা সাধনভূমি। মহারাজ বলিতেন, "কর্ম্ম না করে জ্ঞানলাভ হয় না। যারা কর্ম্ম ছেড়ে শুধু ধ্যানজপ, সাধনভজন নিয়ে থাকে তাদেরও ঝুপ্‌ড়ি বাঁধতে আর ভিক্ষে করতেই সময় কেটে যায়।" প্রশ্ন হইতে পারে কর্ম্ম তো একটা বন্ধন—জীবনে উহা বন্ধনই লইয়া আসে। মহারাজ তদুত্তরে অভয় দিয়া বলিতেছেন, "ঠাকুর-স্বামিজীর কর্ম্মে কোনও বন্ধন আসে না। তাঁদের কাজ করছি, এইভাব নিয়ে কাজ করলে কোন বন্ধন তো হয়ই না বরং শারীরিক, নৈতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক সব দিকেই উন্নতি হবে। তাঁদের পায়ে আত্মসমর্পণ কর, তাঁদের গোলাম হয়ে যাও, তাঁদের একান্ত শরণাগত হও।" গীতায়ও শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, "যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।" আবার মঠের সাধু, ব্রহ্মচারী ও কর্ম্মীদিগকে তিনি সর্ব্বদা স্মরণ করাইয়া দিতেন, "কর্ম্মই জীবনের উদ্দেশ্য নয়, জীবনের উদ্দেশ্য—ঈশ্বর লাভ।" কর্ম্ম ও উপাসনা এক সঙ্গে করা কঠিন, ইহা বলিয়া কেহ আপত্তি করিলে মহারাজ তাহাকে বলিতেন, "দুচার বার পারলে না বলে মনে করো না, পারবে না। বার বার চেষ্টা করতে হয়। ঠাকুর বলিতেন, 'বাছুরটা দাঁড়াতে গিয়ে কতবার পড়ে যায় তবুও ছাড়ে না—শেষে দৌড়তে শেখে।' পাশ্চাত্য জাতকে দেখতে পাচ্ছ না? লড়াই বেঁধেছে—ওরা স্বদেশের জন্য স্ত্রীপুত্র ভোগবিলাস সব ত্যাগ করে

নিজের নিজের কাঁচা মাথা দিচ্ছে, তাদের চেয়ে কত বড় শ্রেষ্ঠ উদ্দেশ্যে, ভগবান লাভের জন্য, জগতের কল্যাণের জন্য তোমরা বাড়ীঘর সব ছেড়ে দিয়ে ঠাকুরের কাছে মনপ্রাণ সব সমর্পণ করেছ—তবু কর্ম্মে বিরক্তি প্রকাশ কর ?"

সঙ্ঘের কোন কর্ম্মী বা সাধক যখন শুধু ধ্যানজপ লইয়া একান্তে সাধনভজন করিতে চাহিতেন বা তপস্যা করিতে অন্যত্র যাইতে ইচ্ছা করিতেন তখন তাঁহাকে মহারাজ বলিতেন, "কর্ম্ম আর উপাসনা একসঙ্গে করবার অভ্যাস করতে হবে। কেবল সাধনভজন নিয়ে থাকতে পারলে ভাল কিন্তু কয়জনে তা পারে ? আমরাও পাঁচ ছয় বছর ঘুরে ঘুরে তার পর কাজে লাগি। স্বামিজী আমাকে ডেকে বল্লেন, 'ওরে, ওতে কিছু নেই।' আমরাও তো সব রকম কাজ করেছি, তাতেও তো কিছু খারাপ হয় নি।" কর্ম্ম ও উপাসনার একত্র সাধনা কি ভাবে করিতে হয় তাহাও তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি বলিতেন, "কাজ করবার সময় একবার তাঁদের প্রণাম করবি। আবার কাজ করতে করতে মাঝে মাঝে অবসর পেলে তাঁদের স্মরণ মনন করবি। কাজ শেষ করে আবার প্রণাম করবি।" তিনি সকলকে বিশেষ করিয়া বলিতেন, "ঈশ্বরের দিকে লক্ষ্য স্থির রাখলে মনের একটা শক্তি জন্মে। বার আনা মন ভগবানের দিকে রেখে চার আনায় জগতের কাজ ভেসে যায়।" ফলকামনার প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া অনুরাগের সহিত কর্ম্ম করাই যথার্থ নিষ্কাম কর্ম্মের সাধনা। এই জন্য যাহা কিছু করা যায় তাহা শ্রীভগবানেরই কাজ বলিয়া বোধ থাকিলে ফলে

আসক্তি আসিতে পারে না—কর্ম্ম ও উপাসনাযুক্ত সাধনার ইহাই কৌশল। নিষ্কাম কর্ম্মের সাধনায় তিনি বলিতেন, "মাথা ঠাণ্ডা রেখে কাজ করা বড় কঠিন। ত্যাগ বৈরাগ্য খুব দরকার, তা না হলে ডুবতে হয়।" তাই বারংবার তিনি বলিতেন, "তীব্র কর্ম্ম কর আর নাম কর। সব কর্ম্মের ভিতর কর দেখি তাঁর নাম।"

আধ্যাত্মিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘের জনহিতকর কর্ম্মযোগই নিঃস্বার্থ কর্ম্ম; ভাবহীন কর্ম্ম ও আন্তরিকতাশূন্য উপাসনা মানবজীবনে কোন সুফল উৎপন্ন করিতে পারে না। স্বামিজী পাশ্চাত্য আদর্শে মানবকল্যাণধর্ম্ম প্রচার করেন নাই, কারণ মানুষের প্রতি অনুকম্পাবশতঃই উহা সাধিত হয়। রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সেবাধর্ম্ম মানুষের বা জীবের সেবা নয়, ইহা জীবন্ত ভগবানের অর্চ্চনা—প্রেমে ও ভক্তিতে নারায়ণের সেবা। যথার্থ তত্ত্বদর্শী সাধক দেখিতে পান শ্রীভগবান জীবের কল্যাণের জন্যই অন্ধ, আতুর, দরিদ্র, মূর্খ, রুগ্ন, পরপদবিদলিত, আর্ত্ত মানবের বেশে আবির্ভূত হইয়া তাহার অন্তরের সুপ্ত প্রেমকে জাগ্রত করিয়া পূজা ও সেবা লইতেছেন। এক্ষেত্রে সেবক সেবা করিয়াই কৃতার্থ। দম্ভ, অভিমান, নিজের আভিজাত্যবোধ, উচ্চ বা শ্রেষ্ঠ ভাবের গৌরবে অনুকম্পা প্রভৃতি মন হইতে সম্পূর্ণরূপে পরিহার করাই স্বামিজীর প্রবর্ত্তিত সেবাধর্ম্ম। এই সেবাধর্ম্মেই জ্ঞানী সেই ব্রহ্মানুভূতিতে সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করিতে পারিবেন, যোগী এই সেবাধর্ম্মে পরমাত্মার সহিত নিত্যযুক্ত হইয়া পরমানন্দ

লাভ করিবেন, ভক্ত প্রেম-ভক্তিতে 'তৃণাদপি সুনীচেন' হইয়া সাক্ষাৎ জীবন্ত সচ্চিদানন্দবিগ্রহের সেবা করিয়া লীলানন্দে বিভোর হইবেন, নিঃস্বার্থ কর্ম্মযোগী সেবাধর্ম্মেই পরম শ্রেয়ঃ ঈশ্বর লাভ করিতে পারিবেন। স্বামিজীর প্রচারিত সেবাধর্ম্ম যাহাতে পাশ্চাত্য আদর্শে শুধু মানবকল্যাণধর্ম্মে পরিণত হইয়া ঈশ্বরানুভূতি হইতে বিচ্যুত না হয় তাই তিনি সকলকে জপধ্যান ও সাধনভজনের দিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিতে বলিতেন। কিন্তু যাহাদিগকে যথার্থ নিষ্কাম কর্ম্মের অধিকারী মনে করিতেন তাহাদিগকে বলিতেন, "নিষ্কাম কর্ম্ম করলে ভগবান লাভ হয়। গীতায় আছে—

'কর্ম্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ'।

'অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ' ॥

গীতা এবং অন্যান্য শাস্ত্র তো ঐ কথাই জোর করে বলেছেন দেখতে পাবে।" শাস্ত্রবাক্য যে সত্য তাহা তাহাদের হৃদয়ে সুদৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করিবার জন্য বলিতেন, "এই বিষয়ে আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলছি। স্বামিজী আমাদের বলতেন, 'ওরে, বহুজনহিতায় যদি একটা জন্ম বৃথা গেল মনে করিস্—তা গেলই বা। কত জন্ম তো আলস্যে কেটে গেছে—একটা জন্ম না হয় জগতের কল্যাণকর্ম্মেই গেল—তাতে ভয় কি?" এই ভাবে নিষ্কাম কর্ম্মে উদ্বোধিত করিয়া মহারাজ বলিতেন, "ত্যাগ বৈরাগ্যের সঙ্গে ভগবানকে আশ্রয় না করে কর্ম্ম করতে গেলে অনেক সময় বিপদে পড়তে হয়, কেউ কেউ নরকে ডুবে যায়। তাই ঠাকুরের শরণাগত হয়ে তাঁর কর্ম্ম জেনে কাজ করলে দিন

দিন চিত্ত শুদ্ধ হয়। শুদ্ধ চিত্তে ধ্যান জপ খুব জমে।" কর্ম্ম ও উপাসনার ইহাই মূলমন্ত্র।

দেশের যুবশক্তি যখন রাষ্ট্রচেতনায় উদ্বুদ্ধ হইয়া পাশ্চাত্য আদর্শে রাজনৈতিক বিপ্লব আনিবার জন্য উন্মত্ত হইয়াছিল, যখন তাহারা জাতির মুক্তি ও স্বাধীনতার আশায় ন্যায়-অন্যায় বিচার না করিয়া প্রতীচ্য বিপ্লবীদের আদর্শে কোন দুষ্কর ও দুষ্কৃত কার্য্য করিতে ইতস্ততঃ বা দ্বিধা করিত না, যখন তাহারা সকল প্রকার নির্য্যাতন ও বিরুদ্ধ শক্তিকে উপেক্ষা করিয়া তাহাদের আদর্শ কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য উগ্র ও অধীর হইয়াছিল, তখন মহারাজ সেই রাষ্ট্রচেতনাকে পরমার্থ-ভিত্তির উপর সংস্থাপিত করিয়া তাহাদের দেশাত্মবোধ ও দেশপ্রেমকে স্বামিজীর সুনির্দ্দিষ্ট পথে জাতির কল্যাণার্থ মঠ ও মিশনের গঠনমূলক কার্য্যে পরিচালিত করিয়াছিলেন। যখন রাজরোষে নিপতিত এই নির্য্যাতিত যুবকদিগকে কেহ সামান্য আশ্রয় দিতেও সাহসী হইত না, যখন আত্মীয়-স্বজন তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, যখন তাহাদের সহিত কোনরূপ ব্যবহার ও আলাপ-পরিচয় করিতে লোকে ভীত ও সঙ্কুচিত হইত, তখন মহারাজের পদতলে বসিয়া তাহাদের কেহ কেহ মঠ ও মিশনের বিশাল ক্রোড়ে আশ্রয় পাইয়াছে। তিনি দেখিয়াই তাহাদের প্রকৃতি বুঝিতে পারিতেন। যাহারা প্রকৃত সরল, সদ্‌গুণবিশিষ্ট ও দৃঢ়চরিত্র, যাহারা সত্যবাক্, সত্যনিষ্ঠ ও শ্রদ্ধাপরায়ণ, যাহারা যথার্থরূপে পরার্থে জীবন উৎসর্গ করিতে বদ্ধপরিকর, সেইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যুবকদিগকে তিনি গ্রহণ

করিয়াছিলেন। ইহাদের সততা ও সত্যনিষ্ঠার উপর আস্থা ও বিশ্বাস রাখিয়াই মহারাজ নির্ভীক হৃদয়ে তাহাদিগকে সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। এই কার্য্যে শাসক-সম্প্রদায়ের সন্দেহ-চক্ষু মঠ ও মিশনের প্রতি সাময়িকভাবে পতিত হইলেও তিনি বিচলিত হন নাই। কারণ ইহাতে কোন রাজনৈতিক অভিসন্ধি ছিল না এবং এই মঠ ও মিশনের জনকল্যাণকার্য্যে একদিন তাহাদের এই ভ্রান্ত সংশয় তিরোহিত হইবে—ইহা তাঁহার নিশ্চিত ধারণা ছিল। এই সকল যুবক পারমার্থিক দৃষ্টিলাভ করিয়া ব্রহ্মচর্য্য এবং সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক মঠ ও মিশনের কার্য্যে আত্মনিয়োগ করে। ভারতের ঘরে ঘরে তখন মঠ-মিশনের উপর লোকের অগাধ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস ছিল এবং কেহ কেহ আধ্যাত্মিক জীবনলাভের জন্য মহারাজের কৃপা পাইয়া ধন্য হইয়াছে।

মহারাজ বলিতেন, "অনেকে বলে দেশের ও দশের কাজ করবে। আমার মনে হয়, এভাব ইংরাজী-শিক্ষার বদহজম। নিজের চরিত্র তৈরী না হলে, তার দ্বারা অপরের কল্যাণ কখনও সম্ভব হয় না। যারা তাঁকে ঠিক ঠিক আশ্রয় করেছে, তাঁর কৃপালাভ করেছে, তাদের কখনও বেচাল হয় না। তাদের কাজকর্ম্ম, কথাবার্ত্তা, চালচলন দেশের মঙ্গলের কারণ হয়।"

মহারাজের এই দিব্যবাণীতে অনুপ্রাণিত হইয়াই লোকের দুঃখদুর্দ্দশামোচনে, দুর্ভিক্ষে, বন্যায়, অগ্নিদাহে এবং অন্যান্য জাগতিক কল্যাণকর কার্য্যে মঠের সাধুব্রহ্মচারীদের ভাবরসে পুষ্ট হৃদয়ে স্বতঃই সেবাভাব উত্থিত হইত। মহারাজের

অনুমতি লইয়া তাহারা সমবেতভাবে তাহাদের পরিকল্পনানুযায়ী তাহা সাধন করিতেন। তিনি পরমানন্দে সেই কার্য্যে তাহাদিগকে উৎসাহ দিয়া সস্নেহে তাহাদের স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ উপদেশ দিতেন এবং যাহাতে কোনরকম অনিয়ম, অনাচার, কদাচার বা অত্যাচার না হয় তজ্জন্য বারংবার সতর্ক করিতেন। স্বাস্থ্য-রক্ষার জন্য পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন থাকা, বাজার হইতে দুগ্ধ, দধি, খাবার কিনিয়া না খাওয়া, পানীয় জল ফুটাইয়া পান করা প্রভৃতি সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলিও আবশ্যক মত বিশেষভাবে বলিয়া দিতেন। মহারাজের এই স্নেহ ও প্রীতিপূর্ণ উপদেশ তাহাদের রক্ষা-কবচের মত কাজ করিত। তাহারা বিভিন্ন দেশে আর্ত্ত, রুগ্ন, দরিদ্র, অনাহারী বা অর্দ্ধাহারী খুঁজিয়া জাতিনির্ব্বিশেষে তাহাদের সেবা করিয়াছে। যেখানে দুর্ভিক্ষের করালমূর্ত্তি, যেখানে মহামারী মৃত্যুর বিভীষিকা, যেখানে জলপ্লাবন, গৃহদাহ এবং ভূমিকম্পে ধ্বংসের ভীষণ তাণ্ডবলীলা, তাহারা শরীরের দিকে দৃকপাত না করিয়া এমন কি মৃত্যুভয় তুচ্ছ করিয়া প্রাণপণে ক্লিষ্ট নরনারীদিগের সেবা, যত্ন ও সহায়তা করিয়াছে। মহারাজের প্রাণঢালা ভালবাসার ইঙ্গিতে এই সব কার্য্য নিষ্পন্ন হইত। তাঁহারই প্রীতি বা তুষ্টির জন্যই যেন সর্ব্বত্যাগী যুবক সাধুর দল কোন ক্লেশকেই ক্লেশ বোধ করিত না, ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও বিশ্রাম সময়ে সময়ে ভুলিয়া যাইত এবং তাঁহারই প্রেমমাখা বাণীতে ঠাকুর ও স্বামিজীর আদর্শে ও নামে তাহাদের প্রতি ধমনীতে তড়িৎ-প্রবাহ সঞ্চারিত হইত। তাহারা বুঝিত না বা বুঝিতে চেষ্টা করিত না যে, তাহারা

কোন মহৎ কার্য্য করিতেছে। এই সকল কার্য্যের প্রেরণার মূলে ছিল আনন্দময় মহারাজের ভালবাসা ও তাঁহার প্রীতিসাধনে কর্মীদের আপ্রাণ চেষ্টা। মহারাজের কোন আদেশ পালন করিতে পারিলেই তাহারা আপনাদিগকে ধন্য ও কৃতার্থ বোধ করিত।

মহারাজের লোক চিনিবার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। কাহাকেও দেখিলেই তিনি বুঝিতেন সে কিরূপ প্রকৃতির লোক। সঙ্ঘের সাধু-ব্রহ্মচারী কর্ম্মিবৃন্দের প্রকৃতি বুঝিয়াই তিনি কার্য্যের দায়িত্ব-ভার অর্পণ করিতেন। কে কোন কাযের উপযুক্ত এবং তাহার কর্ম্মশক্তি কতটা পরিমাণে আছে তাহা দেখামাত্র মুহূর্ত্তে তিনি বুঝিয়া লইতেন। যে কর্ম্মপ্রবণ তাহাকে তিনি সামর্থ্যানুযায়ী নিষ্কাম কার্য্যে নিয়োগ করিতেন, যে ভজনপরায়ণ তাহাকে ধ্যানজপে ও সাধনভজনে উৎসাহ দিতেন, যে জ্ঞানী বিদ্বান তাহাকে শাস্ত্রচর্চ্চা ও সদ্‌বস্তুবিচারে উৎসাহ দান করিতেন। কিন্তু প্রত্যেককেই স্বামিজীর প্রদর্শিত কর্ম্ম ও উপাসনার আদর্শে জীবনের সাধনাকে পরিচালিত করিতে বলিতেন।

যাহাকে যখন কোন কার্য্যের ভার বা দায়িত্ব দেওয়া হইত তখন তাহাকে মহারাজ সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করিতেন। তাহার কোন দোষ ত্রুটী বা অন্যায় আচরণ দেখিলেও তাহা উপেক্ষা করিতেন, কার্য্যপরিচালনা সম্বন্ধে তাহাকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতেন। সঙ্ঘসংগঠনে ইহা তাঁহার অপূর্ব্ব মাধুর্য্যপূর্ণ কর্ম্মকৌশল। যে দায়িত্ব, যে স্বাধীনতা, যে পূর্ণ বিশ্বাস তাহার উপর ন্যস্ত হইত, সেই দায়িত্ব, সেই স্বাধীনতার সুযোগ, সেই অবিচল বিশ্বাসের মর্য্যাদারক্ষা এবং কার্য্যের সফলতার উদ্দেশ্যে তাহাকে একাগ্রভাবে

চিন্তা করিতে হইত। কার্য্যের পরিচালনায় কোনরূপ বিশৃঙ্খলতা বা ত্রুটী না ঘটে সেদিকে তাহাকে সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইত। মহারাজ তাহার উপর যে বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন, কার্য্যে ও ব্যবহারে কোন প্রকারে সেই বিশ্বাসের লাঘব না হয় সেজন্য তাহার প্রাণপণ যত্ন থাকিত। এই ভাবে সঙ্ঘের সকল কার্য্যই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত।

সর্ব্বোপরি ছিল মহারাজের অগাধ প্রাণঢালা ভালবাসা, পাবনকরী প্রীতির পূতপ্রবাহ এবং করুণামিশ্রিত স্নেহপূর্ণ সুমিষ্ট বাক্যলহরী—যাহার স্পর্শে মানুষ দেবতা হয়, জড় পাষাণহৃদয় দ্রবীভূত হইয়া যায় এবং বজ্রদৃঢ় কঠিন লৌহও গলিত কাঞ্চনের আকার ধারণ করে। এই স্পর্শমণির স্পর্শ যে না পাইয়াছে সে ইহা বুঝিতে পারিবে না বা ধারণা করিতে পারিবে না। যে স্নেহের অঞ্জনে পিতামাতার চক্ষে সন্তানের শত অপরাধ ধরা পড়ে না, মহাপুরুষগণ দিব্যভাবময় দৃষ্টিতে—সেই স্নেহের অঞ্জনে কাহারও দোষ দেখিতে পান না—তাঁহারা সতত অদোষদর্শী। দেখা যায় সমাজে, সংসারে যাহারা অবজ্ঞাত, ঘৃণিত, পরিত্যক্ত ও পাপিষ্ঠ বলিয়া পরিচিত তাহারাও মহাপুরুষদের নিকট আদৃত, সম্মানিত, আশ্রিত এবং গুণী বলিয়া প্রশংসিত। এই দিব্য যাদুদণ্ডের স্পর্শেই মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি জাগিয়া উঠে—ভিতরের দিব্য মানুষটী ধীরে ধীরে প্রকাশ পায় এবং কর্ম্মে অলৌকিক অনন্ত কল্যাণের প্রতিষ্ঠা হয়। মহারাজ এইরূপে ধীরে ধীরে কর্ম্মীসাধককে ও ভক্তকে রূপান্তরিত করিয়া সঙ্ঘের কল্যাণময়ী শক্তি জাগ্রত করিয়াছিলেন। ইহাই ছিল

তাঁহার সঙ্ঘসংগঠনে নিষ্কাম কর্ম্মচক্রের অপূর্ব্ব কৌশল। ইহাই সঙ্ঘের প্রাণশক্তি—সঙ্ঘের বিস্তার।

মহারাজ সকল প্রকার কাজকর্ম্ম ও জাগতিক ব্যাপারের উর্দ্ধে অতীন্দ্রিয় উচ্চ ভাবভূমিতে নিয়ত অবস্থান করিয়াও সঙ্ঘকে দৃঢ় ও শক্তিসম্পন্ন করিলেন। এইরূপ পরমহংসের ন্যায় বিরাজ করিয়াই তিনি সঙ্ঘের বিস্তার করিয়াছিলেন। মঠ ও মিশনের যাবতীয় সদনুষ্ঠান, প্রতিষ্ঠান এবং জনহিতকর কার্য্যের প্রেরণার মূলে থাকিয়াও তিনি ছিলেন অনাসক্ত, একক, নির্দ্বন্দ্ব এবং সমাহিত। বালকবৎ কোমল, সরল ও আনন্দময় হইয়াও তিনি ছিলেন প্রশান্ত, অচঞ্চল এবং গম্ভীর। এই অপূর্ব্ব দিব্যভাবেই আধ্যাত্মিক তরঙ্গের প্রবাহে তিনি নীরবে সঙ্ঘের সম্প্রসারণ করিয়াছিলেন। দিব্যকর্ম্মময় জীবনের তিনি ছিলেন জীবন্ত আদর্শ। এই দিব্য কর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়াই শ্রীভগবান গীতায় বলিয়াছেন :—

"জন্ম কর্ম্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জ্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জ্জুন॥

অর্থাৎ হে অর্জ্জুন! যে আমার এইরূপ অলৌকিক জন্ম এবং কর্ম্ম যথার্থরূপে জানে, তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না, সে আমাকে লাভ করে।"

কতকটা আভাস পাবে। ব্রহ্মানন্দের অহংটা সম্পূর্ণরূপে মুছে গেছে। যা তিনি বলেন, যা তিনি করেন—তা ঠাকুরের প্রেরণায়। আমরা তাঁকে শ্রীরামকৃষ্ণের পুত্রজ্ঞানে ভক্তি করি। ঠাকুর তাঁকে ঠিক নিজের ছেলের মতই দেখতেন। তিনি ঠাকুরের ঘরেই শুতেন, কখনও কখনও এক মশারির ভেতরেই থাকতেন। রাখালের পরিধানে কোন ছিন্নবস্ত্র দেখলে তিনি কেঁদে ফেলতেন আর চেঁচিয়ে বলতেন, 'রাখালকে নূতন কাপড় দেবার কি কেউ নেই?' ঠাকুরের জন্য কেউ কোন ফল মিষ্টি বা খাবার জিনিষ আনলে অনেক সময় তিনি তাদের বলতেন, 'ও সব রাখালকে দাও—আমি তার মুখে খাই।' একদিন রাত্রে ঠাকুরের পিপাসা পায়। তিনি রাখালকে খাবার জল দিতে বল্লেন। রাখাল বিছানায় শুয়ে তন্দ্রাঘোরে বিড় বিড় করে পারবেন না বলে পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়লেন। গুরুমহারাজের এতে আনন্দ যেন উথলে উঠল। তিনি পর দিন খুব আনন্দ করে সবাইকে এই ঘটনাটী আনুপূর্ব্বিক উল্লেখ করে বলেছিলেন, 'এখন বুঝেছি রাখাল আমাকে ঠিক বাপ বলেই জানে।' মহারাজকে লইয়া আসিবার জন্য রামকৃষ্ণানন্দ যথাসময়ে পুরীধামে যাত্রা করিলেন।

নীলাচলে রামকৃষ্ণানন্দকে দেখিয়া মহারাজ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা সরস প্রেমের সম্বন্ধ ছিল। উভয়ের মধ্যে প্রায়ই পত্রব্যবহার চলিত। মহারাজ পত্রে তাঁহাকে কখনও 'মোহান্ত', 'মোহান্তজী', 'মোহান্ত মহারাজ', আবার কখনও 'His Holiness' প্রভৃতি

সরস সম্বোধন করিতেন। পুরীধামে কয়েকদিন অবস্থানের পর ১৯০৮ সালের ২৭শে অক্টোবর রামকৃষ্ণানন্দের সঙ্গে মহারাজ মাদ্রাজ অভিমুখে রওনা হইলেন।

মহারাজের আগমনোপলক্ষে মঠটী পত্রপুষ্পাদিতে সাজান হইয়াছিল। সেদিন প্রত্যূষে বৃষ্টি হইলেও ষ্টেসনে মহারাজের দর্শনার্থী লোকের খুব ভিড় হইয়াছিল। ট্রেন মাদ্রাজ ষ্টেসনে পৌঁছিলে সেই জনতা আনন্দে ছুটীয়া আসিয়া যে কামরায় মহারাজ ও রামকৃষ্ণানন্দ ছিলেন তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। মহারাজকে তাঁহারা পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিয়া শ্রদ্ধাবনত মস্তকে প্রণত হইল এবং মহারাজও প্রত্যেককেই হাসিমুখে সম্ভাষণ করিলেন।

স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা এবং ভক্তগণ মঠে মহারাজকে দর্শন করিতে সর্ব্বদা আসিতেন। তাঁহার প্রশান্ত ও আনন্দময় মূর্ত্তি দেখিয়া এবং মধুর উপদেশ শুনিয়া সকলে পরম তৃপ্তি ও শান্তি বোধ করিতেন। সিষ্টার দেবমাতা তখন মাদ্রাজে ছিলেন। তাঁহার প্রণীত 'Days in an Indian Monastery' পুস্তকে মহারাজ সম্বন্ধে তৎকালের অনেক ঘটনা তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "স্বামী ব্রহ্মানন্দ অত্যন্ত গম্ভীর ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সমগ্র মুখমণ্ডল বালসুলভ হাসিতে সর্ব্বদা উদ্ভাসিত থাকিত। তিনি খুব কম কথা বলিতেন। মাদ্রাজে যদি কেহ কোন প্রশ্ন বা জটিল সমস্যা সমাধানের জন্য তাঁহার নিকট আসিত, তবে অমনি তাহাকে বলিতেন, 'স্বামী রামকৃষ্ণানন্দের কাছে যাও—তিনি জ্ঞানী ও পণ্ডিত। আমি

কিছু জানি না'। কিন্তু তাঁহার জীবনের দৈনন্দিন মহত্বপূর্ণ পবিত্র আচরণ লোকের হৃদয়ে অজ্ঞাতসারে প্রভাব বিস্তার করিত। তিনি যে কয়টী কথা বলিতেন, তাহাতে নিঃসৃত হইত তাঁহার কল্যাণময়ী বাণী ও মঙ্গলময় আশীর্ব্বাদ। তাঁহার অন্তর্মুখী ভাব প্রকাশ পাইত বাহিরের অপার্থিব গাম্ভীর্য্যে।" বাস্তবিকই মহারাজকে বাহিরে দেখিলে মানুষ সহজে বুঝিতে পারিত না যে তিনি এতটা আধ্যাত্মিক শক্তির আধার।

ঠাকুর মহারাজকে বলিতেন 'বর্ণচোরা আম'। তাঁহার সদানন্দ ভাব, হাস্যপরিহাস, অমায়িক ব্যবহার এবং সাধারণ মানুষের মত বাহ্যিক আচরণ দেখিয়া কে বুঝিবে যে ইনি নরোত্তম লোকপূজ্য মানুষ? কিন্তু যাহারা তাঁহার সংস্পর্শে আসিত, যাহারা অশান্তির দাবদাহে দগ্ধ হইয়া অধীরভাবে তাঁহার আশ্রয় লইত, তাহারা প্রাণে প্রাণে বুঝিত ইঁহার দিব্য তড়িন্ময়ী শক্তি, অলৌকিক অনুপম মাধুর্য্য এবং অফুরন্ত শান্তশীতল স্নেহ। যাহারা ইহার বিন্দুমাত্র আস্বাদ পাইয়াছে তাহারা সে মিষ্টতা, সে মধুর রস জীবনে কখনও ভুলিতে পারিবে না। স্বামী রামকৃষ্ণা-নন্দও ঠাকুরের বীরভক্ত নাট্যসম্রাট মহাকবি গিরিশচন্দ্রকে লিখিয়াছিলেন যে মহারাজকে কেহ চিনিতে পারে না। তদুত্তরে ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ১২ই ডিসেম্বর তারিখের পত্রে গিরিশবাবু লিখিয়াছিলেন, "তুমি আমায় লিখিয়াছিলে রাখালকে কেউ চিনিতে পারে না। আমার ধারণা, যে ভাগ্যবান রাখালকে চিনিবে, সে সেইদিনই মহারাজের কৃপা প্রাপ্ত হইবে—তাহার মানুষ জন্ম সফল। ভাগ্যধর ব্যক্তি ব্যতীত রাখালকে বা মহা-

রাজের আশ্রিত অপর কোন মহাপুরুষকে কে চিনিবে?" গিরিশবাবু এখানে শ্রীশ্রীঠাকুরকে "মহারাজ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

একদিন মান্দ্রাজ মঠে সন্ধ্যারতির সময় ঠাকুরঘরসংলগ্ন হল-ঘরের এক প্রান্তে কম্বলাসনে বসিয়া মহারাজ ঠাকুরের আরতি দেখিতেছিলেন। দেখিতে দেখিতে সহসা তিনি সমাধিমগ্ন হইলেন। তাঁহার শরীর স্থির, নয়নযুগল মুদ্রিত এবং অধরে আনন্দময় হাসি। আরতি হইয়া গেলে রামকৃষ্ণানন্দ মহারাজের সমাধি লক্ষ্য করিয়া একটী যুবা সন্ন্যাসীকে পাখার দ্বারা ধীরে ধীরে তাঁহাকে বাতাস করিতে ইঙ্গিত করিলেন। একটী বালক তখন হলঘর অতিক্রম করিয়া যাইতেছিল, সে মহারাজের এইরূপ অপূর্ব্ব ভাব দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। প্রায় আধঘণ্টা পর্য্যন্ত সকলে স্তব্ধহৃদয়ে নীরব-নিস্পন্দভাবে বসিয়া থাকিলেন। মহারাজ যখন ধীরে ধীরে নয়ন উন্মীলন করিয়া চারিদিকে তাকাইলেন, তখনও যেন তাঁহার তন্দ্রাচ্ছন্ন দৃষ্টি। পরে তিনি আসন হইতে গাত্রোত্থান করিয়া মৃদুপদ-সঞ্চারে ঘরে প্রবেশ করিলেন। সেদিন সন্ধ্যার পর আর বাহিরে তিনি বসিলেন না।

বড়দিনের সময় মহারাজ দেবমাতাকে তাঁহার বাসগৃহে পাশ্চাত্য প্রথায় খৃষ্টসম্প্রদায়ের রীতি অনুসারে যীশুখৃষ্টের জন্মোৎসব পালন করিতে আদেশ করিয়াছিলেন। দেবমাতা তাঁহার আজ্ঞানুযায়ী সাধ্যমত উৎসবের সমুদয় আয়োজন করিলেন। ঠিক অপরাহ্ণ বেলা চারটার সময় রামকৃষ্ণানন্দ

ও কতিপয় নিষ্ঠাবান মাদ্রাজী ব্রাহ্মণ-ভক্তের সঙ্গে মহারাজ তাঁহার গৃহে উপনীত হইলেন। উৎসবস্থলে উপস্থিত হইয়া বাইবেল গ্রন্থ হইতে যীশুখৃষ্টের জন্মকথা সমবেত সকলকে পড়িয়া শুনাইতে তিনি দেবমাতাকে আদেশ করিলেন। দেবমাতা তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "যখন আমার পাঠ সমাপ্ত হইল তখন নিবিড় নিস্তব্ধতার ভাব দেখিয়া আমার দৃষ্টি পতিত হইল স্বামী ব্রহ্মানন্দের দিকে। তাঁহার উন্মীলিত নয়নদ্বয় স্থিরভাবে বেদীর উপর নিবদ্ধ, অধরে হাসি এবং মন কোন ভাবভূমিতে বিচরণ করিতেছে ইহা স্বতঃই প্রতীয়মান হইল। সকলেই নিশ্চল ও নির্ব্বাক্‌ভাবে বসিয়াছিল। কুড়ি মিনিট কিম্বা তাহার অধিককাল পরে তাঁহার বাহ্য দৃষ্টি ফিরিয়া আসিল এবং আমাদিগকে যথাবিধি অনুষ্ঠান চালাইতে ইঙ্গিত করিলেন।"

সেদিনকার উৎসবানুষ্ঠান-সমাপ্তি এবং প্রসাদাদি বিতরণের পর একে একে ভক্ত-দর্শকেরা চলিয়া যাইলে মহারাজ প্রসাদ ধারণ করিতে বসিলেন। দেবমাতা লিখিতেছেন, "As he was eating he remarked to me, 'I have been very much blessed in coming to your house today, sister.' I answered quickly, 'Swamiji, it is I who have been blessed in having you come.' 'You do not understand', he replied, 'I have had a great blessing here this afternoon. As you were reading the Bible, Christ suddenly

stood before the altar dressed in a long blue cloak. He talked to me for some time. It was a very blessed moment'." অর্থাৎ, তিনি আহার করিতে করিতে বলিলেন, 'সিষ্টার, তোমার গৃহে আসিয়া কৃতার্থ হইয়াছি।' আমি অমনি বলিয়া উঠিলাম, 'সে কি, স্বামীজি, আপনার আগমনে আমিই ধন্য বোধ করিতেছি।' উত্তরে তিনি বলিলেন, 'তুমি আমার কথা বুঝিলে না। যখন তুমি বাইবেল পাঠ করিতেছিলে, তখন সহসা নীলবর্ণের লম্বা আলখাল্লা পরিয়া যীশুখৃষ্ট বেদীর উপরে দণ্ডায়মান হইলেন। তিনি কিছুক্ষণ আমার সহিত কথাবার্ত্তা বলিলেন। সে মুহূর্ত্তগুলি অতি পবিত্র।'

মান্দ্রাজে কয়েকদিন অবস্থান করিয়া মহারাজ রামকৃষ্ণানন্দের সহিত সেতুবন্ধ রামেশ্বর যাত্রা করিলেন। কতিপয় সাধু-ব্রহ্মচারী ও ভক্ত তাঁহাদের সঙ্গে চলিলেন। রামনাদের রাজা সাহেবের বাংলায় তাঁহারা উঠিয়া প্রায় সপ্তাহকাল তথায় বাস করিলেন। রামকৃষ্ণানন্দ পূর্ব্ব হইতে ইহার বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন।

শ্রীশ্রীরামেশ্বর দর্শন করিয়া মহারাজ পরমানন্দে গভীর ভাবে মগ্ন হইলেন। বাবার বিরাট অর্চ্চনার জন্য রামকৃষ্ণানন্দ পূর্ব্বাহ্নেই সর্ব্বপ্রকার আয়োজন করিয়া রাখিয়াছিলেন। একশত আটটী করিয়া স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম্রনির্ম্মিত বিল্বপত্রে মহারাজ যথাবিধি অর্চ্চনা করেন, পূজান্তে মা পর্ব্বত-বর্দ্ধিনীকে ষোড়শোপচারে ভোগ দিয়াছিলেন এবং দ্বাদশটী ব্রাহ্মণকে পরিতোষসহকারে ভোজন করাইয়াছিলেন। বাবা রামেশ্বরের ভস্ম ও মা পর্ব্বত-

বন্ধিনীর কুঙ্কুম প্রসাদ রামকৃষ্ণানন্দ শ্রীশ্রীমার নিকট পাঠাইলেন। তিনি তৎসঙ্গে মহারাজের রামেশ্বর গমন ও তাঁহার অর্চ্চনার বিস্তৃত বিবরণ প্রেরণ করিলেন। এই সংবাদে শ্রীশ্রীমা যারপর-নাই আহ্লাদিত হইয়া রামকৃষ্ণানন্দকে লিখিলেন—"শ্রীমান রাখাল মহারাজ শ্রীশ্রীরামেশ্বরকে সোণার বিল্বপত্র, রূপার বিল্বপত্র এবং তামার বিল্বপত্র দিয়া বাবার আরাধনা করিয়াছেন—ইহা বড়ই সৌভাগ্যের দিন ছিল। সকলই তাঁর ইচ্ছায় হয়—তিনি ভিন্ন আর কিছু নাই।" শ্রীশ্রীমা তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ জানাইলেন। রামেশ্বর দর্শন করিয়া মহারাজ মাদুরায় গমন করিলেন।

মাদুরায় শ্রীশ্রীমীনাক্ষী দেবী ও বাবা সুন্দরেশ্বর মহাদেবের আকাশস্পর্শী বিরাটমন্দির। ইহার কারুকার্য্য ও বিশাল পরিকল্পনার রূপ দেখিয়া আজও জগতের লোক বিস্ময়বিস্ফারিত লোচনে মুগ্ধ-ভাবে চাহিয়া থাকে। মহারাজ মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া শ্রীশ্রীমীনাক্ষী দেবীকে দর্শন করিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইলেন। মার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তিনি সহসা এক অতীন্দ্রিয়ভাবে বিহ্বল হইয়া পড়িলেন। তাঁহার বাহ্য সংজ্ঞা হারাইয়া গেল। এই ভাব-সমাধি দেখিয়া রামকৃষ্ণানন্দ তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। তাঁহার আশঙ্কা হইল পাছে তিনি বিহ্বল হইয়া ভূমিতে পড়িয়া যান। প্রাতঃকালেই মহারাজ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "মনে কেমন একটা অপূর্ব্ব ভাব আসছে যেন কিছু একটা ঘটবে।" মীনাক্ষী দেবীর দর্শন সম্বন্ধে তিনি পরে সকলকে বলিয়াছিলেন, "যখন মন্দিরে বিগ্রহের সামনে দাঁড়ালাম তখন দেখলাম জগন্মাতার

বিগ্রহ যেন জীবন্ত হয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছেন—তাইতে সংজ্ঞাহারা হয়েছিলাম।" প্রায় একঘণ্টাকাল মহারাজ এই অপূর্ব্ব ভাবাবস্থায় ছিলেন এবং এই সময়ে মন্দিরের অন্যান্য সেবাদি বন্ধ ছিল। উপস্থিত সাধু-ব্রহ্মচারী, ভক্তমণ্ডলী এবং দেবীর দর্শনার্থী অনেক লোক তাঁহার এই দিব্য অতীন্দ্রিয় ভাবসমাধি দেখিয়া অনিমেষ লোচনে তাঁহাকে দর্শন করিতে লাগিলেন এবং কেহ কেহ দূর হইতে ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। সমাধিভঙ্গের পর তিনি রামনাদের রাজার বাংলায় ফিরিয়া আসিলেন। পরে যথাসময়ে ট্রেনে মাদুরা হইতে মহারাজ রামকৃষ্ণানন্দ ও সাধু-ব্রহ্মচারীদের সমভিব্যাহারে মান্দ্রাজে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

একদিন কোন মান্দ্রাজী ভক্ত মহারাজের নিকট ফুল পাঠাইয়াছিল। নূতন সেবক উক্ত ফুলগুলি মহারাজের ঘরে সাজাইয়া দিতেছিল। মহারাজ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিছু ফুল ঠাকুরকে দিয়েছিস ত?" উত্তরে সেবক বলিল, "না"। মহারাজ অমনি তাহাকে বলিলেন, "যা, এখনিই অর্দ্ধেক ফুল ঠাকুরকে দিয়ে আয়।" সেবকটী ইতস্ততঃ করিতেছিল, তাহার মনের ভাব এই যে এখানে প্রত্যক্ষ ভগবান বিদ্যমান, ওখানে মাত্র ছবি। তৎক্ষণাৎ মহারাজ তাহার অন্তরের ভাব বুঝিতে পারিয়া বলিয়া উঠিলেন, "তুই কি মনে করেছিস ঠাকুর কেবল ছবি? জানিস, ঐখানে ঠাকুর প্রত্যক্ষ রয়েছেন।" পরে মহারাজ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই কি কখন বাহ্যিক পূজা করেছিস্?" সেবক বলিল, "না, ওতে আমার তেমন

বিশ্বাস নেই।” মহারাজ গম্ভীরভাবে তাহাকে বলিলেন, “আমি বলছি ঠাকুর ঐ ছবিতে প্রত্যক্ষ রয়েছেন, কেমন—পূজো করবি?” সেবক তদুত্তরে বলিল, “আপনি যখন বলছেন, করব।” অনন্তর কিছুদিন অতীত হইলে উক্ত আদেশ পালনের ফলে সেবকের হৃদয়ে তাঁহার কথা সত্য বলিয়া উপলব্ধি হইল। ঠাকুরের ছবি সম্বন্ধে একদিন তিনি কোন ভক্তকে বলিয়াছিলেন, “মনকে একাগ্র কর্ত্তে হলে এমন মূর্ত্তি আর কোথায় পাবে?”

মান্দ্রাজের বিশিষ্ট ভক্তদের মধ্যে অনেকেই ব্রাহ্মণ, কয়েকজন মাত্র শূদ্রজাতীয় ছিলেন। মান্দ্রাজী ব্রাহ্মণেরা সদাচারের বিশেষ পক্ষপাতী এবং শূদ্রদের সহিত সামাজিক আচার-ব্যবহারে তাহারা বিশেষ কোন সম্পর্ক রাখিত না। শূদ্রজাতির প্রতি তাহারা বিদ্বেষভাবই সচরাচর পোষণ করিয়া থাকে। একদিন একজন বিশিষ্ট শূদ্রজাতীয় ভক্ত মহারাজ ও মঠের সাধু-ব্রহ্মচারীদিগকে তাহার গৃহে ভিক্ষা লইবার জন্য আমন্ত্রণ করে। ইতিপূর্ব্বে রামকৃষ্ণানন্দও কোন শূদ্রগৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করেন নাই। মহারাজ কোন প্রকার দ্বিধা না করিয়া তাহার আমন্ত্রণ স্বীকার করিলেন। মহারাজ দেখিলেন, ভক্তটী স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গ ও আশীর্ব্বাদলাভ অবধি ঠাকুরের প্রতি যথার্থ ভক্তিমান। সুতরাং সে যে জাতি বা যে শ্রেণীর হউক তাহা বিচার করিবার আবশ্যক নাই। ভক্তটীর ঐকান্তিক প্রেম ও আগ্রহ দেখিয়াই মহারাজ তাহার গৃহে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঠাকুর বলিতেন, “ভক্তের জাত নাই”। মহারাজ ছিলেন আত্মারাম, সামাজিক রীতিনীতি আচার-অনাচারের

বহু ঊর্দ্ধে অবস্থান করিতেন—তাঁহার নিকট জাতি, বর্ণ, হিন্দু, মুসলমান বা খৃষ্টান এই সব ভেদদৃষ্টি আদৌ ছিল না। সমস্ত জীবজগৎকে তিনি এক অখণ্ড ব্রহ্মস্বরূপ দেখিতেন। মহারাজের সম্মতি থাকায় রামকৃষ্ণানন্দেরও কোন আপত্তি থাকিল না।

ভক্তটী একজন সম্পন্ন গৃহস্থ। মহারাজ ও মঠের সাধু-ব্রহ্মচারীরা তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাদের যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিলেন। এই উপলক্ষে তিনি মান্দ্রাজ সহরের অনেক বিশিষ্ট ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাঁহার নিমন্ত্রিত ব্যক্তিদের মধ্যে কেহ ব্রাহ্মসমাজভুক্ত, আবার কেহ কেহ খৃষ্টান সম্প্রদায়ের অন্তর্গত ছিল। তাঁহারা সকলেই এক পংক্তিতে আহার করিতে বসিলেন এবং ভক্তটীর কন্যা ও অন্যান্য মহিলারাও পরিবেশন করিতে লাগিলেন। আহার শেষ হইলে মহারাজ যেমনি আসন ত্যাগ করিলেন অমনি রামকৃষ্ণানন্দ তাঁহার পরিত্যক্ত পাত্র হইতে কিঞ্চিৎ অন্নপ্রসাদ গ্রহণ করিয়া মস্তক ও হৃদয়ে স্পর্শপূর্ব্বক জিহ্বাগ্রে দিলেন। সাধু-ব্রহ্মচারীরাও তাঁহার অনুসরণ করিলেন। সকলের সঙ্গে প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার করিয়া ভক্তগৃহ হইতে মহারাজ মঠে প্রত্যাগত হইলেন। জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে ভক্তদের লইয়া কিরূপ উদার দৃষ্টিতে আচার-ব্যবহারের প্রয়োজন এবং বাস্তবক্ষেত্রে কেমন ভাবে তাহাদিগকে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ করিতে হয় ইহারও উজ্জ্বল আদর্শ মহারাজ সকলের নয়নসমক্ষে উপস্থিত করিলেন।

এদিকে ১৯০৯ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে বাঙ্গালোরে নূতন জমিতে

আশ্রম নির্ম্মাণকার্য্য শেষ হইল। উক্ত আশ্রম প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য মহারাজ বাঙ্গালোরে যাত্রা করিলেন। তথায় রেলষ্টেশনে তাঁহার সাদরসম্বর্দ্ধনা হইয়াছিল। ২০শে জানুয়ারী আশ্রম-প্রতিষ্ঠার দিনে মহারাজের সভাপতিত্বে একটী বৃহতী সভার অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় মহীশূর মহারাজার দেওয়ান বাহাদুর এবং স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ বক্তৃতা করিলে পর তিনি ইংরাজীতে দুই চারিটী সময়োপযোগী সারগর্ভ কথা বলিয়া আশ্রমের দ্বার উদ্ঘাটন করিলেন। বাঙ্গালোরে তাঁহাকে দর্শন করিয়া সকলে মুগ্ধ হইল এবং তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়া ও উপদেশ শুনিয়া কৃতার্থ বোধ করিল।

বাঙ্গালোরে রামনাম-সঙ্কীর্ত্তন শুনিয়া মহারাজ মুগ্ধ হন। বাংলাদেশেও যাহাতে ইহা প্রবর্ত্তিত হয় তদ্বিষয়ে তিনি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। এক সময়ে স্বামিজী বাংলার ঘরে ঘরে ত্যাগ ভক্তি ও জ্ঞানের আদর্শমূর্ত্তি শ্রীমহাবীরের পূজা প্রচলন করিতে চাহিয়াছিলেন। এই সূত্রে রামনাম-সঙ্কীর্ত্তনের সহিত মহাবীরের পূজা প্রচলন করিবার ইচ্ছা মহারাজের মনে উদিত হইল। তিনি উহা সংগ্রহ করিয়া অম্বিকানন্দকে সুরসংযোগ করিতে বলিলেন। পরে আরও কয়েকদিন তথায় অতিবাহিত করিয়া মহারাজ মান্দ্রাজ মঠে প্রত্যাগমন করিলেন।

মহারাজ মান্দ্রাজ মঠে পরমানন্দে রহিয়াছেন শুনিয়া শ্রীশ্রীমা আহ্লাদ সহকারে রামকৃষ্ণানন্দকে ২৭শে ফেব্রুয়ারী তারিখের পত্রে লিখিয়াছিলেন, "রাখাল ঐখানে আছেন আমি শুনিয়া বড়ই খুসী হইলাম। রাখালকে লইয়া তোমরা আনন্দ কর,

রাখাল আমার দীর্ঘজীবী হইয়া থাকুক এবং তোমরাও দীর্ঘজীবী হইয়া থাক, তাহা হইলেই আমার আনন্দ। আমার আশীর্ব্বাদ তোমরা সকলে গ্রহণ করিবে।”

১৯০৯ খৃঃ মে মাসের প্রারম্ভে মহারাজ মাদ্রাজ হইতে পুরীধামে ফিরিয়া আসিয়া শশী নিকেতনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। তাঁহার ত্যাগী গুরুভ্রাতা এবং অন্যান্য পুরাতন ভক্তদের সম্মুখে তিনি রামকৃষ্ণানন্দের বহু প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন, “শশীর কাছে ছিলাম, কি সুখেই দিন কেটেছে। শশীর মতন ঠাকুরের ভাব এমন কোরে কেউ নিতে পারেনি। দক্ষিণে বেড়াতে সে আমার জন্য এক হাজার টাকা খরচ করলে। প্রথম শ্রেণীর কামরায় বেড়ানর ব্যবস্থা করেছিল। শশী টাকাকে টাকা বলে জ্ঞান করত না। সাধুর তো এই চাই। দেখে, মনে মনে খুসী হলুম।

১৯০৯ অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে রামকৃষ্ণানন্দ পুরীধামে কয়েকদিন অবস্থান করিয়া বেলুড় মঠে চলিয়া গেলেন। মহারাজ তৎকালে তাঁহাকে লিখিয়াছিলেন, “শরীর এখানে তত ভাল লাগছে না, নোনাতে জারক লেবুর মতন না হয় এই ভয়।”

নানা কারণে মাদ্রাজ মঠের বাড়ীটি কয়েক বৎসরেই জীর্ণ ও নষ্ট হইয়া ক্রমে বাসের অযোগ্য হইয়া পড়িল। সুতরাং একটী ভাড়াটীয়া বাড়ীতে মঠ উঠিয়া গেল। পুনরায় নিজস্ব স্থায়ী মঠগৃহ নির্ম্মাণের জন্য একখণ্ড নূতন জমি নির্ব্বাচন করিয়া ক্রয় করা হইল। তৎকালে স্বামী নির্ম্মলানন্দ বেলুড় মঠে আসিয়া বাঙ্গালোরে মহারাজকে লইয়া যাইবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ ও অনুরোধ

করিতে লাগিলেন। অতঃপর ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ২১শে জুলাই নির্ম্মলানন্দ ও কয়েকজন সাধু ব্রহ্মচারী সহ মহারাজ মান্দ্রাজ অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

যথাসময়ে গাড়ী মান্দ্রাজে পৌঁছিল। ষ্টেসনে শর্ব্বানন্দ কয়েক জন সাধু, ব্রহ্মচারী এবং ভক্তসহ মহারাজের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহাকে দর্শন ও পুষ্পমাল্যে ভূষিত করিয়া হর্ষোৎফুল্ল হৃদয়ে শ্রদ্ধাভরে সকলে প্রণত হইলেন। মহারাজ সদলবলে মঠে গমন করিলেন। পূর্ব্ব হইতে তথায় সকলের সুখস্বাচ্ছন্দ্যের জন্য সর্ব্বপ্রকার সুবন্দোবস্ত ছিল। মহারাজের সেবার কোনরূপ ত্রুটী না হয় সেদিকে তাঁহাদের বিশেষ যত্ন ও দৃষ্টি থাকিত।

মান্দ্রাজে আসিয়া রামকৃষ্ণানন্দের স্মৃতি মহারাজের মনে উদয় হইল। তাঁহার মনে পড়িল, ১৯১১ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন ৺পুরীধামে অবস্থান করিতেছিলেন তখন রামকৃষ্ণানন্দের নিদারুণ পীড়ার সংবাদ শুনিতে পান। ক্রমাগত কঠোর পরিশ্রমে তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। সংবাদ পাইবামাত্র মহারাজ তাঁহাকে অবিলম্বে চিকিৎসার জন্য কলিকাতায় আসিতে লিখিলেন। রামকৃষ্ণানন্দ তাঁহার উপদেশানুসারে কলিকাতা অভিমুখে রওনা হইলেন এবং তার করিয়া তাঁহাকে জানাইলেন। তার পাইয়া মহারাজ পুরী হইতে খুরদা ষ্টেসনে আসিয়া তাঁহার সাক্ষাতের জন্য প্রতীক্ষা করিলেন। প্রায় মধ্যরাত্রিতে মান্দ্রাজ মেলগাড়ী আসিয়া পৌঁছিল। মহারাজ কামরায় উঠিলে রামকৃষ্ণানন্দ ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া

মহারাজ বলিলেন, "শশী, এসব কি? অসুখ বিসুখ সব ঝেড়ে ফেলে দাও।" রামকৃষ্ণানন্দ বলিলেন, "রাজা, তুমি আশীর্ব্বাদ করলেই হবে।" মহারাজ পুনরায় বলিলেন, "সব ঝেড়ে ফেলে দাও"। তিনি আবার একইরূপ উত্তর করিলেন। যথাবিধি চিকিৎসার উপদেশ দিয়া গাড়ী ছাড়িবার সময় প্লাটফর্ম্মে নামিয়া আসিবার কালে রামকৃষ্ণানন্দ পুনরায় ভূমিষ্ঠভাবে প্রণত হইলেন। এই উভয়ের শেষ সাক্ষাৎ।

পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৯১১ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে কলিকাতা উদ্বোধন কার্য্যালয়ে যখন রামকৃষ্ণানন্দ মহাসমাধি লাভ করিলেন তখন মহারাজ পুরীধামে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার মহাসমাধির সংবাদে তিনি বিষাদগম্ভীর স্বরে বলিয়াছিলেন, "একটি দিকপাল চলে গেল। দক্ষিণ দিকটা যেন অন্ধকার হয়ে গেল।" মান্দ্রাজ মঠে মহারাজ তাঁহার প্রসঙ্গে বলিতেন, "শশী মহারাজের প্রভাব দিগ্বিজয়ী শঙ্করের মত এদেশে জ্বলজ্বল করছে। তার হাতের তৈয়ারী রামু আর রামানুজ। ঠাকুরের উপর তাদের কি গভীর ভক্তি! এই মঠ আর Students' Homeএর জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম ও চেষ্টা তারা করেছে। আমাদের উপর তাদের কত গভীর ভক্তি আর শ্রদ্ধা, মঠের প্রতি তাদের কত যত্ন আর প্রীতি"।

মঠের সম্মুখে অদূরে উচ্চ গোপুরম্-সমন্বিত কপালেশ্বর মহাদেবের মন্দির। মহারাজ তথায় মাঝে মাঝে যাইতেন। ত্রিপ্লিকেন পল্লীস্থিত শ্রীপার্থসারথির মন্দির দর্শন করিতে গিয়া তন্মধ্যে সুবৃহৎ বিগ্রহমূর্ত্তির সম্মুখে একদিন তিনি ভাবাবিষ্ট হইয়াছিলেন।

নূতন মঠগৃহের নক্সা ইতিপূর্ব্বে প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছিল। মহারাজ উহা দেখিয়া তথাকার অভিজ্ঞ ও সুদক্ষ ইঞ্জিনিয়ারের সাহায্যে মঠনির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। শুভদিনে শুভতিথিতে ৪ঠা আগষ্ট তারিখে উক্ত জমিতে যথাবিধি পূজার্চ্চনা করাইয়া তিনি মঠগৃহের ভিত্তিস্থাপন করিলেন। ইহার প্রায় এক সপ্তাহ পরে তিনি বাঙ্গালোর রওনা হইলেন।

ষ্টেসনে গাড়ী থামিলে বাঙ্গালোরের বহু সম্ভ্রান্ত ভদ্র ব্যক্তি ও ভক্ত মহারাজকে পুষ্পমাল্যে সজ্জিত করিয়া সমাদরে অভ্যর্থনা করিয়াছিলেন। সুপ্রশস্ত ও সুবৃহৎ জমির উপর বাঙ্গালোর মঠ দেখিয়া তিনি আনন্দ প্রকাশ করিলেন। তথায় অবস্থানকালে মহারাজ সাধুভক্তদিগকে নানা উপদেশ প্রদানপূর্ব্বক আধ্যাত্মিক সাধনায় সহায়তা করিতেন। কখন কখন মধ্যরাত্রে বা শেষরাত্রে উঠিয়া লণ্ঠন হস্তে সেবকের সঙ্গে সাধু ভক্তদের শয়নকক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিতেন কে কি করিতেছে। যাহাদিগকে নিদ্রিত দেখিতেন পরদিন প্রাতে তাহারা যখন তাঁহাকে প্রণাম করিতে যাইতেন তখন তিনি বলিতেন, "রাত্রিকাল সাধনের প্রশস্ত সময় আর তোরা ঘুমিয়ে তা কাটিয়ে দিচ্ছিস। এই জোয়ান বয়সে তোদের এত ঘুম? এখন যদি ভগবান লাভ করবার জন্য না খাটবি, তবে কবে আর তোদের সময় হবে? দিনের বেলা ত কাজ-কর্ম্মে গল্প-সল্পে সময় কেটে যায়। তাঁকে ডাকবি কখন?" মহারাজের ঈদৃশ কথাগুলি তাহাদের মর্ম্মস্থল স্পর্শ করিত এবং অনেকে রাত্রিকালে সাধনভজনে নিরত হইতেন। এইভাবে

মহারাজ তাহাদের মনে সাধনার আকাঙ্ক্ষা উদ্রেক করিয়া দিতেন।

বাঙ্গালোরে মুচিসম্প্রদায় ও অন্যান্য অস্পৃশ্য জাতির কতিপয় ভক্ত প্রতি রবিবার মঠে আসিয়া বড় হলঘরে সমবেতভাবে প্রার্থনা ও উপাসনা করিত এবং পরে শ্রীশ্রীঠাকুরের সম্মুখে রামনামসঙ্কীর্ত্তন করিয়া মহারাজের পাদবন্দনা করিত। মহারাজ তাহাদিগকে দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইতেন। তাহাদের প্রতি তাঁহার উদার এবং সস্নেহ ব্যবহার দেখিয়া অনেক ব্রাহ্মণ ভক্তের অন্তর হইতে সংস্কারগত হেয়জ্ঞান, অবজ্ঞা ও বিদ্বেষ দূর হইয়াছিল। তাহারাও অস্পৃশ্যজাতিকে উদার দৃষ্টিতে দেখিতে শিখিল। ইহার ফলে পরস্পরের মধ্যে স্পৃশ্যাস্পৃশ্যের ভেদভাব অনেকটা চলিয়া গিয়াছিল। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারী তারিখে বাঙ্গালোর আশ্রমে স্বামিজীর জন্মতিথি উপলক্ষে সাধারণ উৎসব দিবসে বিভিন্ন কীর্ত্তনমণ্ডলীর মধ্যে মহারাজ দেখিলেন, উক্ত মুচিসম্প্রদায় পত্রপুষ্পে সুসজ্জিত ঠাকুর ও স্বামিজীর প্রতিকৃতি বহন করিয়া কীর্ত্তন করিতে করিতে আশ্রমপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করিতেছে। ইহা দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন। ঠাকুরের প্রতি উহাদের সরল ভক্তি-নিষ্ঠা দেখিয়া একদিন মহারাজ স্বয়ং তাহাদের পল্লীস্থ প্রতিষ্ঠিত ঠাকুরঘরে অকস্মাৎ গিয়া প্রবেশ করিলেন। তাহাদের অনুরাগের সঙ্গে ঠাকুরসেবা দেখিয়া তিনি তাহাদিগকে সাধনভজনে উৎসাহ দিলেন ও প্রাণ খুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিতে লাগিলেন। "মুচি হয়ে শুচি হয় যদি কৃষ্ণ ভজে"—এই বাক্যটী সেদিন প্রত্যক্ষীভূত হইল।

নভেম্বর মাসের প্রারম্ভে মহারাজ শ্রীরামানুজ-প্রবর্ত্তিত শ্রীসম্প্রদায়ের প্রধান তীর্থ দর্শন করিতে মেলকোটে গমন করিয়াছিলেন। পরে শিবসমুদ্র নামক স্থানে কাবেরী নদীর জলপ্রপাতের সুন্দর দৃশ্য দেখিয়া তথায় তিন দিন অবস্থিতি করেন। এইখানে মহীশূর রাজ্যের প্রসিদ্ধ বিদ্যুতের কারখানা। একদিন ইহার সন্নিকটে রামানুজ সম্প্রদায়ের একটী বিষ্ণুমন্দির তিনি দর্শন করিতে যান। উক্ত মন্দিরে একটী প্রাচীন সাধু বাস করিতেন। তিনি কখনও কাহাকে দেখিয়া তাঁহার আসন ত্যাগ করিয়া উঠিতেন না। মহারাজকে দেখিয়াই সাধুটী আসন ছাড়িয়া তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিলে দর্শকেরা ইহাতে বিস্মিত হইলেন। পরে ১১ই নভেম্বর মহীশূরে শ্রীচামুণ্ডাদেবী দর্শন করিয়া মহারাজ পুনরায় বাঙ্গালোর মঠে ফিরিয়া আসেন।

২৬শে নভেম্বর বাঙ্গালোর হইতে কন্যাকুমারী দর্শনে মহারাজ সদলবলে যাত্রা করিলেন। পরদিন ২৭শে নভেম্বর বেলা ২টার সময় তাঁহারা আলওয়াই নামক স্থানে পৌছিলেন। তথায় দুই দিন অবস্থান করিয়া ২৯শে তারিখ বেলা ১টার সময় এরণাকুলমে আসিলেন। পরে তথা হইতে ৩০শে তারিখে মোটর বোট যোগে বেলা ১১টার সময়ে কোটায়াম নামক স্থানে উপনীত হন। এখান হইতে তাহারা ২রা ডিসেম্বর হরিপাদ আশ্রমে পৌছিলেন। হরিপাদ আশ্রমে তিনদিন থাকিয়া কুইলানে আসিলেন। তথায় ডাক্তার তাম্পী প্রমুখ ঠাকুরের ভক্তমণ্ডলী মহারাজের অবস্থানের জন্য একটী দ্বিতল গৃহ ভাড়া লইয়াছিলেন। মহারাজের উক্ত গৃহে অবস্থান কালে চতুর্দ্দিক হইতে দলে দলে লোক তাঁহাকে দর্শন

করিতে আসিত। তথা হইতে তিনি ত্রিবান্দ্রামে গিয়া কয়েকদিন অবস্থান করেন। সেখানে বহু ভক্ত তাঁহার উপদেশ ও কৃপালাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। ত্রিবান্দ্রামে অনন্তশয়ন শ্রীপদ্মনাভ-বিগ্রহ দর্শন করিয়া তিনি আনন্দে পূর্ণ হইলেন। এই স্থান হইতে ছয় মাইল দূরে একটী পাহাড়ের উপর জমি সংগ্রহ করিয়া একটী আশ্রম প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা হইয়াছিল। ৯ই ডিসেম্বর শুভদিনে মহারাজ ইহার ভিত্তি স্থাপন করিলেন। স্থানটী বড়ই মনোরম ও চিত্তমুগ্ধকর। পর্ব্বতশীর্ষ হইতে নীলাম্বুরাশির শোভা অনির্ব্বচনীয়। ১০ই ডিসেম্বর ত্রিবান্দ্রাম হইতে মটরযোগে মহারাজ কন্যাকুমারী অভিমুখে রওনা হইলেন এবং সন্ধ্যার কিছু পূর্ব্বে তিনি তথায় পৌঁছিলেন।

মালাবার ভ্রমণকালে তিনি বহুসংখ্যক খৃষ্টান অধিবাসীকে দেখিয়া বলেন, "এরা উচ্চবর্ণের নির্য্যাতনে ও পেটের দায়ে ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেছে। আমার ইচ্ছে হয়, এদের গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়ে ও জগন্নাথের মহাপ্রসাদ খাইয়ে হিন্দুধর্ম্মে তুলে নি।" এইরূপ সহজভাবে তিনি দক্ষিণদেশে অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের এবং ধর্ম্মান্তর-গ্রহণকারীদিগকে স্বধর্ম্মে ফিরাইয়া আনিবার ইঙ্গিত মঠের সাধু-ব্রহ্মচারীদিগকে করিয়াছিলেন। নির্য্যাতিত পতিত জাতিদের দুঃখ তিনি প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেন এবং তাহাদিগের কল্যাণের জন্য কার্য্য করিতে সকলকে উৎসাহ দিতেন।

ত্রিবাঙ্কুরে আয়েঙ্গার নামে জনৈক রেলকর্ম্মচারী মহারাজের নিকট দীক্ষাপ্রার্থী হন। মহারাজ দুই তিন দিন নিরুত্তর থাকিয়া একদিন তাঁহাকে বলিয়াছিলেন, "তোমার ইষ্ট এবং মন্ত্রের সন্ধান

এখনও আমি পাই নাই। অপেক্ষা কর।” কন্যাকুমারীতে গিয়া উক্ত দীক্ষার্থীর অভীষ্ট ইষ্ট ও মন্ত্র দর্শন পাইয়া পরে তিনি তাঁহাকে দীক্ষা দেন।

কন্যাকুমারী যাত্রাকালে বাঙ্গালোর হইতে আরম্ভ করিয়া পথে প্রায় প্রত্যেক স্থান হইতেই মহারাজের সঙ্গে দুই চারিজন করিয়া স্থানীয় ভক্ত অনুগমন করিতে লাগিলেন; ইহাতে তাহাদের সংখ্যা হইল বত্রিশজন। ত্রিবাঙ্কুরের রাজকর্ম্মচারীরা একটী দ্বিতল গৃহ মহারাজের জন্য ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলেন। একটী ধনী ব্যবসায়ী (চেটী) যাত্রীদের থাকিবার জন্য উক্ত গৃহ নির্ম্মাণ করেন।

প্রতিদিন বিশেষ বিশেষ সময়ে কন্যাকুমারীর মন্দিরে গিয়া মহারাজ বিগ্রহ দর্শন করিতেন। তৎকালে তাঁহার সমগ্র বদন-মণ্ডল অপূর্ব্ব আনন্দে উদ্ভাসিত হইত। সন্ধ্যার পর চন্দন-চর্চ্চিত অঙ্গরাগে দেবীর অনুপম রূপমাধুরী তিনি স্থাণুবৎ স্থিরভাবে ভাবাবিষ্ট হইয়া দর্শন করিতেছেন; কখন কখন আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া মহারাজ বালকের মত দেবীর সহিত কথাবার্ত্তা বলিতেছেন! এই সময়ে তাঁহার বাহ্যজ্ঞান বড় থাকিত না। সর্ব্বদাই এক অপূর্ব্ব দিব্যভাবে আবিষ্ট থাকিতেন। কন্যাকুমারীতে আরও কিছুদিন থাকিবার তাঁহার ইচ্ছা ছিল কিন্তু দক্ষিণদেশের বিভিন্ন কেন্দ্র হইতে কর্ম্মীরা অনেকে তাঁহার সঙ্গে চলিয়া আসায় কাযকর্ম্মের ক্ষতি হইতেছে ভাবিয়া মহারাজ অবশেষে ফিরিয়া আসিলেন।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে ১৭ই ডিসেম্বর কন্যাকুমারী হইতে যাত্রা করিয়া পথে সুচীন্দ্রমের মন্দিরে শিবতাণ্ডব নৃত্য দেখিয়া বড়

আনন্দিত হইয়াছিলেন। ৩০শে ডিসেম্বর প্রাতে তিনি বাঙ্গালোর আশ্রমে পৌছিয়া তথায় প্রায় মাসাবধি অবস্থান করিলেন এবং ২৮শে জানুয়ারী মান্দ্রাজ মঠে ফিরিয়া আসিলেন।

মান্দ্রাজে কয়েকদিন অবস্থান করিয়া ৬ই ফেব্রুয়ারী মহারাজ শ্রীরামানুজ স্বামীর জন্মস্থান শ্রীপেরেম্বুদুর দর্শন করিতে যান। পরে তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া ১৫ই ফেব্রুয়ারী তিনি শ্রীরঙ্গম্ তীর্থে গমন করিলেন। মন্দিররক্ষক বাল সুব্রহ্মণ্য শ্রীরঙ্গনাথজীর মন্দিরদ্বারে দাঁড়াইয়া মহারাজের আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তিনি মহারাজকে সমুচিত অভ্যর্থনা করিয়া মন্দিরাভ্যন্তরে লইয়া গেলেন। দর্শনাদি শেষ হইলে তিনি দেববিগ্রহের নানাবিধ হীরক-প্রবাল-মণিমাণিক্য-খচিত রত্নালঙ্কার তাঁহাকে দেখাইয়াছিলেন। সেইদিন তিনি ভক্তি-বিহ্বল-চিত্তে শ্রীরামানুজের সাধনার স্থান দর্শন করিলেন।

ইহার পর মহারাজ ত্রিচনপল্লীতে কয়েকদিন অবস্থান করিয়া পর্ব্বতশীর্ষে শিবপার্ব্বতী, গণেশ ও সুব্রহ্মণ্যের মন্দিরাদি দর্শন করিলেন। তিনি তথা হইতে দুইটী সুবৃহৎ শিবমন্দির দর্শন করিতে যান—একটী শ্রীজম্বুকেশ্বর, অপরটী শ্রীআচণ্ডালেশ্বর। পরে তিনি ২০শে ফেব্রুয়ারী পুনরায় মান্দ্রাজ মঠে ফিরিয়া আসিলেন। ২৩শে ফেব্রুয়ারী ঠাকুরের জন্মতিথি উপলক্ষে তিনি কয়েক জনকে তথায় ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাস দান করিলেন। ২৫শে ফেব্রুয়ারী রবিবার সর্ব্বসাধারণের জন্য ঠাকুরের জন্ম-মহোৎসব মান্দ্রাজ মঠে অনুষ্ঠিত হয়। তদুপলক্ষে শ্রীযুত ভি, পি, মাধোরাওয়ের সভাপতিত্বে এক জনসভা হয়, তাহাতে

শ্রীযুত সি, পি, রামস্বামী প্রভৃতি ইংরাজী ও তামিলভাষায় বক্তৃতা করেন। পূজার্চ্চনা, দলে দলে ভজনমণ্ডলীর ভজন গান ও সহস্র সহস্র দরিদ্র নারায়ণের সেবায় স্থানটী প্রকৃতই আনন্দধামে পরিণত হইয়াছিল। মহোৎসবে মহারাজ আনন্দ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে দর্শন করিয়া সকলেই ভক্তি-শ্রদ্ধায় অবনতমস্তক হইল। ৮ই মার্চ্চ দোল পূর্ণিমার দিন মঠে ঠাকুরের বিশেষ ভোগরাগ দেওয়া হইল এবং মহারাজ Students' Home এর ছাত্রগণকে সেদিন আমন্ত্রণপূর্ব্বক পরিতোষ সহকারে ভোজন করাইয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন।

মান্দ্রাজ হইতে ৯ই মার্চ্চ মহারাজ কাঞ্চী তীর্থে গমন করিলেন। তথায় পৌঁছিয়া অপরাহ্নে বিষ্ণুকাঞ্চীতে শ্রীবরদরাজবিগ্রহ ও মন্দিরাদি দর্শন এবং পরদিন শিব-কাঞ্চীতে শ্রীমহাদেব ও ৺কামাখ্যাদেবী দর্শন করেন। তিনি বরদরাজের শ্রীমূর্ত্তি দেখিয়া তন্ময় হইয়া পড়িয়াছিলেন। ১২ই মার্চ্চ মহারাজ মান্দ্রাজ মঠে ফিরিয়া আসিলেন। তিনি কাহাকে কাহাকেও বলিয়াছিলেন, "বরদরাজের মূর্ত্তিটী বড় সুন্দর।"

মান্দ্রাজ মঠ হইতে ২৪শে মার্চ্চ মহারাজ শ্রীবালাজী তিরুপতি দর্শনে যাত্রা করিলেন। রামানুজ শ্রীসম্প্রদায়ের তত্ত্বাবধানে শ্রীবালাজী বিষ্ণুবিগ্রহরূপে অর্চ্চিত হইয়া থাকেন। মহারাজ দিব্যভাবে বিগ্রহকে দেবী মূর্ত্তিরূপে দর্শন করিলেন। ইহাই কি বিগ্রহের যথার্থ রূপ—কে বলিবে?

৩১শে মার্চ্চ তথা হইতে মহারাজ মান্দ্রাজ মঠে ফিরিয়া

মান্দ্রাজে গৃহীত ফটো
১৯২১
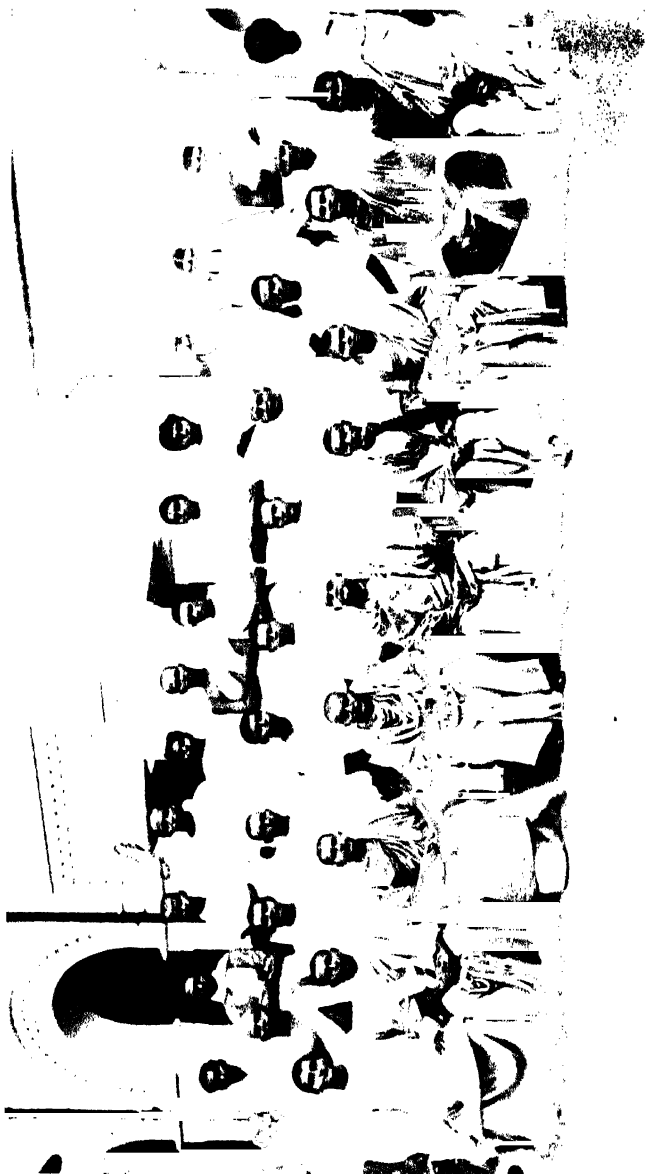
আসিলেন। মান্দ্রাজের নূতন মঠের গৃহ-নির্ম্মাণকার্য্য কতকাংশ শেষ হইলে ২৪শে এপ্রেল অক্ষয়তৃতীয়া তিথিতে সাধু ও ব্রহ্মচারিগণ শ্রীশ্রীঠাকুরকে নূতন মঠে লইয়া আসিলেন। ৩০শে এপ্রেল হইতে মহারাজ নূতন মঠে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৬ই মে Students' Homeএর গৃহনির্ম্মাণের ভিত্তি স্থাপন করিয়া ৯ই মে মান্দ্রাজ হইতে তিনি পুরী অভিমুখে রওনা হইলেন।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে তিনি Students' Homeএর দ্বারোদ্ঘাটন করিতে তৃতীয় বার মান্দ্রাজে আসিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গে ছিলেন শিবানন্দ স্বামী। পথে বিশ্রামের জন্য তাঁহারা ওয়াল্টেয়ারে অবতরণ করিয়াছিলেন। সমুদ্রতীরে ভিজিয়ানা-গ্রামের প্রাসাদে তাঁহাদের কয়েক দিন বিশ্রাম করিবার বন্দোবস্ত করা হইয়াছিল। মহারাজ বারান্দায় বসিয়া সমুদ্র দেখিতে দেখিতে একেবারে নিস্পন্দ স্থির হইয়া যান। তিনি পরে বলিলেন, "এখানেও আধ্যাত্মিক ভাবের আবহাওয়া বেশ আছে। সাধনভজনের জন্য এ স্থানও অনুকূল।"

মান্দ্রাজে অবস্থানকালে তিনি মঠের সাধু-ব্রহ্মচারীদিগকে উপদেশ দিতেন। মান্দ্রাজ মঠ ও তাহার অন্তর্গত কর্ম্মকেন্দ্র প্রভৃতির তিনি আনুপূর্ব্বিক সংবাদ লইতেন। মহারাজকে দর্শন করিলে লোকে স্বতঃই আকৃষ্ট হইত। তিনি অধিকাংশ সময়ে বসিয়া থাকিতেন একটী চেয়ার বা ইজিচেয়ারে; তথায় দলে দলে ধর্ম্মপিপাসু বা জিজ্ঞাসু নরনারী তাঁহার পদতলে বসিয়া তাঁহার উপদেশ শ্রবণে ও সপ্রেম ব্যবহারে পরিতৃপ্ত হইয়া যাইত।

মান্দ্রাজ পৌঁছিবার তিন সপ্তাহ পরে শুভদিনে শ্রীরামকৃষ্ণ

মিশনের নবনির্ম্মিত Students' Homeএর দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। সেদিন তিনি রামুকে প্রচুর আশীর্ব্বাদ করিলেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে ১৭ই ফেব্রুয়ারী শ্রীরামস্বামী (ইনি রামকৃষ্ণসঙ্ঘে রামু বলিয়া অভিহিত হন) রামকৃষ্ণানন্দের প্রেরণায় সাতটী ছাত্র লইয়া Students' Home প্রতিষ্ঠা করেন। রামকৃষ্ণানন্দ ইঁহার উদ্বোধন করেন। রামু ও রামানুজের উদ্যমে, কয়েকজন নিঃস্বার্থ কর্ম্মীর সহায়তায় এবং মান্দ্রাজ মঠের সহযোগিতায় ইহার দিন দিন উন্নতি হইতে লাগিল। ১৯১৭ খৃষ্টাব্দে কোন সদাশয় মহাত্মা ময়লাপুর সালিভান গার্ডেন রোডে Students' Homeএর স্থায়ী গৃহনির্ম্মাণের জন্য জমি দান করেন এবং মহারাজ তাহার ভিত্তিস্থাপন করিয়াছিলেন। গৃহনির্ম্মাণে সাহায্যের জন্য রামকৃষ্ণ মিশনের সভাপতিরূপে মহারাজের নামে আবেদনপত্র প্রকাশিত হয়। ইহাতে যথেষ্ট অর্থ সংগৃহীত হইল। ১৯২১ খৃষ্টাব্দে মে মাসে নবনির্ম্মিত ছাত্রাবাসের বিরাট অট্টালিকার দ্বার মহারাজ উন্মোচন করিলেন। কয়েক দিন পরে মান্দ্রাজ হইতে তিনি বাঙ্গালোর আশ্রমে গিয়া অবস্থান করেন। সেপ্টেম্বর মাসের শেষে তথা হইতে পুনরায় তিনি মান্দ্রাজে ফিরিয়া আসিলেন। তাঁহার অনেক দিন হইতে দাক্ষিণাত্যে দুর্গোৎসব করিবার ইচ্ছা ছিল। কলিকাতা হইতে প্রতিমা আনিয়া মান্দ্রাজ মঠে ষোড়শোপচারে যথারীতি তিন দিন ব্যাপী শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা ও সমারোহে উৎসব সম্পন্ন হইল। অতঃপর তথায় শ্রীশ্রীকালীপূজা অনুষ্ঠিত হইলে তিনি শিবানন্দের সঙ্গে ভুবনেশ্বরে প্রত্যাগমন করিলেন।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

পূর্ব্ববঙ্গে

পূর্ব্ববঙ্গের প্রধান সহর ঢাকাকে কেন্দ্র করিয়া মঠ ও মিশনের কার্য্য উক্ত অঞ্চলে বিস্তার লাভ করিতেছিল। ইতিপূর্ব্বে ঢাকায় স্বামিজীকে দর্শন ও তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া স্থানীয় অনেকে শ্রীরামকৃষ্ণের অপূর্ব্ব জীবন সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। স্বর্গীয় মোহিনীমোহন দাসের গৃহে একটী হলে এই সব ভক্তবৃন্দের সাপ্তাহিক অধিবেশন হইত। তখন হইতে ধীরে ধীরে তাঁহারা নানা জনহিতকর কার্য্য আরম্ভ করিলেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সন্ন্যাসীদের সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। প্রতিবর্ষে শ্রীরামকৃষ্ণের ও স্বামিজীর জন্মোৎসবের অনুষ্ঠান, লাঙ্গলবন্ধের যোগস্নানে সেবকদল-গঠন ও ঢাকা সেবাশ্রমের নানা সেবাকার্য্যদ্বারা ভক্তেরা সঙ্ঘের সহায়তায় মঠ ও মিশনের ভাব তথায় প্রচার করিতে লাগিলেন। এই সব কার্য্যের উদ্যোক্তারা অনেকেই বেলুড় মঠে আসিয়া মহারাজ ও তাঁহার গুরুভ্রাতৃগণকে দর্শন করিয়া আধ্যাত্মিকভাবে অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। ১৯১৪ খৃঃ মঠের সাধু-ব্রহ্মচারীরা ঢাকার কর্ম্ম-কেন্দ্রকে সম্পূর্ণভাবে নিজ হস্তে গ্রহণ করিলেন। ক্রমে ক্রমে তথায় মঠ ও মিশন স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার উদ্যোগ চলিতে লাগিল।

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ মিশনের গৃহনির্ম্মাণের ভিত্তি-সংস্থাপন

উপলক্ষে ঢাকার বীরেন্দ্র বসু প্রমুখ উদ্যোক্তারা মহারাজকে তথায় লইয়া যাইবার জন্য বেলুড় মঠে তাঁহার নিকট আসিলেন। তিনি তাঁহাদের প্রার্থনায় সম্মত হইলেন। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে তিনি ৺কামাখ্যাতীর্থে যাইবেন ইহাই স্থির হইল। শুভদিনে মহারাজ পূজ্যপাদ প্রেমানন্দ স্বামী ও মঠের কয়েকজন সাধু-ব্রহ্মচারী এবং ভক্তদের সমভিব্যাহারে ৺কামাখ্যা তীর্থাভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় মহারাজ প্রত্যহ মন্দিরে দেবীদর্শনে যাইতেন এবং দিব্যভাবে তন্ময় হইয়া থাকিতেন। সাধু-ব্রহ্মচারী ও ভক্তদিগের ভজনসঙ্গীত শুনিয়া তিনি অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিতেন। তিনি যথাবিহিত শ্রীশ্রীকামাখ্যা মায়ের পূজার্চ্চনা ও কুমারীপূজা করাইয়াছিলেন। তিন দিবস তথায় থাকিয়া ভক্তদের অনুরোধে তিনি ময়মনসিংহে আগমন করিলেন।

ময়মনসিংহে স্থানীয় ভক্তগণ মহারাজকে দর্শন করিয়া পরম আনন্দিত হইল। সহরের গণ্যমান্য বহু নরনারী তাঁহার নিকট আসিতে লাগিল। পূজ্যপাদ প্রেমানন্দ অধিকাংশ সময়ে ঠাকুর ও স্বামিজীর প্রসঙ্গ তুলিয়া তাঁহাদিগকে নানাবিধ উপদেশ দিতেন। মহারাজের যাহাতে কোন কষ্ট বা শ্রান্তি না হয় তজ্জন্য সকলেই সতর্ক থাকিতেন। একদিন একটী বালক প্রণাম করিয়া উঠিতেই ভাবের ঘোরে মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুই আমাকে দেখেছিস্?" উত্তরে সে বলিল, "মঠে ও বলরাম মন্দিরে আপনাকে অনেকবার দেখেছি।" মহারাজ বলিলেন, "একবার দেখলেই হল।"

ময়মনসিংহে অবস্থানকালে একদিন অপরাহ্নে মহারাজ ও

প্রেমানন্দ নদীর তীরে দলবলসহ বেড়াইতে যান। তথায় পৌঁছিয়া মহারাজ ভাবস্থ হন। প্রেমানন্দ উহা বুঝিতে পারিয়া সঙ্গী যুবক-ভক্তদিগকে ডাকিয়া বলেন—"যা, যা, মহারাজকে প্রণাম কর।" তাহারা একে একে প্রণাম করিলে করুণ-হৃদয় প্রেমানন্দ তৎকালে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "মহারাজ, ছেলেদের আশীর্ব্বাদ কর।" মহারাজ বলিলেন, "ছেলেদের অনেকে দেবতা হয়ে যাবে।" কখনও কখনও সহরের নিকট নদীর তীরে বা উন্মুক্ত প্রান্তরে বেড়াইতে গিয়া মহারাজ বলিতেন, "এখানে যেন অনন্তে মন লীন হয়ে যাচ্ছে।" কয়েক দিন এইভাবে পরমানন্দে অতিবাহিত হইল। অতঃপর মহারাজ রেলপথে ঢাকায় গমন করিলেন।

ঢাকা রেলষ্টেসনে মহারাজের বিপুল সম্বর্দ্ধনা হইয়াছিল। বহু ধর্ম্মপিপাসু নরনারী তাঁহার নিকট উপদেশ ও দীক্ষা লইবার জন্য আসিতে লাগিল। মহারাজ কাশীমপুর জমিদার-ভবনে অবস্থান করিতেন, সেখানে যেন উৎসব লাগিয়াই থাকিত। তাঁহাকে দর্শন করিয়া এবং তাঁহার মুখে আধ্যাত্মিক ভাবের কথা শুনিয়া সকলের প্রাণ স্নিগ্ধ ও শান্ত হইত। ১৩ই ফেব্রুয়ারী শুভদিনে যথাবিধি পূজা ও হোমের পর তিনি রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রমের ভিত্তি সংস্থাপন করিলেন।

ঢাকা সহরে মহারাজের আগমন-সংবাদ পাইয়া কাশীমপুরের জমিদার তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিলেন। কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার একমাত্র পুত্র মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় তিনি গভীর শোকে অভিভূত হইয়াছিলেন। মহারাজকে দর্শন করিয়া ও কথাপ্রসঙ্গে

উপদেশ শুনিয়া তাঁহার প্রাণের শোকাবেগ কতকটা প্রশমিত হইল। তিনি মহারাজকে কাশীমপুরে লইয়া যাইবার আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। মহারাজ উক্ত প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। যথোচিত সম্মান ও সম্বর্দ্ধনা সহকারে জমিদারবাবু মহারাজকে তাঁহার বাড়ীতে লইয়া গেলেন। তথায় তিনি তাঁহার নিকট অন্তরালে নিজ শোকদগ্ধ হৃদয়ের সমুদায় কথা অকপটে ব্যক্ত করিলেন। মহারাজ তাঁহার ঈদৃশ মানসিক অশান্তির কথা শুনিয়া ব্যথিত হইলেন। তিনি তাঁহাকে যথোচিত উপদেশ দান করিয়া কৃপা করিলেন। মহারাজের দয়ায় তিনি যথেষ্ট শান্তি ও সান্ত্বনা পাইলেন। নিকটবর্ত্তী গভীর জঙ্গল দেখাইবার জন্য তিনি একদিন মহারাজ ও প্রেমানন্দ স্বামীকে হস্তিপৃষ্ঠে লইয়া যান। অনন্তর মহারাজের কৃপায় তিনি সরল অন্তঃকরণে ভক্তিসহকারে পারমার্থিক সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

মহারাজ ঢাকায় ফিরিয়া আসিয়া কয়েকদিন পরে গেণ্ডারিয়াস্থিত বিজয়কৃষ্ণের তপস্যাপূত আশ্রমে গমন করিলেন। তথায় তখন গোঁসাইজীর বৃদ্ধা শাশুড়ী বাস করিতেছিলেন। ঠাকুরের নিকট বৃদ্ধা অনেক সময়ে যাতায়াত করিতেন এবং মহারাজের সঙ্গে সেই সময় হইতে তাঁহার আলাপ-পরিচয় ছিল। তিনি সহাস্যবদনে তাঁহার যথোচিত সম্বর্ধনা ও কুশলবার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন।

ঢাকা হইতে নারায়ণগঞ্জে আসিয়া মহারাজ প্রেমানন্দের সঙ্গে দেওভোগ গ্রামে নাগমহাশয়ের বাড়ী দর্শন করিতে পদব্রজে গমন করিলেন। খোল-করতাল লইয়া ঢাকার

ও নারায়ণগঞ্জের অনেক ভক্ত তাঁহাদের সহযাত্রী হইলেন। নাগমহাশয়ের বাড়ীতে সকলে পৌছিলে প্রেমানন্দ ভাবাবিষ্ট হইয়া গাত্র হইতে জামা কাপড় উন্মোচন করিয়া প্রাঙ্গণে গড়াগড়ি দিলেন। ভক্তেরা খোল-করতালসহ কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। মহারাজ একস্থানে বসিয়া কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন, "নাগমহাশয় শুদ্ধা অহৈতুকী ভক্তির পূর্ণ মূর্ত্তি ছিলেন।" তৎকালে ভাবোন্মত্ত প্রেমানন্দ তাঁহার নিকটে আসিয়া অর্দ্ধস্ফুট বাক্যে, "মহারাজ, এদের একটু কৃপা"—এই বলিয়া তাঁহাকে হাত ধরিয়া কীর্ত্তনের স্থানে লইয়া গেলেন। তখন কীর্ত্তন চলিতেছিল—

হরিরস-মদিরা পিয়ে মম মানস মাতোরে।
(একবার) লুটয় অবনীতল হরি হরি বলি কাঁদরে।
গভীর নিনাদে হরিনামে গগন ছাওরে।
নাচো হরি বলে দুইবাহু তুলে হরিনাম বিলাওরে।
হরিপ্রেমানন্দরসে অনুদিন ভাসোরে,
গাও হরিনাম, হও পূর্ণকাম, নীচ বাসনা নাশোরে।

যখন "গভীর নিনাদে হরিনামে গগন ছাওরে" পদটী গীত হইতেছিল তখন মহারাজ হঠাৎ হুঙ্কার দিয়া ভাবের ঘোরে কীর্ত্তনমণ্ডলীর মধ্যে নৃত্য করিতে গিয়াও নৃত্য করিতে পারিতেছিলেন না। ক্রমেই তিনি গভীর ভাবসমাধিতে একেবারে মগ্ন হইলেন। মহারাজের ঈদৃশ অবস্থা দেখিয়া সকলে তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। তাঁহার দুই হস্ত দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ, শরীর কঠিন কাষ্ঠবৎ। সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! সকলের হৃদয়ে অদ্ভুত আধ্যাত্মিক ভাবের তরঙ্গ বহিল। তাহারা মুগ্ধভাবে মহারাজের এই অপার্থিব দিব্যভাবের

অবস্থা অপলক নেত্রে ও ভক্তিরসাপ্লুত চিত্তে দেখিতে লাগিল।

মহারাজের ভাবসম্বরণ হইলে পর তথায় বাতাসা প্রভৃতি ভোগ আনিয়া হরিরলুট দেওয়া হইল। অনন্তর মহারাজ পরমানন্দে নারাণগঞ্জ প্রত্যাগমন করিলেন।

মহারাজের আগমনে নারায়ণগঞ্জে একটা আধ্যাত্মিক ভাবের প্রবল তরঙ্গ উঠিয়াছিল। তিনি বহু নরনারীকে সাধনপথের নির্দ্দেশদান ও কৃপা করিয়াছিলেন। অনন্তর প্রেমানন্দ স্বামী ও অন্যান্য সাধু-ব্রহ্মচারীসহ মহারাজ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে

মহারাজ মাঝে মাঝে কাশীধামে ও হরিদ্বার-কনখলের আশ্রমে গিয়া বাস করিতেন। তন্মধ্যে কাশীধামের আশ্রমকে কেন্দ্র করিয়া মহারাজ কখন কখন উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অন্যান্য তীর্থ দর্শন করিয়া আসিতেন। তাঁহার অবস্থানে এবং দিব্যদর্শনে আশ্রমের সাধুব্রহ্মচারিগণ, স্থানীয় ভক্ত ও ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তিরা পরমানন্দ অনুভব করিয়া কৃতার্থ হইতেন এবং পারমার্থিক তত্ত্ব ও চরম সত্যকে লাভ করিবার জন্য তাঁহাদের হৃদয় উন্মুখ হইয়া উঠিত। এইসব ভ্রমণের সময় নিষ্ঠাবান কর্ম্মী, জ্ঞানী ও ভক্তগণকে তাঁহাদের স্ব স্ব আদর্শ সার্ব্বভৌম উদারতার উপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করিয়া পারমার্থিক কল্যাণপথে অগ্রসর হইবার জন্য মহারাজ উৎসাহিত করিতেন।

মানুষ যে পথেই চলুক না কেন, যে আদর্শেই অনুরক্ত হউক না কেন, যে অবস্থায় বা পরিস্থিতিতেই পতিত হউক না কেন, ঈশ্বরই তাহার একমাত্র লক্ষ্য—ইহা তাহাদের হৃদয়ে দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত করাইবার জন্য মহারাজ ব্যগ্র হইয়া পড়িতেন। এই দুর্গম পথে চলিতে গেলে সত্যলাভের জন্য মানুষের যেরূপ অটল দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, অসীম ধৈর্য্য, অপরিসীম অধ্যবসায়, কঠোর তপশ্চর্য্যা এবং একান্ত ব্যাকুলতা আবশ্যক

তাহা সরল প্রাঞ্জল ভাষায়, সতেজ বাক্যে ও আধ্যাত্মিকতার বিমল দীপ্তির আলোকে বুঝাইয়া দিতেন। কিন্তু বুঝিবার ও বুঝাইবার পুরোভাগে থাকিত তাঁহার অলৌকিক ব্যক্তিত্ব, হৃদয়ের প্রজ্বলিত আধ্যাত্মিক অগ্নির উত্তাপ এবং বাণীর তেজোবহ্নি। ইহাতে উদ্দীপিত হইয়াই তাহাদের হৃদয়ের উৎসাহাগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিত এবং সত্যলাভের জন্য অনুরাগ বৃদ্ধি পাইত। তাঁহার নানাস্থান-ভ্রমণে এই তত্ত্ব স্ফুটতররূপে প্রকাশ হইত।

বিভিন্ন সময়ে তিনি কাশীধামে বা হরিদ্বারে পুনঃ পুনঃ গমন করিয়াছিলেন; তৎসমুদায় এই পরিচ্ছেদে সংক্ষিপ্তভাবে বিবৃত হইল।

১৯১২ খৃষ্টাব্দে ২০ শে মার্চ্চ বুধবার মহারাজ বেলুড় মঠ হইতে তুরীয়ানন্দ, শিবানন্দ, রামলাল দাদা, কয়েকজন সাধুসেবক এবং ভক্তসঙ্গে হরিদ্বার যাত্রা করিলেন। তাঁহারা সকলেই কনখল সেবাশ্রমে উঠিলেন। তুষারধবল হিমালয়শৃঙ্গ, গঙ্গার কলনিনাদ এবং শুদ্ধ পবিত্র ভাবপ্রবাহ মহারাজকে তথায় মুগ্ধ করিয়া ফেলিত। তিনি বলিতেন বৃন্দাবন ও কনখল তাঁহার খুব ভাল লাগিত। নিকটবর্ত্তী আশ্রমের মোহন্ত ও সাধুগণ প্রায়ই তাঁহার নিকট আসিতেন।

তথায় অবস্থানকালে মহারাজ দুর্গোৎসব করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। কনখলে সতী দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে তথায় কেহ প্রতিমায় দুর্গাপূজা করে নাই। কলিকাতা হইতে প্রতিমা আনাইয়া যথাবিধি মহাসমারোহে তিন দিন

কনখলে গৃহীত ফটো
১৯১২

মহামায়ীর পূজার্চ্চনা হইল। মঠে মঠে সকল সম্প্রদায়ের সাধুদের নিমন্ত্রণ করিয়া তিনি বিরাট সমষ্টি-ভাণ্ডারা দিলেন। সাধুরা প্রতিমা দর্শন, ভজনসঙ্গীত শ্রবণ ও মায়ের বিবিধ উপাদেয় প্রসাদ ধারণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। ভারতের উত্তর প্রান্তে হিমালয়ের ক্রোড়ে শ্রীশ্রীমহামায়ার পূজার উপকরণেও কোন ত্রুটী হয় নাই। কনখলের আশ্রমে কয়দিন যেন বাংলাদেশের আবির্ভাব হইয়াছিল। পূজান্তে মহারাজ দাক্ষিণাত্যে একবার দুর্গোৎসব করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সাধুরা পরে বহুকালাবধি কনখল আশ্রমে জিজ্ঞাসা করিতেন, "আবার কবে দুর্গোৎসব হইবে।"

এই সময়ে মঠের সাধুদের মধ্যে কেহ কেহ প্রায়ই তপস্যার জন্য হৃষীকেশ ও লছমন ঝোলায় গিয়াছিলেন। সেখান হইতে তাঁহারা কনখল আশ্রমে ফিরিয়া আসিলে মহারাজ তাঁহাদের কুশল প্রশ্ন করিতেন। কাহারও শরীর দুর্ব্বল ও বিবর্ণ দেখিলে তিনি তাঁহাকে বলিতেন, "কেমন ছিলি? কষ্ট পেয়েছিস্ বুঝি!" একজন তরুণ সাধু হৃষীকেশ হইতে কনখল আশ্রমে ফিরিয়া আসিলে মহারাজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিরে, তুই যে শুকিয়ে গেছিস্—কষ্ট হয়েছিল?" ইহা শুনিয়া শিবানন্দ স্বামিজী বলিলেন, "ও হৃষীকেশের তপস্যার হাওয়া লেগেছে!" মহারাজ অমনি বলিয়া উঠিলেন, "তপস্যা না ছাই, ওর মুখ কালো হয়ে গেছে, সেখানে কষ্ট পেয়েছে।" মহারাজ মঠের সাধু-ব্রহ্মচারী বা ভক্তদের সাধনভজনে যেমন উৎসাহিত করিতেন আবার তাঁহাদের শারীরিক স্বাস্থ্যের দিকে তেমনি সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন।

জনৈক সেবকের বন্ধু কিছুদিন যাবৎ হৃষীকেশে তপস্যা করিতেছিলেন। সেবক মহারাজকে জানান যে তাঁহার বন্ধুটির নির্ব্বিকল্প সমাধি লাভ হইয়াছে। ইহা শুনিয়া মহারাজ বলিলেন, "কইরে, সে এই কিছুদিন আগে এখানে এসেছিল, তার চোখ দেখে ত সেরকম কিছু হয়েছে বলে মনে হল না।" পরে গম্ভীরভাবে তিনি বলিতে লাগিলেন, "বাবা, সমাধি কি সোজা কথা—

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥

—এক ঠাকুরের সে সমাধি মুহুর্মুহুঃ দেখছি।" এই কথার পর সেবকটী জিজ্ঞাসা করেন, "মানুষের জীবনে বহুদিন ধরিয়া সাধন ভজন করিলে সমাধিলাভ সম্ভব কিনা?" প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "অটুট ব্রহ্মচর্য্য থাকলে সম্ভব।"

দুর্গোৎসবের পরে মহারাজ স্বামী শিবানন্দ, স্বামী তুরীয়ানন্দ ও সেবকগণসহ কাশীধামে চলিয়া আসিলেন। তাঁহাদের আগমনে আশ্রমে আনন্দোৎসব লাগিয়া গেল। ডাক্তার নৃপেন্দ্র মুখার্জ্জি প্রাণপণে তাঁহাদের যথোচিত সেবা ও যত্ন করেন।

শ্রীশ্রীমা কালীপূজার কিছু দিন পূর্ব্বে অক্টোবর মাসে কাশীধামে শুভাগমন করেন। অদ্বৈতাশ্রমে মহাসমারোহে শ্রীশ্রীশ্যামাপূজা হইল। শ্রীবৃন্দাবন হইতে আগত একটী দল রাসলীলার ভজন করিলে বেশ আনন্দের স্রোত প্রবাহিত হইল। কলিকাতা ও অন্যান্য স্থান হইতে বহু ভক্ত মহারাজকে দর্শন করিতে কাশীধামে আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কাহাকেও মঠে এবং কাহাকেও অন্যত্র থাকিয়া কিছুদিন সাধনভজন করিবার জন্য তিনি

উৎসাহিত করিলেন। তিনি বলিতেন, "ক্ষেত্রের মধ্যে কাশীধাম শ্রেষ্ঠ। কাশীর মত জায়গা নেই। কত সাধু ঋষি তপস্বী রাজর্ষির সাধনার ক্ষেত্র, সিদ্ধির স্থান। এখানে একটু জপধ্যান করলেই জমে যায়।" কাহাকে কাহাকেও গোপনে ডাকিয়া তিনি বলিতেন, "খুব উঠে পড়ে লাগ। এমন স্থান যে ধ্যান আপনা হতেই হয়। রাতদিন 'হর হর' 'বোম বোম' শব্দ হচ্ছে। এ স্থানের হাওয়াই অন্যরকম। একটু করলেই হাতে হাতে ফল পাওয়া যায়।"

এই সময়ে সুকণ্ঠ গায়ক খ্যাতনামা অঘোরবাবু কাশীবাস করিতেছিলেন। তিনি প্রায় প্রত্যহ প্রাতঃকালে আশ্রমে বেড়াইতে আসিতেন এবং মহারাজ ও উপস্থিত সকলকে মধুরকণ্ঠে বীণা যন্ত্র-সাহায্যে দুই চারিখানি ভজন শুনাইয়া যাইতেন। তাঁহার ভজনে যেন অমৃত বর্ষিত হইত। মহারাজ একদিন যন্ত্র-সাহায্যে তাঁহার ভজন শুনিতে ইচ্ছা প্রকাশ করায় তিনি দুইজন শ্রেষ্ঠ সারঙ্গী ও আনুষঙ্গিক বাদ্যযন্ত্র সহযোগে অদ্বৈত আশ্রমে সন্ধ্যারতির পর গান করেন। মহারাজ এবং মঠের সাধুগণ ও ভক্তমণ্ডলী তাঁহার সুর-তান-লয়সহ ভজনে মুগ্ধ হইলেন। মহারাজ পরে বলিয়াছিলেন, "এরূপ মধুর কণ্ঠ ও শুদ্ধ বাণী প্রায় শুনা যায় না, স্বর বন্ধ হলেও যেন হাওয়ায় সুর খেলছে, ভজনের ভাব আর সুর যেন এক হয়ে গেছে।"

ভক্তদের মধ্যে কয়েকজনের ধারণা ছিল যে, রামকৃষ্ণ মিশনের সেবাশ্রম ও সেবাধর্ম্ম ঠিক ঠাকুরের উপদেশ ও শিক্ষানুযায়ী নয়; ইহাতে পাশ্চাত্য ভাবের স্পর্শ আছে। তাঁহারা বলিতেন, যুবক

সাধুব্রহ্মচারীরা সাধন-ভজন দ্বারা ঈশ্বরলাভ না করিয়া ডিস-পেন্সারী ও হাসপাতালে রুগ্ন ও আর্ত্তের সেবা করিতেছে—ইহাই কি ঠাকুর বলিয়াছেন ? এইসব মতাবলম্বীদের মধ্যে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতলেখক শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ একজন ছিলেন। তিনি উক্ত সময়ে কাশীধামে গিয়া শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণীর নিকট নীচের তলায় একটী ছোট ঘরে থাকিতেন। দুইবেলা তিনি মহারাজ ও শিবানন্দ স্বামীর সঙ্গ করিতে অদ্বৈতাশ্রমে আসিতেন। একদিন শ্রীশ্রীমা সেবাশ্রম দেখিতে আসিলেন। মহারাজপ্রমুখ উভয় আশ্রমের সকলেই ভূমিষ্ঠ হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। পরে শ্রীশ্রীমাকে একটী পালকি করিয়া সেবাশ্রমের সমস্ত প্রদর্শন করাইয়া ডিসপেন্সারীর বারান্দায় আসিয়া সকলে দাঁড়াইলেন। মহারাজ মার জন্য চেয়ার আনাইলেন এবং কিঞ্চিৎ দূরে যুক্তকরে দাঁড়াইয়া রহিলেন। শ্রীশ্রীমা যেন তখন অন্তর্মুখী, স্থির ও শান্তভাবে বসিয়া আছেন। মহারাজ অতি বিনীতভাবে বলিলেন, "মা, এই সব সেবাশ্রমের যা কিছু উন্নতি সব কেদারবাবা ও চারুবাবুর প্রাণ-পাত চেষ্টায়।" কেদার বাবা (অচলানন্দ) অমনি বলিয়া উঠিলেন, "মা, সব মহারাজের দয়ায়। আমরা শুধু ওঁর আদেশ-মত খেটেছি।" শ্রীশ্রীমা নিরুত্তরে কিছুক্ষণ বসিয়া তাঁহার বাসায় ফিরিয়া গেলেন এবং পরে সেবাশ্রমের জন্য দশ টাকার একখানি নোট পাঠাইয়া দিলেন। কোন ভক্ত তাঁহার পাদপদ্ম বন্দনা করিতে গিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, সেবাশ্রম কেমন দেখলেন ?" মা ধীরভাবে বলিলেন, "দেখলাম ঠাকুর সেখানে প্রত্যক্ষ বিরাজ করছেন। তাই এই সব কাজ হচ্ছে। এই

সব তাঁরই কাজ।" মায়ের এই অভিমত ভক্তটী মঠে গিয়া মহারাজকে জানাইলেন। মহারাজ পূজ্যপাদ শিবানন্দকে তাহা অবিলম্বে বলিলেন। ঠিক সেই সময় মাষ্টার মহাশয় (মহেন্দ্রনাথ) অদ্বৈতাশ্রমে প্রবেশ করিলেন। তাঁহাকে মঠে আসিতে দেখিয়া মহারাজ কয়েকজন ব্রহ্মচারী ও ভক্তকে তাঁহার নিকট গিয়া জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন, "মাষ্টার মহাশয়, মা বলেছেন—সেবাশ্রম ঠাকুরের কাজ, সেখানে ঠাকুর প্রত্যক্ষ রয়েছেন—এখন আপনি কি বলেন?" মাষ্টার মহাশয়কে দেখিয়া সকলে একযোগে ঐ কথাগুলি বলিতে লাগিলেন। মহারাজও আর নীরব থাকিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহাকে বলিলেন, "মাষ্টার মহাশয়! মার কথা শুনেছেন তো? এখন আর না মানলে চলবে না। মা এই সেবাশ্রমে ঠাকুরকে প্রত্যক্ষ করলেন। মা বলেছেন, এ তাঁরই কাজ।" মাষ্টার মহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আর অস্বীকার করবার জো নেই।"

শ্রীশ্রীমাতাঠাকুরাণী অদ্বৈতাশ্রমের সন্নিকটে শ্রীযুত হরিপদ দত্ত ও কিরণচন্দ্র দত্ত মহাশয়দের বাড়ীতে ছিলেন। মহারাজ প্রতিদিন প্রাতে বেড়াইবার সময় তাঁহাকে দর্শনের জন্য তথায় যাইতেন; গোলাপ মাকে ডাকিয়া কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া পরে বালকের মত রঙ্গ করিতেন। শ্রীশ্রীমা উপর হইতে তাহা দেখিয়া আনন্দে উৎফুল্ল হইতেন। রাখালের কোন বিষয়ে কোন অভিমত জানিতে পারিলে তিনি অবিলম্বে অনুমোদন করিতেন। ভক্ত নরনারীরা আধ্যাত্মিক প্রশ্ন করিলে শ্রীশ্রীমা তাহার উত্তর দিতেন। আবার কাহাকেও কাহাকেও বলিতেন "রাখালকে

জিজ্ঞাসা করিও।" কাহাকেও গেরুয়া বস্ত্র দান করিয়া মা বলিয়া দিতেন, "রাখালের কাছে সন্ন্যাস নিও।" মহারাজও শ্রীশ্রীমার কোনও আদেশ বা অভিমত জানিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ তাহা নির্বিবচারে পালন করিতেন।

এইরূপ একদিন মহারাজ শ্রীশ্রীমাকে দর্শন করিবার জন্য নীচের প্রাঙ্গণে গিয়া দাঁড়াইলেন। মাষ্টার মহাশয় ঘর হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইলেন। গোলাপ মা উপরের বারান্দা হইতে মহারাজকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "রাখাল! মা জিজ্ঞেস কচ্ছেন, আগে শক্তিপূজা করতে হয় কেন?" মহারাজ উত্তর করিলেন, "মার কাছে যে ব্রহ্মজ্ঞানের চাবি। মা কৃপা করে চাবি দিয়ে দোর না খুললে যে আর উপায় নেই।" এই বলিয়া মহারাজ বাউলের সুরে গান ধরিলেন —

শঙ্করী-চরণে মন মগ্ন হয়ে রওরে।
মগ্ন হয়ে রওরে সব যন্ত্রণা এড়াওরে॥
এ তিন সংসার মিছে মিছে ভ্রমিয়ে বেড়াওরে।
কুলকুণ্ডলিনী ব্রহ্মময়ী অন্তরে ধিয়াও রে॥
কমলাকান্তের বাণী শ্যামা মায়ের গুণ গাওরে।
এতো সুখের নদী নিরবধি ধীরে ধীরে বাওরে॥

গীত গাহিতে গাহিতে তিনি ভাবোন্মত্ত হইয়া বালকের মত নাচিতে লাগিলেন। গানের শেষে তালের সঙ্গে আপনা আপনি —হো-হো-হো বলিয়াই সবেগে উক্ত গৃহ হইতে ক্ষিপ্রপদে বাহির হইয়া গেলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ-কথামৃতকার শ্রীযুত মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত মহাশয় এবং অন্যান্য ছয়েকটি ভক্ত দাঁড়াইয়া এই অপূর্ব

ভাবময় দৃশ্য দেখিতেছিলেন। উপরে অনেক স্ত্রীভক্ত লইয়া শ্রীশ্রীমা তাঁহার রাখালের এই নৃত্যগীত দেখিয়া আনন্দ করিতেছিলেন।

এই সময়ে শ্রীশ্রীমা একদিন মেয়ে ভক্তদের লইয়া সারনাথ দর্শনে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তজ্জন্য ভাড়াটিয়া ঘোড়ার গাড়ীর ব্যবস্থা হয়। মিস্ ম্যাকলাউড উক্ত সময়ে কাশীতে থাকায় হোটেল হইতে বড় ফিটন গাড়ী পাঠাইয়া দেন। কিন্তু উহা অনেক দেরিতে আসিয়া পৌছে। শ্রীশ্রীমা ইতিমধ্যে ভাড়াটিয়া গাড়ীতে সারনাথ চলিয়া গিয়াছেন শুনিয়া মহারাজ বিশেষ দুঃখিত হন। ডাঃ নৃপেনবাবু ও দুইজন সেবকসহ তিনি অবিলম্বে ঐ ফিটনে সারনাথ গমন করেন। তথায় পৌছিয়া শ্রীশ্রীমা যাহাতে উক্ত ফিটনে প্রত্যাগমন করেন তজ্জন্য মহারাজ বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলে শ্রীশ্রীমা তাহাতে সম্মত হইলেন। শ্রীশ্রীমা ও তাঁহার সঙ্গিনীদের ফিটনে তুলিয়া দিয়া তিনি ডাক্তারবাবু সহ ভাড়াটিয়া গাড়ীতে উঠিলেন। রাস্তার বাঁধের একটি বাঁকের মুখে ঘুরিবার কালে ঐ গাড়ী উল্টাইয়া পড়ে। ইহাতে মহারাজের বিশেষ কোন গুরুতর আঘাত লাগে নাই। তিনি বরং আনন্দিতচিত্তে বলিলেন, "ভাগ্যিস, মা এ গাড়ীতে যান নাই।" শ্রীশ্রীমা এই দুর্ঘটনার কথা শুনিয়া বলিয়াছিলেন, "এই বিপদ আমার অদৃষ্টে ছিল—রাখাল জোর করে নিজের ঘাড়ে টেনে নিলে।"

১৯১২ খৃষ্টাব্দে কাশীধামে শ্রীশ্রীমা যখন কিরণবাবুদের বাড়ীতে অবস্থান করিতেছিলেন তখন ৩০শে ডিসেম্বর তাঁহার জন্মতিথি ভক্ত নৃপেনবাবুর উদ্যমে মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। এই

উপলক্ষে মহারাজ ও ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদের উপস্থিতিতে একটী আনন্দের তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছিল। লোকে বলিত যে আশ্রম প্রতিষ্ঠা হওয়া অবধি এইরূপ আনন্দোৎসব পূর্ব্বে কখনও হয় নাই। কাশীধামে শ্রীশ্রীমা ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানদিগকে সূতানির্ম্মিত বস্ত্র প্রদান করিলেন, কেবল মহারাজের জন্য একখানা কমলা রংয়ের রেশমী কাপড়ের ব্যবস্থা হইল। এই বিষয়ে শ্রীশ্রীমাকে কেহ প্রশ্ন করিয়াছিল, "মা, সবাইতো আপনার সন্তান, তবে রাখাল মহারাজকে কেন রেশমী কাপড় দিলেন ?" মা অমনি বলিয়া উঠিলেন, "রাখাল যে ছেলে।"

কাশীধাম হইতে রওনা হইবার প্রাক্কালে মহারাজ কেদার বাবাকে বলিয়াছিলেন, "এবার কাশীতে বড়ই ভাল লাগছিল। আবার এলে এখানে পুরো এক বছর থাকবো।" ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ২৭শে এপ্রিল রবিবার মহারাজ ৺কাশীধামে ছয় মাস অবস্থান করিয়া বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসিলেন।

রামকৃষ্ণপুরের পরম ভক্ত নবগোপাল ঘোষ রামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীতে বিশেষভাবে পরিচিত। তাঁহার গৃহে ঠাকুর-প্রতিষ্ঠার দিন স্বামিজী গঙ্গাতীর হইতে কীর্ত্তন করিতে করিতে তথায় গমন করিয়াছিলেন এবং 'স্থাপকায় চ ধর্ম্মস্য' এই প্রণামমন্ত্রটী সেই সময় রচনা করেন। নবগোপালবাবুর ভক্তিমতী পত্নী ঠাকুরের একান্ত অনুরাগিনী ছিলেন। শ্রীশ্রীমা তাঁহাকে বিশেষরূপে ভালবাসিতেন এবং শ্রীরামকৃষ্ণের সন্তানেরাও তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। মহারাজ তাঁহার অনুরোধে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা অক্টোবর শ্রীশ্রীদুর্গাপূজোপলক্ষে

পুনরায় কাশীধাম যাত্রা করিলেন। অদ্বৈতাশ্রমেই শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব সমারোহে সম্পন্ন হইল। মহারাজ উপস্থিত থাকায় ভক্তমণ্ডলীর আনন্দের অবধি ছিল না। তিনি প্রত্যহ কাশীখণ্ড শ্রবণ ও সকলকে সাধনভজনে অনুপ্রাণিত করিয়া কাশীধামে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এই সময়ে সেবাশ্রমের কার্য্য-বিস্তৃতির জন্য মহারাজের আদেশ ও উপদেশ মত সরকারী সাহায্যে জমির চেষ্টা চলিতেছিল। বিভিন্ন দেশ হইতে বৃক্ষ ও বীজাদি আনাইয়া তিনি সেবাশ্রমকে সুশোভিত করিলেন। পুষ্পবৃক্ষাদি রোপণ, তাহাদের যথোচিত যত্ন এবং সকল দিকে পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে তিনি তাহাদিগকে শিক্ষা দিতেন। ৺পুরীর সমুদ্রকূল হইতে নানা বর্ণের ঝিনুক আনাইয়া তিনি সদর ফটকের স্তম্ভদ্বয় কারুকার্য্যখচিত করাইবার ব্যবস্থা করিলেন। ইহার জন্য কাশীর জনসাধারণ উক্ত সেবাশ্রমকে 'কৌড়ী হাসপাতাল' বলিয়া থাকে।

গ্রীষ্মের সময় রাত্রিকালে সেবাশ্রমের উন্মুক্ত তৃণাচ্ছন্ন মাঠে একটী খাটিয়ায় মহারাজ শয়ন করিতেন। দুই এক ঘণ্টা পরে তথা হইতে ঘরে আসিবার কালে বলিতেন, "তাত সয় তো বাত সয় না।" সেই মাঠে একটী বেল গাছ ছিল, সেই গাছটী দেখাইয়া তিনি সকলকে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন যাহাতে কেহ উহাতে না উঠে কিম্বা উহার পাতা পর্য্যন্ত না ছিঁড়িয়া লয়। তিনি বলিতেন, "ঐ বেল গাছে একজন সূক্ষ্মদেহী আছেন, কারুর অনিষ্ট করেন না।" এই প্রসঙ্গে সূক্ষ্মদেহীর সাহায্যে ভক্ত তুলসীদাসের ইষ্টলাভের কথা তিনি উল্লেখ করেন।

মহারাজ বললেন, "মহাত্মা তুলসীদাস প্রত্যহ গঙ্গাস্নানে যেতেন। স্নানান্তে কুটীরে ফিরে যাবার সময় একটী বৃক্ষমূলে ভিজা কাপড়খানা নিংড়াতেন। পরে দৈবাৎ আঘাত পেয়ে তাঁর পায়ে ঘা হয় ও ফুলে উঠে। সেই অবস্থায় তিনি অতিকষ্টে গঙ্গাস্নান করে সেই গাছের তলায় পূর্ব্বের মত কাপড় নিংড়াতেন। একদিন তথায় তিনি এক সূক্ষ্মদেহীর বাণী শুনলেন, 'আপনি এত কষ্ট পাচ্ছেন, ঐ লতার রসে ভাল হবেন।' এই বলে স্বয়ং আবির্ভূত হয়ে লতাটী দেখিয়ে দিলেন। তুলসীদাস বল্লেন— 'আমি তো নিত্য গঙ্গাস্নানে এই পথে যাতায়াত করি তা এতদিন বলেন নি কেন?' উত্তরে বল্লেন, 'ভোগের কাল কাটেনি, তাই বলি নি।' তুলসীদাস ব্যগ্র হয়ে বল্লেন, 'পা ত সেরে যাবে, কিন্তু কেমন করে আমার ইষ্টদর্শন হবে বলতে পারেন?' উত্তরে তিনি একটী স্থানের নাম উল্লেখ করে বল্লেন, 'সেখানে নিত্য রামনাম-ভজন হয় এবং অতিদূরে বসে এক জন কুষ্ঠ রোগী ভজন শোনেন। তাঁকে ধরলেই আপনার ইষ্টদর্শন হবে।' তুলসীদাস তাঁর কথামত যথাস্থানে গিয়ে উক্ত কুষ্ঠ রোগীর দর্শন পান ও তাঁতেই ইষ্টদর্শন হয়। এই রকম অনেক সময় শুদ্ধ সূক্ষ্মদেহীরাও লোকের অনেক প্রকারে কল্যাণ করে থাকেন।"

অনন্তর মহারাজ ঝুলনযাত্রা উপলক্ষে অযোধ্যা-দর্শনে যাত্রা করেন। হনুমানগড় মন্দিরে শ্রীশ্রীমহাবীরের সম্মুখে রামনাম-সঙ্কীর্ত্তন করিবার তাঁহার ইচ্ছা হইল। তথায় সাধু-ব্রহ্মচারী ও ভক্ত যাঁহারা তাঁহার সঙ্গে গিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে মিলিত হইয়া

রামনাম-সঙ্কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। রামনাম-কীর্ত্তন শুনিতে শুনিতে তিনি গভীর ভাবাবিষ্ট হইলেন এবং সমাগত সকলেই তন্ময়তা-জনিত একটা অপূর্ব্ব আনন্দে মগ্ন হইয়াছিল।

একদিন সন্ধ্যার পর মহারাজ ঝুলন দেখিতে যান। তথায় সুসজ্জিত মঞ্চে শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে জনৈক নট নাচিতে নাচিতে সুমধুর ভজন গাহিতেছিল। মহারাজ তথায় বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া ভজন শুনিতেছিলেন। ইতিমধ্যে প্রবল ধারায় বৃষ্টি নামিল। ক্রমে জলধারা সামিয়ানার মধ্যস্থল দিয়া সজোরে পতিত হইয়া দাঁড়াইবার স্থান পর্য্যন্ত ভাসাইয়া দিল। এমত অবস্থায় মহারাজ স্থিরভাবে ভজন শুনিতেছেন দেখিয়া একটা বেঞ্চ তথায় আনা হইল এবং তাঁহাকে বলায় তিনি উহার উপর উঠিয়া দাঁড়াইলেন। এইরূপ ভাবোন্মত্তচিত্তে শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে সুদীর্ঘকাল তিনি তন্ময় চিত্তে ভজন শুনিতে লাগিলেন। বৃষ্টি বন্ধ হইবার বহুক্ষণ পরে মহারাজ প্রকৃতিস্থ হইয়া বাসস্থলে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। তথায় এইরূপ ভাবতন্ময়তায় পরমানন্দে পাঁচদিন বাস করিয়া তিনি কাশীধামে পুনরায় ফিরিয়া আসিলেন।

সাধু-ব্রহ্মচারিগণকে সমবেতভাবে কালীকীর্ত্তন ও ভজন-সঙ্গীত গাহিতে মহারাজ প্রায়ই বলিতেন। অম্বিকানন্দ উচ্চ সুরতান-যোগে উভয় আশ্রমের অনেককে ভজন-সঙ্গীত শিক্ষা দিতে আরম্ভ করিলেন। সেবাশ্রমের সেবকগণ দুপুরবেলা প্রায় দুই ঘণ্টা অবসর পাইত। আহারান্তে আধ ঘণ্টা বিশ্রাম করিয়া তাঁহারা ও অন্যান্য সাধুগণ অদ্বৈত আশ্রমে সমবেত হইতেন। কাশীধামে নিদারুণ গ্রীষ্মকালে যখন

বাহিরে লু চলিত তখন তাঁহারা আশ্রমের বড় ঘরের দরজা জানালা সব বন্ধ করিয়া সকলে একত্রে সঙ্গীতবিদ্যা অভ্যাস করিতেন। বাহিরে সামান্য অস্পষ্ট ধ্বনি শুনা যাইত। স্বামী অম্বিকানন্দের শিক্ষা দিবার কৌশলে অনেকেরই সুরতানলয় বোধ হইল। উভয় আশ্রমের মিলিত সাধু-ব্রহ্মচারী ও কর্ম্মিবৃন্দ দুর্গাবাড়ী ও শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণামন্দিরে আমন্ত্রিত হইয়া বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ গুণিগণের সম্মুখে ভাবের সঙ্গে সুদীর্ঘ তিন ঘণ্টা ব্যাপী ভজন গাহিতেন, শ্রোতৃবর্গ ভক্তিরসাপ্লুত চিত্তে তাহা শুনিত। অন্নপূর্ণার মন্দিরের মোহান্তজী মহারাজকে যথাসম্মানে পরম শ্রদ্ধাসহকারে বসাইয়া স্বয়ং তাঁহার পার্শ্বে অবহিত চিত্তে উপবিষ্ট থাকিতেন। আশ্রমের সাধু ও ভক্তগণ তথায় সাদরে অভ্যর্থিত হইতেন। সেবাশ্রমে বা অদ্বৈত আশ্রমে এই ভজন গান শুনিবার জন্য কাশীস্থ বহুলোক তথায় আসিত। শুদ্ধচেতা সাধনপরায়ণ সাধু-ব্রহ্মচারি-গণের ভক্তিপূর্ণ ভজন শুনিয়া এবং মহারাজের ভাবতন্ময় শান্ত সৌম্য মূর্ত্তি দর্শনে আকৃষ্ট হইয়া সমাগত সকলেই অপার আনন্দে আপ্লুত হইত।

১৯১৪ সালের এপ্রেল মাসে স্বামী তুরীয়ানন্দের বহুমূত্রের পীড়া বৃদ্ধি হওয়ায় তিনি কনখল হইতে ডেরাহুন চলিয়া যান। মহারাজ কাশীধামে সেই সংবাদ পাইয়া একজন ব্রহ্মচারীকে তথায় পাঠাইয়া দেন। তুরীয়ানন্দের নিকট এক পত্র লিখিয়া মহারাজ জানাইলেন যে ডেরাহুনে যেন একটী ছোট বাড়ী ভাড়া লইয়া স্বতন্ত্র ভাবে তিনি গ্রীষ্মের কয়মাস অতিবাহিত করেন। ইহার খরচের জন্য চিন্তা নাই, তিনি স্বয়ং সে ভার গ্রহণ

করিবেন। এই ঘটনাটী উল্লেখ করিয়া তুরীয়ানন্দ কোন ভক্তকে লিখিয়াছিলেন, "আমার প্রতি তাঁহার খুবই স্নেহ ও ভালবাসা।" বর্ষাকালে তিনি কনথল আশ্রমে বাস করিতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে শ্রীশ্রীশারদীয়া পূজা সমাগত হইল। চতুর্দ্দিকে লোক বিপন্ন, বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুর জেলায় ভীষণ বন্যা, বিভিন্ন দেশে অন্নকষ্ট এবং পাশ্চাত্য দেশে যুদ্ধের জন্য লোকজনের দুর্গতি দেখিয়া মহারাজ এবার প্রতিমায় দুর্গোৎসব স্থগিত রাখিয়া শ্রীশ্রীকালীপূজা করিতে পরামর্শ দিলেন। এই সময়ে তুরীয়ানন্দ স্বামীকে কাশীতে আসিবার জন্য তিনি স্বহস্তে লিখিয়া একখানি পত্র পাঠাইলেন। মহারাজের সাদর আহ্বানে তিনি কনথল হইতে আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। ইতিমধ্যে শিবানন্দ স্বামী আলমোড়া হইতে কাশীধামে আসিয়া পৌঁছিলেন।

এদিকে মহারাজ বেলুড় মঠে দীর্ঘকাল আগমন না করায় প্রেমানন্দ স্বামী তাঁহাকে আনিবার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার একান্ত ইচ্ছা মহারাজ মঠে শীঘ্র প্রত্যাগমন করেন। ১৯১৪ সালের ৪ঠা অক্টোবর লিখিত কাশীর এক পত্রে তিনি জানিতে পারিলেন যে, মহারাজের বৃন্দাবন যাইবার ইচ্ছা হইয়াছে। ইহা শুনিয়া তিনি যে কোন উপায়ে মহারাজকে বেলুড় মঠে অনিবার জন্য স্বয়ং কাশীধামে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। শ্রীশ্রীকালীপূজার পূর্ব্বে এইভাবে গুরুভ্রাতাগণ তথায় সম্মিলিত হইয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন। উভয় আশ্রমের সাধু-ব্রহ্মচারিগণও অপার আনন্দে মগ্ন হইলেন।

অদ্বৈত আশ্রমে যথাবিধি শ্রীশ্রীকালীপূজা অনুষ্ঠিত হইল।

শুকুল মহারাজ (আত্মানন্দ) পূজক ও অম্বিকানন্দ তন্ত্রধারক ছিলেন। রাত্রিশেষে পূজক ও তন্ত্রধারক হোম-সমাপ্তির পর অন্যত্র গিয়াছিলেন। প্রতিমার নিকট সে সময় কেহ ছিল না। আশ্রমের অধ্যক্ষ চন্দ্র মহারাজ (নির্ভরানন্দ) সম্মুখস্থ ঘরে জাগিয়া বসিয়াছিলেন। এমন সময়ে মহারাজ তথায় আসিয়া প্রতিমার সম্মুখে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলেন। পরে উঠিয়া যুক্তকরে ভাবে বিহ্বল হইয়া তিনি বলিতে লাগিলেন, "ওমা দয়াময়ী, মাগো—কৃপা কর করুণাময়ী।" এই ভাবে কিছুক্ষণ বালকের মত তিনি কত আবদার করিতে লাগিলেন। চন্দ্র মহারাজ ঘরে বসিয়া মহারাজের এই ভাবময় অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিয়া মুগ্ধ ও বিগলিত হইয়াছিলেন।

পরদিন বেলা বারটা পর্য্যন্ত অমাবস্যা থাকায় প্রাতে পূজা ও ভোগের ব্যবস্থা হয়। ভোগান্তে আরতি আরম্ভ হইল। বহু ভক্ত পূজা দেখিতে আসিয়াছিলেন। মহারাজ "হের হর-মনোমোহিনী" গানটী গাহিতে বলিলেন। অম্বিকানন্দ হারমোনিয়াম সহযোগে গাহিলেন—

হের হর-মনোমোহিনী কে বলেরে কাল মেয়ে,
(আমার) মায়ের রূপে ভুবন আলো, চোখ থাকে ত দেখ না চেয়ে।
বিমল হাসি ক্ষরে শশী অরুণ পড়ে নখে খসি
এলোকেশী শ্যামা ষোড়শী,
কমল ভ্রমে ভ্রমর ভ্রমে, বিভোর ভোলা চরণ পেয়ে।

সাধু-ব্রহ্মচারী ও ভক্ত অনেকেই সঙ্গে সঙ্গে গাহিতে লাগিলেন। মহারাজ জনৈক সাধুর হাত হইতে চামর লইয়া ব্যজন-

সহ তালে তালে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার নৃত্য দেখিয়া চতুষ্পার্শ্বস্থ সকলেই নৃত্য করিতে লাগিল। ভাবের আবেগবশতঃ মহারাজ নৃত্যকালে যেন ঢলিয়া ঢলিয়া পড়িতেছিলেন। উদ্দীপনা-বশতঃ আত্মানন্দের আরতিও অনেকক্ষণ ধরিয়া চলিল। পরে আরতি শেষ হইলে সকলে সমবেতকণ্ঠে প্রণামমন্ত্র গাহিলেন—

"সর্ব্বমঙ্গলমঙ্গল্যে শিবে সর্ব্বার্থসাধিকে
শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরি নারায়ণি নমোঽস্তুতে"।

এই প্রণামমন্ত্র আরম্ভ হইলে মহারাজের বাহ্যস্ফূর্ত্তি আসিল। যাঁহারা এই সময়ে উপস্থিত ছিলেন তাঁহাদের স্মৃতিপটে উক্ত ঘটনা এখনও সমুজ্জ্বল রহিয়াছে।

শ্রীশ্রীকালীপূজার পরে বিজ্ঞানানন্দ স্বামীর পূর্ব্ব অনুরোধ ও আগ্রহ স্মরণ করিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ও এলাহাবাদের মঠ ও সেবাশ্রম দেখিবার উদ্দেশ্যে মহারাজ সেবকগণসহ তথায় গমন করিলেন। প্রেমানন্দও পরে কাশী হইতে এলাহাবাদ চলিয়া গেলেন। প্রয়াগে শ্রীবেণীমাধব ও ত্রিবেণীসঙ্গম দর্শনাদি করিয়া তথায় তিন রাত্রি মহারাজ অতিবাহিত করিলেন। চতুর্থ দিবস দ্বিপ্রহরে বিশ্রামান্তে মহারাজের সম্মুখে হঠাৎ প্রেমানন্দ উপস্থিত হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণামপূর্ব্বক বলিলেন, "মহারাজ, তোমায় মঠে যেতেই হবে।" বয়োজ্যেষ্ঠ প্রিয়তম গুরুভ্রাতাকে এই ভাবে ভূমিষ্ঠ হইতে দেখিয়া মহারাজ শশব্যস্তে চেয়ার ছাড়িয়া দাঁড়াইয়া উঠিলেন এবং সস্নেহে ব্যগ্র কণ্ঠে বলিলেন, "ওকি, বাবুরাম দা, ওকি! ওঠ—ওঠ!" প্রেমানন্দ ভূমিতে তদবস্থায় থাকিয়াই পুনরায় বলিলেন, "মহারাজ! তোমায় মঠে যেতেই

হবে।” মহারাজ তখন অত্যন্ত কাতরভাবে বলিলেন, “বাবুরাম দা, ওঠ ওঠ, আমি যাব।” তখন প্রেমানন্দ উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং উত্তেজিত কণ্ঠে গম্ভীর ভাবে মহারাজকে বলিলেন, “আজই যেতে হবে।” সে দিন সকল ব্যবস্থার সময় না থাকায় মহারাজ পরদিনই রওনা হইয়া ২৬শে নভেম্বর বেলুড় মঠে পৌঁছিলেন।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে সারদানন্দ মঠ ও মিশনের কার্য্য লইয়া ভুবনেশ্বর মঠে মহারাজের নিকটে আসিলেন। তাঁহার মুখে কাশী সেবাশ্রমের সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া মহারাজ তাঁহার সঙ্গে অনতিবিলম্বে কাশীধামে যাত্রা করিলেন। সেবাশ্রমে গিয়া তিনি দেখিলেন, কার্য্য সুশৃঙ্খলভাবে চলিতেছে না। কারণ ইহার মূলে রহিয়াছে সকলের ভিতরে প্রভুত্ব ও অভিমান। তিনি এইসব বিষয়ে কাহাকেও কোন তিরস্কার বা শাসন না করিয়া মঠে ও সেবাশ্রমের চারিদিকে এমন একটা আনন্দময় আধ্যাত্মিক ভাবের সৃষ্টি করিলেন যাহাতে সাধু-ব্রহ্মচারী ও সেবাশ্রমের সেবকদের প্রাণে জাগিয়া উঠিল সাধনার প্রবল উদ্দীপনা ও আকুল আগ্রহ। প্রতিদিন সন্ধ্যারতির পর মঠের ও সেবাশ্রমের সাধু, ব্রহ্মচারী, সেবক ও ভক্তেরা মহারাজের ঘরে সমবেত হইতেন। মহারাজ তাঁহার গুরুভ্রাতাদের সহিত বসিয়া সাধনরাজ্যের গূঢ় তত্ত্ব ও মনুষ্য-জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য সরলভাবে তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিতেন। উভয় আশ্রমের সাধু-ব্রহ্মচারী ও সেবকদিগকে উচ্চ আদর্শে তিনি সতত অনুপ্রাণিত করিতেন। তন্মধ্যে যাহারা জিজ্ঞাসু ও পিপাসু তাহাদের প্রশ্ন ও সংশয় তাঁহাকে জানাইলে তিনি অমনি সেগুলির সমাধান করিয়া

দিতেন। উভয় আশ্রমের সাধু-ব্রহ্মচারিগণ একত্রে মিলিত হইয়া পূর্ব্বের ন্যায় যাহাতে ভজন-গান করেন তদুদ্দেশ্যে তিনি সকলকে 'কালীকীর্ত্তন', 'রামনাম' সংগীতাদিতে যোগদানে উৎসাহিত করিতেন। নামকীর্ত্তনের তন্ময়তায় গায়ক ও শ্রোতৃবৃন্দ এক ঘনীভূত আনন্দের আস্বাদ পাইত। এইরূপে ধীরে ধীরে তাহাদের হৃদয়ে এক বিমল ভাবের প্রবাহ বহিতে লাগিল এবং পরস্পরে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হইল। তাঁহার উপস্থিতিতে এবং সামীপ্যে এমনি একটী অপূর্ব্ব ভাবের আবেষ্টন সমুজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পাইত। ইহা লক্ষ্য করিয়া তুরীয়ানন্দ বলিতেন, "মহারাজ যেখানে থাকেন, তাঁর চতুষ্পার্শ্বে তিনি এমন একটী আবহাওয়া সৃষ্টি করে বসেন, তার মধ্যে যে কেহ যাবে তাকে সে ভাবেই ভাবিত হতে হবে।"

তুলসীদাস-প্রতিষ্ঠিত 'সঙ্কটমোচন' স্থানে শ্রীশ্রীমহাবীরের সম্মুখে উভয় আশ্রমের সাধু-ব্রহ্মচারীদের লইয়া তিনি রামনাম সংকীর্ত্তন করাইলেন। ফাল্গুনের কৃষ্ণা একাদশী তিথিতে ইহা প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। এই রামনাম-কীর্ত্তনে স্থানীয় ভক্তবৃন্দ ও অনেক বিশিষ্ট লোক পরম আনন্দ লাভ করিলেন। তদবধি উক্তস্থানে মহারাজের অভিপ্রায়ানুযায়ী প্রতিবৎসর এইদিনে রামনাম-কীর্ত্তন হইয়া থাকে।

অনন্তর কাশী অদ্বৈত আশ্রমে স্বামিজী ও ঠাকুরের জন্মতিথি উপলক্ষে চল্লিশ জন সন্ন্যাস ও ব্রহ্মচর্য্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি তথায় ত্যাগ-বৈরাগ্যের অগ্নিমন্ত্রে অনুপ্রাণিত করিয়া এই একবারমাত্র ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাস দান করিয়াছিলেন। সেবাশ্রমের

প্রারম্ভ হইতে অক্লান্ত কর্ম্মী ও পরে অধ্যক্ষ চারুচন্দ্র (শুভানন্দ) সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া এই সময়ে তপস্যায় চলিয়া যান। মহারাজ বহুপূর্ব্বে একজনকে কাশীধামে দীক্ষা দিয়াছিলেন, পরে তথায় আর কাহাকেও দীক্ষা দেন নাই। তিনি বলিতেন, "স্বয়ং বিশ্বনাথ এখানে জীবের মন্ত্রদাতা গুরু"।

কাশীধামে যখন তিনি শ্রীশ্রীবিশ্বেশ্বর ও শ্রীশ্রীঅন্নপূর্ণা-দর্শনে যাইতেন তখন তাঁহার গুরুভ্রাতা এবং মঠের অন্যান্য সাধু-ব্রহ্মচারীরা তাঁহার সঙ্গে গমন করিতেন। কাহাকেও আবার ডাকিয়া মহারাজ সঙ্গে লইতেন। দলবল সহ তাঁহাকে যাইতে দেখিয়া লোকে জিজ্ঞাসা করিত, "ইনি কোন্ মঠের মোহান্ত মহারাজ?" এই সময়ে তাঁহার ভাবগম্ভীর আকৃতি স্বতঃই সকলের চিত্তাকর্ষণ করিত।

কাশীধামে বিশ্বনাথ ও অন্নপূর্ণার মন্দিরে প্রবেশ করিলেই মহারাজ প্রায় ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িতেন। ৺শিবচতুর্দ্দশীর দিন তিনি দর্শনার্থ আশ্রম হইতে সদলবলে পদব্রজে মন্দিরে গেলেন। বাবা বিশ্বনাথের মন্দিরে প্রবেশ করিয়া তিনি দেখিলেন যে ঝাড়ুদারেরা মন্দিরতল ঝাড়ু দিয়া পরিষ্কার করিতেছে। ইহা দেখিয়া তিনি সহসা দীনভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া একজন ঝাড়ুদারের নিকট হইতে তাহার ঝাঁটাটি চাহিয়া লইয়া স্বহস্তে মন্দির পরিষ্কার করিতে লাগিলেন। তিনি এমন অভিমানশূন্য দীনতার সহিত বিভোর ভাবে ঝাড়ু দিতেছিলেন যে উপস্থিত দর্শনার্থী সকলেই নির্নিমেষ লোচনে অবাকবিস্ময়ে চাহিয়া রহিল। ভাববিহ্বল মহারাজ বিশ্বনাথ দর্শন করিয়া অন্নপূর্ণার মন্দিরে

প্রবেশ করিলেন। অন্ত মা অন্নপূর্ণার রাজরাজেশ্বরী বেশ। স্বয়ং বিশ্বনাথ তাঁহার নিকট ভিক্ষুক। অদ্বৈতকেশরী ভগবান শঙ্করাচার্য্য করজোড়ে প্রার্থনা করিয়াছিলেন,

"অন্নপূর্ণে সদাপূর্ণে শঙ্করপ্রাণবল্লভে।
জ্ঞানবৈরাগ্যসিদ্ধ্যর্থং ভিক্ষাং দেহি চ পার্ব্বতি।"

জগন্মাতা যে জ্ঞান, বৈরাগ্য ও প্রেম দুই হস্তে জগতে বিলাইতেছেন! মহারাজ মা অন্নপূর্ণার মূর্ত্তি দর্শন করিয়া ভাবচক্ষে কি প্রত্যক্ষ করিতেন, তাহা কে বলিবে? তিনি ভাবে তন্ময় ও তাঁহার নয়ন অর্দ্ধনিমীলিত। কিছুক্ষণ পরে তিনি মৃদুস্বরে তাঁহার সঙ্গী ব্রহ্মচারীদের কালীকীর্ত্তন করিতে বলিলেন। ঘনীভূত ভাবের প্রবাহে কীর্ত্তন জমিয়া উঠিল। দলে দলে তীর্থযাত্রী ও দর্শনার্থী নরনারী ভক্তিবিগলিত হৃদয়ে তাঁহাদের চারিদিকে দাঁড়াইয়া সেই অপূর্ব্ব ভজনগান শুনিতে লাগিল। সমগ্র মন্দিরে একটা আধ্যাত্মিকভাবের জমাট বাঁধিয়া গেল। সেই জনমণ্ডলী যেন ভাবাবিষ্ট, কাহারও মুখে একটী শব্দ নাই। সকলেই ভক্তি-বিহ্বল চিত্তে নীরব ও নিস্পন্দ। এরূপ গম্ভীর স্তব্ধতার মধ্যে মনোমুগ্ধকারী ভজনগীতি চলিতে লাগিল। মহারাজের অপার্থিব হাস্যময় বদনমণ্ডলে বিমল স্নিগ্ধ জ্যোতি, নেত্রে প্রেমের প্রবাহ, সমুন্নত দেহ স্থির এবং সর্ব্বাঙ্গে অপূর্ব্ব এক লাবণ্যলহরী বহিয়া যাইতেছে। সকলেই নীরবে চিত্রার্পিতের ন্যায় এই দৃশ্য দেখিতেছিল।

বাস্তবিকই এই সময়ে মহারাজ যেন এক অতীন্দ্রিয় ভাবরাজ্যে নিয়ত বিচরণ করিতেন। তাই যেখানেই তিনি বসিতেন, গল্প

করিতেন বা ভজন গান শুনিতেন সেইখানেই একটা ঘনীভূত ভাবের আনন্দ প্রবাহিত হইত। তাঁহার আশেপাশে চতুর্দ্দিকে যাহারা থাকিত তাহাদের প্রত্যেকের ভিতর একটা নিবিড় আনন্দের তড়িৎ-প্রবাহ আনিয়া দিত। তাহাদের নিজ নিজ সত্তার স্বাধীনতা, অহমিকাবিজড়িত জাগতিক সুখ-দুঃখের স্মৃতি সাময়িকভাবে কোথায় সহসা লুপ্ত হইয়া যাইত। আধ্যাত্মিক জ্যোতির বিমল আলোকে তাহাদের অন্তর যেন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিত।

অদ্বৈতাশ্রমে প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীঠাকুরের প্রতিকৃতিখানি পুরাতন ও জীর্ণ হওয়ায় এই সময় উহা পরিবর্ত্তিত হয়। নূতন প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠানগুলি মহাসমারোহে সম্পন্ন হইয়াছিল। এই সময়ে সারদানন্দ, তুরীয়ানন্দ, সুবোধানন্দ প্রভৃতি ঠাকুরের পরম অন্তরঙ্গ সন্তানেরা মহারাজের সঙ্গে এখানে অবস্থান করিতেছিলেন। পূজার্চ্চনা প্রভৃতি অনুষ্ঠান সমাপ্ত হইলে মহারাজ উপস্থিত সাধু-ব্রহ্মচারীদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "তোরা ঐ গানটী গা—এসেছে নূতন মানুষ।" তাঁহারা অমনি বাদ্যযন্ত্র-সহযোগে সমবেত-কণ্ঠে গাহিলেন—

"এসেছে নূতন মানুষ দেখবি যদি আয় চলে,
(তাঁর) বিবেক-বৈরাগ্য-ঝুলি দুই কাঁধে সদাই ঝুলে॥
শ্রীবদনে "মা-মা" বাণী পড়ি গঙ্গা-সলিলে,
(বলে) ব্রহ্মময়ি, গেল যে দিন দেখা ত নাহি দিলে॥
নাস্তিক অজ্ঞানী নরে—সরল কথায় শিখালে,
যেই কালী—সেই কৃষ্ণ, নামে ভেদ এক মূলে॥

'একোয়া' 'ওয়াটার' 'পানি' 'বারি' নাম দেয় জলে
'আল্লা' 'গড' 'ঈশা' 'মুশা' কালী নাম ভেদে বলে॥
দীন ধনী মানী জ্ঞানী—বিচার নাই জাতি কুলে,
আপনহারা পাগলপারা সরলে নেহারিলে॥
দুবাহু তুলিয়ে ডাকে, আয়রে তোরা আয় চলে,
তোদের তরে কৃপা করে বসে আছি বিরলে॥
যতন করি পারের তরী—বেঁধেছি ভবের কূলে॥

এই ভজনটী সম্পূর্ণ শেষ হইবার পূর্ব্বে এক অপরূপ দৃশ্যপট উন্মুক্ত হইল। ভাবোন্মত্ত মহারাজ আর স্থিরভাবে বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, তিনি দাঁড়াইয়া তালে তালে নৃত্য করিতে লাগিলেন। তাঁহার নৃত্যের সঙ্গে সঙ্গে সকলের ভিতরে যেন একটা ভাবের বিদ্যুৎ-প্রবাহ চমকিয়া উঠিল। ভাবগম্ভীর সারদানন্দ এবং রুগ্নদেহ তুরীয়ানন্দও মহারাজের সঙ্গে নৃত্য করিতে লাগিলেন। চারিদিকে জমাট ঘনীভূত ভাবের প্রবাহে সকলেই আত্মহারা, ভাবে মাতোয়ারা! মহারাজের ভাবতন্ময় নৃত্যে সকলের মনে আধ্যাত্মিক ভাবের উৎস খুলিয়া গেল। যে যে অবস্থায় তথায় ছিলেন, সেই অবস্থাতেই অননুভূত আনন্দে মাতিয়া উঠিলেন। কি এক অপূর্ব্ব প্রেমের স্রোতে সকলে ভাসিয়া চলিতেছেন। "এসেছে নূতন মানুষ" প্রতি কণ্ঠে স্ফুরিত হইল আর সত্য সত্য সেই সঙ্গে যেন নূতন মানুষের রূপ তাঁহাদের হৃদয়-পদ্মে প্রতিভাত হইতে লাগিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

পুরী ও ভুবনেশ্বরের মঠ

একবার কাশীধামে যাইবার সময় প্রাতে গয়া ষ্টেসনে গাড়ী থামিলে জনৈক সেবক মহারাজকে বলিয়াছিলেন, "গাড়ী কিছুক্ষণ এখানে থাকবে, যদি ইচ্ছা করেন, তবে প্লাটফরমে পায়চারি করতে পারেন।" মহারাজ ইহা শুনিয়া জিব কাটিয়া অসম্মতি জানাইয়া তাহাকে বলিলেন, "ঠাকুর নিষেধ করেছিলেন। আমার একবার গয়াধামে আসবার কথা হয়েছিল, তাতে ঠাকুর বলে উঠলেন, 'না—না, ও গয়ায় যাবে না, ও পুরীতে যাবে। গয়ায় গেলে শরীর থাকবে না'।" বোধ হয় এই জন্য তিনি বহুবার পুরীধামে আসিয়াছেন, দীর্ঘকাল বাস করিয়াছেন। শ্রীনীলাচল তীর্থ তাঁহার বড়ই প্রিয় ছিল।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দে মে মাসে মাদ্রাজ হইতে মহারাজ পুরীধামে ফিরিয়া শশীনিকেতনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। দক্ষিণদেশ হইতে যে রামনাম-সংকীর্ত্তন সংগৃহীত হইয়াছিল তাহাতে প্রার্থনা ও স্তব সন্নিবেশ করা হইল। অম্বিকানন্দ সুরতানলয় সংযোগ করিলে শশীনিকেতনের সুবিস্তৃত হলঘরে মঠের সাধু-ব্রহ্মচারিগণ সমবেত হইয়া মহারাজের সম্মুখে সর্ব্ব প্রথমে উহা গাহিলেন। পরে একদিন শ্রীমন্দিরেও রামনাম-সংকীর্ত্তন হইল। পুরীধামের গণ্যমান্য শিক্ষিত সম্প্রদায় ও ধর্ম্মপ্রাণ ভক্তেরা ইহা শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন।

মহারাজের অবস্থানে শশীনিকেতন আনন্দনিকেতনে পরিণত হইত। গৃহস্বামী রামবাবু ঠাকুরের পরম অন্তরঙ্গ ভক্ত বলরামবাবুর একমাত্র পুত্র ছিলেন। রামবাবু তাঁহার পিতার ন্যায় শ্রীরামকৃষ্ণের পাদপদ্মে স্বীয় জীবন মন প্রাণ নিবেদন করিয়াছিলেন। শ্রীশ্রীমা এবং ঠাকুরের ত্যাগী অন্তরঙ্গ সন্তানেরা তাঁহাকে পরমাত্মীয় জ্ঞানে স্নেহ করিতেন। মঠের সাধুদের সেবা করিবার কোন সুযোগ পাইলে রামবাবুও আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিয়া আনন্দিত হইতেন। মহারাজের সেবায় তিনি সতত মুক্তহস্ত ছিলেন এবং তাঁহার আদেশে পুরীর কর্ম্মচারীরা সর্ব্বদা সতর্ক থাকিত, যাহাতে তথায় তাঁহার সেবার অণুমাত্র ক্রটী না হয়।

দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নে একটী ঘটনার কথা উল্লেখ করা যাইতেছে। ১৯০৭ খৃষ্টাব্দে মহারাজ যখন নীলাচলে গমন করিতে মনস্থ করেন তখন রামবাবু কলিকাতায় ছিলেন। ইহার কিছুদিন পূর্ব্বে শশীনিকেতন ভাড়া দেওয়া হইয়াছিল। মহারাজের পুরী যাত্রা করিবার নির্দ্দিষ্ট তারিখের সাতদিন পরে উহা খালি হইবার কথা। সুতরাং রামবাবু মহারাজকে সমুদায় সংবাদ বিনীতভাবে জানাইয়া বলিলেন, "আর সাতদিন পরেই শশীনিকেতনের ভাড়াটিয়া চলে যাবে। যদি এক সপ্তাহ পরে আপনি যাইবার দিন স্থির করেন তবে সকল প্রকারে সুবিধা হয়।" কিন্তু মহারাজ এই প্রস্তাবে সম্মত হইলেন না। পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট তারিখেই তিনি পুরীধামে যাত্রা করিলেন। সেবারে তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত ডেপুটী অটল মৈত্রী মহাশয়ের সমুদ্রতীরস্থ বাড়ীর বহির্ভাগের কুটীরে (out houseএ) উঠিয়াছিলেন। রামবাবু ইহাতে অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলেন।

যথাসময়ে শশীনিকেতনের ভাড়াটিয়া চলিয়া গেলে রামবাবুর নির্দ্দেশমত তাঁহার পুরী ষ্টেটের ম্যানেজার বরদা চক্রবর্ত্তী মহাশয় মহারাজকে তথায় যাইবার জন্য বারম্বার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। মহারাজ উক্ত কুটীরে আরও কয়েকদিন অবস্থান করিয়া পরে শশীনিকেতনে গমন করিলেন।

উক্ত ডেপুটী বাবু মহারাজের প্রতি দিন দিন বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইলেন। তাঁহার গৃহ হইতে মহারাজ যখন শশীনিকেতনে চলিয়া আসিলেন তখন তিনি দুই বেলা তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতে লাগিলেন। এমন কি কখনও কখনও আদালতের ছুটী হইলে সেই পোষাকেই শশীনিকেতনে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। ইহাতে পুরীর অনেকেই বিস্মিত হইয়াছিলেন। কারণ পূর্ব্বে কখন কোন সজ্জন সঙ্গে ইঁহার কোন প্রকার মেলামেশা ছিল না। মহারাজের পূত সঙ্গলাভ করিয়া তাঁহার অন্তরে ধর্ম্মভাবের উদ্দীপনা হইল। এই সময়ে শ্রীশ্রীদুর্গোৎসব করিতে তাঁহার বলবতী ইচ্ছা হয়। কিন্তু তৎকালে পুরীধামে প্রতিমায় শ্রীশ্রীদুর্গাপূজা সহজসাধ্য ছিল না। মহারাজের অনুমতি ও সহায়তা পাইবার আশায় একদিন প্রসঙ্গক্রমে মহারাজের নিকট তিনি ইহা উত্থাপন করিলেন। মহারাজ তাঁহাকে খুব উৎসাহ দিয়া দুর্গোৎসবের আয়োজনে সর্ব্ব প্রকারেই সহায়তা করিয়াছিলেন। পূজার যাবতীয় অনুষ্ঠান মঠের সাধু-ব্রহ্মচারীদের দ্বারা সম্পন্ন হইল। মহারাজের উপস্থিতিতে গীতবাদ্য, ভজনকীর্ত্তন ও অভিনয়ে মুখরিত হইয়া তাঁহার গৃহে এক অপূর্ব্বভাব ও আনন্দের তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছিল।

মহাষ্টমীর দিন একটী ঘটনায় ডেপুটীবাবু ও তাঁহার পরিবার বিস্মিত হইলেন। উক্ত দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে লাল কস্তাপাড়ের সাড়ী পরিহিতা একটী মহিলা উক্ত বাড়ীর মধ্যে প্রবেশপূর্ব্বক সিঁড়ি দিয়া দ্বিতলে উঠিয়া গেলেন। উক্ত মহিলার পরিচয় লইবার জন্য ডেপুটীবাবুর স্ত্রী পশ্চাদনুগমন করিলেন। কিন্তু উপরে উঠিয়া তিনি দেখিলেন কেহ কোথাও নাই। এই ঘটনাটী মহারাজকে জানাইলে মহারাজ মৃদুহাস্যে ডেপুটীবাবুকে বলিলেন, "মা আপনার পূজা নিয়েছেন।" অতঃপর হিন্দু ধর্ম্ম ও শাস্ত্রাদির প্রতি তাঁহার ভক্তি দিন দিন বর্দ্ধিত হইল। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে বৈশাখ মাসে তিনি তাঁহার পরলোকগতা জননীর পুণ্যস্মৃতির স্মরণে শাস্ত্রানুরাগী হিন্দু পাঠকদের নিত্যপাঠের জন্য ৩২ খানি উপনিষদ্, গীতা ও চণ্ডীর মূল শ্লোকগুলি একত্রে মুদ্রিত করিয়া "শ্রুতিসার সংগ্রহ" নামক একটী পুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করেন।

বিহারীলাল সরকার মহাশয় তৎকালে পুরীধামে মুন্সেফ ছিলেন। তিনি মহারাজের প্রতি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইলেন। অবসর পাইলেই তিনি মহারাজের নিকট আসিয়া নানা সদুপদেশ শ্রবণ করিতেন এবং তাঁহার পবিত্র সংস্পর্শে দিন দিন ঠাকুর ও স্বামিজীর প্রতি তাঁহার অনুরাগ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। মঠ ও মিশনের সাধু-ব্রহ্মচারীদের তিনি আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি করিতেন। কার্য্যকুশলতা গুণে পরে তিনি জজপদে আরূঢ় হইলেও মহারাজের স্মৃতি অনুক্ষণ স্মরণ করিয়া আনন্দ লাভ করিতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সন্তানদের পূতসঙ্গ লাভ করিবার জন্য তিনি মঠ ও কাশী প্রভৃতি তীর্থস্থানে কখনও

কখনও যাইতেন এবং জিজ্ঞাসুরূপে পত্রের দ্বারা ধর্ম্ম ও দার্শনিক তত্ত্বের মীমাংসা বা সিদ্ধান্ত তাঁহাদের নিকট জানিয়া লইতেন। তিনি সহজ সরল সাধারণের বোধগম্য ভাষায় গীতা, ব্রহ্মসূত্র, সাংখ্যদর্শন, তন্ত্র, ভাগবত প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত অনুবাদ ও মর্ম্ম ব্যাখ্যাসহ মুদ্রিত করিয়া প্রচার করেন।

১৯১০খৃষ্টাব্দের প্রায় মধ্যভাগে মহারাজ পুরী হইতে বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসিলেন। এই সময়ে বেলুড় মঠের প্রাঙ্গণে হারমোনিয়ামাদি বাদ্য সহ সাধু-ব্রহ্মচারিগণ সুরতানলয় সংযোগে রামনাম সংকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। অনেক ভক্ত দর্শনার্থী নরনারী মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় পরমানন্দে এই নূতন কীর্ত্তন গান শুনিয়াছিলেন।

নারদসূত্রে উল্লিখিত আছে "সংকীর্ত্তমানঃ শীঘ্রমাবির্ভবত্যনুভাবয়তি ভক্তান্।" অর্থাৎ যেখানে তাঁহার নামসংকীর্ত্তন হয় সেখানে ভগবানের শীঘ্র আবির্ভাব হয় ইহা ভক্তদিগকে তিনি অনুভব করাইয়া থাকেন। সেদিন মঠের প্রাঙ্গণে মহারাজ প্রভৃতির বিদ্যমানে বৈরাগ্যবান শুদ্ধসত্ত্ব সাধু-ব্রহ্মচারীদের ভক্তিরসাপ্লুতস্বরে রামনাম কীর্ত্তন গীত হইলে অপূর্ব্ব ভাবমাধুর্য্যের স্রোত প্রবাহিত হইয়াছিল। বেলুড়মঠে এই রামনামসংকীর্ত্তন শুনিয়া সহস্র সহস্র ভক্ত নরনারী ইহা শিখিবার জন্য ব্যাকুল হইল।

মহারাজ কিছুদিন পরে সেবাশ্রমের নবনির্ম্মিত গৃহদ্বার উন্মোচন করিবার জন্য কাশীধামে যাত্রা করিলেন।

সেবাশ্রমের নূতন গৃহে কয়েকদিন বাস করিয়া মহারাজ পুনরায় বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসিলেন এবং রথযাত্রার পূর্ব্বেই

পুরীধামে গমন করিলেন। এই সময়ে ভুবনেশ্বরে ভীষণ অগ্নিদাহে বহু গৃহ ভস্মীভূত হয় এবং মিশনের সাধু-ব্রহ্মচারীরা তথায় গিয়া নিরাশ্রয় গৃহহীন আবালবৃদ্ধবনিতাকে সাহায্য দান এবং গৃহনির্ম্মাণে সহায়তা করেন। এইবার মহারাজ অধিকাংশ সময়ে কোঠারে ও ভদ্রকে ছিলেন।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসের প্রারম্ভে মহারাজ কোঠার হইতে বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসিলেন। ইহার কয়েক দিন পূর্ব্বে তুরীয়ানন্দকে সঙ্গে করিয়া প্রেমানন্দ কনখল হইতে বেলুড় মঠে প্রত্যাগত হন। বহুদিন পরে তুরীয়ানন্দকে দেখিয়া মহারাজ অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। স্বামিজীর মহাসমাধির পর তিনি তপস্তায় চলিয়া যান, ইহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। আজ সুদীর্ঘ আট বৎসর পরে তুরীয়ানন্দ বেলুড় মঠে আসিয়াছেন, ইহাতে তাঁহার গুরুভ্রাতাদের আনন্দের আর সীমা ছিল না। রথযাত্রার কয়েক দিন পূর্ব্বে মহারাজ পুনরায় নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে রামকৃষ্ণবাবু চক্রতীর্থের জমিগুলি বিলি করিবার জন্য মাপ করাইতেছিলেন। পুরীধামে মহারাজের একটী স্থায়ী মঠ স্থাপন করিবার ঐকান্তিক ইচ্ছা জানিয়া রামবাবু এই সময়ে সমুদ্রতীরে মঠনির্ম্মাণের জন্য সর্ব্বপ্রথম একখণ্ড সুপ্রশস্ত জমি দান করিলেন। এই জমিতেই পরে বর্ত্তমান রামকৃষ্ণ মঠ ১৯৩২ খৃষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছে।

১৯১২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯১৪খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত অধিকাংশ সময় মহারাজ কনখল, কাশীধাম ও বেলুড় মঠে অতিবাহিত করিয়া

১৯১৫ খৃষ্টাব্দে পুরীধামে গমন করেন। তৎকালে স্বামী তুরীয়ানন্দ পুরীধামে আসিয়া কিছুদিন মহারাজের নিকট অবস্থান করিয়াছিলেন। তিনি মঠের সাধু-ব্রহ্মচারী ও কোন কোন ভক্তকে মহারাজের পবিত্র সঙ্গলাভ করিবার জন্য উৎসাহিত করিতেন। তিনি জনৈক ভক্তকে লিখিয়াছিলেন, "মহারাজের সঙ্গ দুর্লভ ও অমোঘ।"

একদিন পুরীর মুন্সেফ বিহারীলাল সরকার মহাশয় ও সাধু-ভক্তেরা শশীনিকেতনের বারান্দায় মহারাজের সম্মুখে বসিয়া আছেন এমন সময়ে হঠাৎ একটী মনোরম সুগন্ধ পাওয়া গেল। তখন নিকটে কোন ফুল বা হাওয়ার জোর ছিল না। মহারাজ বিহারী বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "একটা সুগন্ধ পাচ্ছেন?" উপস্থিত সকলেই উক্ত ঘ্রাণ পাইতেছিলেন। বিহারী বাবু তাঁহাকে বলিলেন, "হাঁ—কিন্তু কিসের গন্ধ তা বুঝতে পারছি না।" মহারাজ বলিলেন, "যখন দেবতারা শূন্য পথে যাতায়াত করেন তখন এইরূপ সুগন্ধে দিক আমোদিত হয়।"

মহারাজ যখন পুরীধামে আসিতেন তখন তথাকার সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ, সরকারী রাজপুরুষেরা, তরুণ সম্প্রদায় এবং সকল অবস্থার বহু নরনারী তাঁহার নিকট যাতায়াত করিতেন। তাঁহারা কেহ শুধুমুখে ফিরিতেন না; তাঁহাকে দর্শন করিয়া, তাঁহার সদুপদেশ শুনিয়া, তাঁহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা ও হাস্য কৌতুকে সময় কাটাইয়া, সুস্বাদু ফল ও মিষ্টান্ন দ্বারা উদর পূর্ত্তি করিয়া গৃহে ফিরিয়া যাইতেন। ভারতের নানাস্থান হইতে ভক্তেরা

নানাবিধ ফল ও মিষ্ট দ্রব্য পাঠাইত, মহারাজ ভক্তদের কাহারও কাহারও ঘরে তাহার কতকাংশ পাঠাইয়া দিতেন; মাঝে মাঝে প্রচুর মহাপ্রসাদ আনাইয়া সকলকে আহার করাইতেন। পুরীতে এখনও কেহ কেহ জীবিত আছেন, যাঁহারা তাঁহার এই সব প্রসঙ্গের কথা উল্লেখ করিয়া বলেন, "মহারাজ কত ভালবাসতেন। আমরা এখানে অনেক রকম মানুষ দেখেছি, কিন্তু এমনটী আর দেখি নি। তিনি যেন কত আপনার লোক ছিলেন।" তাঁহারা তাঁহার সদানন্দ ভাব এখনও মাঝে মাঝে স্মরণ করিয়া থাকেন।

একদিন জনৈক জিজ্ঞাসু ভদ্রলোক তাঁহার নিকট ধর্ম্মপ্রসঙ্গ শুনিয়া আক্ষেপ করিয়া বলেন, "নাতিটার জন্য আমার ধর্ম্মকর্ম্ম সব লোপ পেয়েছে, তার মায়াতে আমি দিন দিন জড়িয়ে পড়ছি।" মহারাজ ইহা শুনিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "তাকে ভাববেন যে গোপালরূপে ভগবান এসেছেন। গোপালভাবে তার যত্ন সেবা সব করবেন, ভাববেন গোপালের সেবা করে আমি ধন্য হচ্ছি। এসব ভাব থেকে নাতির সেবা করলে আর মায়ায় বদ্ধ হবার ভয় থাকবে না। সংসারে যেটা 'আমি আমার' বোধ থেকে বদ্ধ করে, সেটাই 'তিনি তাঁর' বোধ থেকে মুক্তির উপায়।"

অপর একদিন কোন ভদ্রলোক মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, কেমন করে মনকে দমন করা যায়?" মহারাজ তাঁহার প্রশ্ন শুনিয়া বলিলেন, "মনকে ধীরে ধীরে অভ্যাস দ্বারা ভগবানের দিকে একাগ্র করতে হয়। মনের উপর তীক্ষ্ম দৃষ্টি রাখতে হয় যাতে বাজে চিন্তা বা কুচিন্তা না আসে। যখনই মনে

অন্য কোন চিন্তা আসবে তখনই মনকে ভগবানের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে ব্যাকুলভাবে প্রার্থনা করতে করতে মনের দমন হয়। ঠাকুর বলতেন, "এসবেও না হলে যাতনা ভোগ করে করে শেষে মনের দমন হয় ও সং দিকে যায়।"

একদিন মহারাজ শ্রীমন্দিরের মণিকোঠায় প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে শ্রীজগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামের পরিবর্ত্তে একটী রাখাল বালক দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি তন্ময় হইয়া দর্শন করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্দিরে দর্শন করিতে গিয়া এক এক দিন এক এক ভাবে তিনি বিভোর হইয়া পড়িতেন এবং আনন্দোদ্ভাসিত বদনে হাত মুখ নাড়িয়া মাঝে মাঝে যেন কাহার সহিত কত কথা বলিতেন। মহারাজের দিব্যসঙ্গ করিবার যাঁহারা সৌভাগ্য লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারা ইহা অনেক সময়ে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।

পুরীতে একদিন ফলহারিণী পূজার রাত্রে শ্রীশ্রীমহামায়ীর পূজা হইল। সকল কর্ম্মসূচনার প্রারম্ভে তিনি ঠাকুরের ইঙ্গিত পাইতেন। তাই তিনি বলিতেন, "তাঁর ইঙ্গিত ভিন্ন আমার কিছু করবার জো নাই।"

স্নানযাত্রায় তিনি স্নানদর্শনান্তে স্নানমঞ্চে গিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামকে স্পর্শন ও আলিঙ্গন করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া যাইতেন। নবযৌবনের দিবস প্রাতে সাধু-ভক্তদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া তন্ময়ভাবে শ্রীবিগ্রহ দর্শন স্পর্শন করিয়া বালকের ন্যায় আনন্দে মাতিয়া উঠিতেন। শরীর যাহাতে বেশ স্বচ্ছন্দ থাকে সেজন্য তিনি রথযাত্রাদিবসে সকলকে অন্নাহার

করিতে নিষেধ করিতেন। সামান্য জলযোগ বা ফলাহার করিয়া রথযাত্রা দর্শন করিতে তিনি সকলকে বলিতেন। মহারাজ সাধু-ব্রহ্মচারী ও ভক্তমণ্ডলীসহ জগন্নাথবল্লভ মঠ হইতে রথযাত্রা-দর্শন, রথরজ্জু-স্পর্শ ইত্যাদি করিতেন এবং সঙ্গের সকলেই যাহাতে ইহার সুযোগ পায় তৎপ্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতেন। তিনি গুণ্ডিচার বেদীর উপর শ্রীশ্রীজগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামকে দর্শন করিতে যাইতেন। বিশেষতঃ নবমীর দিন তথায় দর্শন ও প্রসাদধারণের জন্য সকলকে উৎসাহিত করিয়া মহারাজ স্বয়ং সাধু-ব্রহ্মচারী ও ভক্তমণ্ডলীসহ গুণ্ডিচায় বসিয়া পরমানন্দে মহা-প্রসাদ পাইতেন। পুনর্যাত্রায় তিনি রথযাত্রার মত দর্শন ও রজ্জু স্পর্শ করিতেন। বিশেষ পর্ব্বদিনে বা তিথিতে তিনি শ্রীমন্দিরে দর্শন করিতে যাইতেন। পুরীতে অবস্থানকালে তিনি নিত্য প্রাতে শশী-নিকেতনের পশ্চিম পার্শ্ব হইতে খুব নিষ্ঠা ভক্তির সহিত শ্রীমন্দিরের চূড়া দর্শন ও প্রণাম করিতেন। পুরীধামে মহারাজ অহর্নিশ ভাবে তন্ময় হইয়া থাকিতেন। একদিন কোন সন্ন্যাসী তাঁহাকে প্রণাম করিয়া উঠিলে তিনি হাত নাড়িয়া অপূর্ব্ব লাবণ্যসমুজ্জ্বল দৃষ্টিতে তাঁহাকে বালকের মত সরলভাবে বলিলেন, "দেখ, দেখ, সব চৈতন্যময়—সব চৈতন্যময়।"

এই নীলাচলে নবকলেবরের সময়ে নানাস্থান হইতে ভক্তমণ্ডলী তাঁহার নিকটে আসিতেন। তিনি তাঁহাদিগকে বিশেষ যত্ন করিতেন। সর্ব্বদাই তাঁহাদিগকে শ্রীমন্দিরে দর্শন ও জপধ্যান করিতে বলিতেন। কিন্তু তাঁহারা তাঁহার পবিত্র সঙ্গলাভ

করিতেই ভালবাসিতেন। তাঁহার গুরুভ্রাতারা অনেকেই তাঁহার নিকট আসিয়া মাঝে মাঝে থাকিতেন। কখন কখন তাঁহারা অনেকে কার্য্যোপলক্ষেও একসঙ্গে মিলিত হইতেন। সে সময়ে এক অপূর্ব্ব ভাবের উদয় হইত এবং সকলে পরমানন্দে দিন অতিবাহিত করিতেন।

১৯১৫ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে মহারাজ বেলুড় মঠে প্রত্যাগমন করিয়া পূর্ব্ববঙ্গ ও দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ করেন। পরে ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের মে মাসে পুনরায় পুরীতে আসিলেন।

জুনমাসের প্রথম ভাগে স্বামী তুরীয়ানন্দ পুরীধামে মহারাজের নিকট আসিয়াছিলেন। তাঁহার আসিবার পরদিনই শ্রীশ্রীজগন্নাথের স্নানযাত্রা। তুরীয়ানন্দ ও অন্যান্য সাধু-ব্রহ্মচারী এবং ভক্তদিগকে সঙ্গে লইয়া মহারাজ মঙ্গু মঠের উপরতলা হইতে বিগ্রহস্নান দর্শন করিলেন। পরে তাঁহারা স্নানমঞ্চে গিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলরামকে পরমানন্দে স্পর্শ ও আলিঙ্গন করিয়াছিলেন। কয়েকদিন পরে তিনি তুরীয়ানন্দকে সঙ্গে লইয়া পুঁটীয়া মহারাণীর নবনির্ম্মিত মন্দিরে শ্রীবিগ্রহ দর্শন করিতে যান। কাশীধামের মন্দিরাদির ন্যায় উহার কারুকার্য্য দেখিয়া তিনি প্রশংসা করেন।

বহুমূত্রের পীড়ায় তুরীয়ানন্দের স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। একদিন সমুদ্রস্নান করিয়া ফিরিবার পর কাণের যন্ত্রণায় অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। পরে রোগ ক্রমশঃ কঠিন আকার ধারণ করে। মহারাজ তাঁহার রীতিমত চিকিৎসা ও শুশ্রূষার জন্য বড় উদ্বিগ্ন হইলেন। সারদানন্দ

সংবাদ পাইয়া পুরীতে চলিয়া আসিলেন। ভাগ্যক্রমে তখন খ্যাতনামা ডাক্তার এস, বি, মিত্র পুরীধামে ছিলেন। তাঁহার একান্ত যত্নে ও কয়েকটী অস্ত্রোপচারের পর পীড়ার বেগ প্রশমিত হইল। ২০ই নভেম্বর ডাক্তারের সঙ্গেই মহারাজ ও সারদানন্দ তুরীয়ানন্দকে লইয়া কলিকাতায় উদ্বোধন কার্য্যালয়ে উঠিলেন। শ্রীশ্রীমা তখন জয়রামবাটীতে ছিলেন। বলরাম মন্দিরে প্রেমানন্দ দারুণ কালাজ্বরে মুমূর্ষু অবস্থায় শয্যাশায়ী থাকায় রুগ্ন তুরীয়ানন্দকে তথায় রাখিয়া চিকিৎসা করা সম্ভব ছিল না।

এইবার নীলাচলে অবস্থানকালে মহারাজ ভুবনেশ্বর মঠ নির্ম্মাণের সকল ব্যবস্থা করেন। ভুবনেশ্বর মঠ নির্ম্মাণের একটু ইতিহাস আছে। ইতিপূর্ব্বে মহারাজ তিন রাত্রি ভুবনেশ্বরের মন্দিরের বাংলায় বাস করিয়াছিলেন। সেই সময় তথাকার স্বাস্থ্যকর জলবায়ু এবং ক্ষেত্রমাহাত্ম্য অনুভব করিয়া তথায় একটী মঠ-প্রতিষ্ঠার সংকল্প করেন। কথাপ্রসঙ্গে একদিন তিনি বলেন, "ভুবনেশ্বরে শেষ রাত্রে উঠে দেখি বহু পূর্ব্বে জোয়ান বয়সে শরীর মন যেমন স্বচ্ছন্দ থাকত সেখানেও ঠিক তেমন।" ভুবনেশ্বরে মঠনির্ম্মাণের বিশেষ ইচ্ছা থাকায় পরে জায়গা দেখিবার জন্য কোন সেবককে তথায় পাঠাইলেন। জমি নির্ব্বাচন করিয়া সেবক তাঁহাকে তথায় লইয়া গেলেন। উক্ত জমিতে একটী সুবৃহৎ আম্রকানন দেখিয়াই ঐ স্থানটী তিনি পছন্দ করিলেন এবং পুরীতে প্রত্যাগত হইয়া জমিটী লইবার ব্যবস্থা করিতে আদেশ দিলেন। উক্ত জমি

খুরদা খাসমহলের অন্তর্ভুক্ত। উহার সম্মুখস্থ রাস্তার ধার পর্য্যন্ত পরে জমি বন্দোবস্ত করিয়া লওয়া হয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই মঠনির্ম্মাণের কার্য্য আরম্ভ হইল।

১৯১৯ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীদুর্গাপূজার সময় সংবাদ আসিল ভুবনেশ্বরে মঠনির্ম্মাণ কার্য্য শেষ হইয়াছে, শুধু শুভদিন দেখিয়া প্রবেশ করিলেই হয়। ৩১শে অক্টোবর মহারাজ ভুবনেশ্বরের নব-নির্ম্মিত মঠের দ্বার উদ্‌ঘাটন করিয়া সাধু-ব্রহ্মচারীদের সহিত সানন্দে তথায় বাস করিতে লাগিলেন। ভক্তেরাও পরে একে একে নানাস্থান হইতে তথায় আসিলেন।

এই সময়ে ভুবনেশ্বরে দুর্ভিক্ষের বিশেষ প্রকোপ হওয়ায় মহারাজ তথায় একটী সাহায্যকেন্দ্র খুলিয়া দিলেন এবং তাঁহার শিষ্যসেবকেরা তাহার পরিচালনায় নিযুক্ত হইলেন। ভুবনেশ্বরে চিকিৎসা ও ঔষধের অভাবে তথাকার অধিবাসীরা অত্যন্ত ক্লেশ পাইত এবং সুচিকিৎসা ও ঔষধের অভাবে অনেকে অকালে মৃত্যুমুখে পতিত হইত। ইহা দেখিয়া মহারাজ রাস্তার সম্মুখে মঠের জমিতে একটী দাতব্য ঔষধালয় (Charitable Dispensary) প্রতিষ্ঠা করিয়া দিলেন। ইহাতে ভুবনেশ্বর ও তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ গ্রামসমূহের রোগক্লিষ্ট অধিবাসীরা এবং তীর্থযাত্রিগণ অশেষ সাহায্যলাভ করিতে লাগিল। লোকের দুঃখদুর্দ্দশা মোচন করিতে তিনি শুধু আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া ক্ষান্ত থাকিতেন না পরন্তু সন্ধান লইয়া দুর্দ্দশার মূল কারণ জ্ঞাত হইয়া তাহা দূর করিতে চেষ্টা করিতেন।

ভুবনেশ্বরের আধ্যাত্মিক মহিমা সম্বন্ধে মহারাজ বলিতেন, "এ

স্থানটি যোগভূমি আর পুরী ভোগভূমি। ভুবনেশ্বর শিবক্ষেত্র, গুপ্ত কাশী বলে জানবে। এখানে একটু সাধনভজন করলে অনেক ফল পাওয়া যায়; সাধনভজনের বিশেষ অনুকূল স্থান—ধ্যান সহজেই জমে। এমন স্বাস্থ্যকর স্থান—ছেলেরা অন্য জায়গায় খেটেখুটে আসবে, এখানে তাদের স্বাস্থ্য ভাল হবে আর সাধনভজনে লেগে যাবে।" গৃহস্থ ভক্তদের তিনি মঠের আশেপাশে ছোট ছোট বাড়ী নির্ম্মাণ করিতে পরামর্শ দিতেন। তিনি তাহাদিগকে বলিতেন, "সংসার থেকে দূরে অথচ কলকাতার কাছে এমন নির্জ্জন পবিত্র স্থানে বাস করে সাধন করবে। তাতে তোমাদের শরীর সুস্থ থাকবে আর অশেষ কল্যাণ হবে।"

বন্য জন্তুর উপদ্রব হইতে রক্ষা করিবার জন্য মঠের বিস্তৃত জমি প্রাচীরবেষ্টিত হইল। সাধু-ব্রহ্মচারী, অতিথি-অভ্যাগত ও ভক্তদের স্থান সংকুলান না হওয়াতে মঠে কয়েকটী নূতন গৃহ নির্ম্মিত হইল। বাহির হইতে মঠের সুবৃহৎ প্রাচীর ও বৃহৎ ফটক দেখিলে ইহা কোনও রাজপ্রাসাদ বলিয়া বোধ হয়। একদিন তিনি জনৈক ভক্তসহ মঠের চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইয়া দেখিতেছিলেন; ভক্তটী বিস্ময়োৎফুল্লনেত্রে মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজ, ভবিষ্যতে বোধ হয় এখানে বিরাট ব্যাপার হইবে, তাই বুঝি এই আয়োজন?" মহারাজ তাহার কথা শুনিয়া আনন্দে ঈষৎ হাস্য করিলেন।

ভুবনেশ্বরে কঙ্কর ও প্রস্তর মিশ্রিত রক্তবর্ণ মৃত্তিকায় মহারাজ নানা ফলফুল বৃক্ষলতা বিভিন্ন দেশ হইতে আনাইয়া রোপণ

করাইলেন। আশ্রমে গাছপালার প্রতি যত্ন লইতে যদি কাহাকেও দেখিতেন তবে তিনি বিশেষ আনন্দিত হইতেন। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, অল্প দিনের মধ্যেই ফলফুলে ও বৃক্ষলতার শ্যামলসৌন্দর্য্যে ভুবনেশ্বর মঠ সুশোভিত হইল এবং প্রশান্ত পবিত্র আধ্যাত্মিক হাওয়ায় পূর্ণ হইয়া উঠিল। উক্ত মঠে সকলেই তাঁহার উপদেশানুযায়ী সাধনভজন করিয়া অপূর্ব্ব আনন্দ এবং শান্তি অনুভব করিতে লাগিল।

তিনি প্রত্যহ সাধু-ব্রহ্মচারী এবং ভক্তবৃন্দকে লইয়া নানাবিধ উপদেশ, সদালোচনা ও ভজন-কীর্ত্তনে দিন কাটাইতে লাগিলেন। একদিন জনৈক সাধু প্রণামান্তে আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া বলেন, "আশীর্ব্বাদ করুন যাতে ঠাকুরের পাদপদ্মে ভক্তি হয়।" তিনি ঈষৎ স্থির ও গম্ভীর হইয়া বলিলেন, "দেখ, নিরালম্ব দীন হীন কাঙ্গাল হতে পারলে তবে একটু ভক্তি আসে।" ধ্যানজপ সম্বন্ধে অনেক কথা বলার পর একদিন তাহাকে বলিলেন, "খুব জপ করবে, মনে মনে সব সময়ে শ্বাস-প্রশ্বাসে জপ অভ্যাস করবে। এটা ক্রমশঃ অভ্যাস হলে জপ সহজভাবে চলতে থাকে। এমন কি ঘুমের পূর্ব্বে ও পরে সেই জপই চলে। একটা ছেলে যদি ধ্যান-জপ ঠিক ঠিক করে তো তার পুণ্যে একটা মঠ চলে যায়।" হিমালয়স্থ মায়াবতী আশ্রমে জনৈক সেবকের যাইবার কথা স্থির হওয়ায় তিনি তাঁহাকে বলেন, "হিমালয়ের মত উচ্চ সুরে মনটাকে বেঁধে রাখবে।"

১৯২০ খৃঃ ভুবনেশ্বর মঠে অতি সমারোহে শ্রীশ্রীকালীপূজা সম্পন্ন হইয়াছিল। মহারাজের নির্দ্দেশ মত প্রতিমা কটকে তৈয়ার

হয়। নাটুবাবু নামক জনৈক নিপুণ শিল্পী উহা গড়িয়াছিলেন। মহারাজ প্রতিমা দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বলিয়াছিলেন, "ঠিক যেন দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণীর মত প্রতিমা হইয়াছে।" তজ্জন্য নাটুবাবুকে মহারাজ আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন।

সঙ্ঘের সাধু-ব্রহ্মচারীরা জনহিতকর কার্য্য ও তপস্যা করিতে গিয়া প্রায়ই স্বাস্থ্যভঙ্গ করিয়া মঠে ফিরিয়া আসে। তাহারা ভুবনেশ্বরের মত স্বাস্থ্যকর স্থানে আসিয়া সুস্থ হইয়া কিছুদিন সাধন-ভজন করিতে পারে এবং গৃহস্থ ভক্তগণ আশ্রমের চারিপাশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বাংলা নির্ম্মাণ করিয়া সাধনভজনে নিরত থাকে—ইহাই দেখিতে মহারাজের সাধ ছিল। তিনি কখনও কখনও বলিতেন, "সাধু-ব্রহ্মচারীরা এখানে বসে খুব সাধন-ভজন করবে আর আমি দেখে খুব আনন্দ করব।" মহারাজ ভুবনেশ্বরে অধিকাংশ সময়ে বালকবৎ, আবার কখন গম্ভীর অথচ সদানন্দভাবে থাকিতেন। স্বামী সারদানন্দ বলিতেন, "আমাদের মধ্যে একমাত্র মহারাজের ভিতরেই ঠাকুরের পরমহংস অবস্থার হাবভাব, চালচলন দেখতে পাওয়া যায়। মহারাজকে পিছন দিক থেকে দেখলে ঠাকুর বলেই মনে হত।"

ভুবনেশ্বরের উন্মুক্ত দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরে বেড়াইতে বেড়াইতে মহারাজ আত্মভাবে বিহ্বল হইয়া কোন কোন দিন নির্জ্জন অরণ্যের ভিতরেও চলিয়া যাইতেন। কখনও একা, আবার কখনও কাহাকেও তাঁহার অনুগমন করিতে বলিতেন। তিনি কাহাকেও বলিতেন, "এই সব খোলা মাঠ দেখলে মনটা আপনা আপনি উদার ও মহৎ হয়, তাঁর চিন্তা আসে।" ভুবনেশ্বরে

পাণ্ডা ও দরিদ্র অধিবাসীদিগকে মহারাজ মাঝে মাঝে পরিতোষ সহকারে খাওয়াইতেন ; কাহাকেও বস্ত্র, কাহাকেও শীতের আলোয়ান, কাহাকেও অর্থ সাহায্যও করিতেন। প্রেম ও কৃপা তাঁহার প্রকৃতিসিদ্ধ ছিল।

ভুবনেশ্বর মঠে অবস্থানকালে ১৯২০ খৃষ্টাব্দে এপ্রিল মাসে স্বামী অদ্ভুতানন্দের দেহত্যাগের সংবাদ শুনিয়া মহারাজ অত্যন্ত বিষণ্ণ হইয়াছিলেন। ইহার অব্যবহিত পরে মে মাসে পরম অনুগত ভক্ত রামবাবুর পীড়ার সংবাদ পাইয়া তিনি উদ্বিগ্ন হইলেন। তিনি মঠের সাধু-ব্রহ্মচারীদিগকে ঠাকুরের নিকট প্রত্যহ তাঁহার আরোগ্যলাভের জন্য প্রার্থনা করিতে বলিতেন। রামবাবুর অকালমৃত্যু-সংবাদে তিনি গভীর বিষাদসাগরে মগ্ন হইয়া কয়েকদিন মৌন ও স্তব্ধভাবে কাটাইয়াছিলেন।

১৯২০ খৃষ্টাব্দে ২১শে জুলাই রাত্রি প্রায় ১টার সময় জনৈক সেবক মহারাজের ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে তিনি একটি আলোয়ানে শরীর আবৃত করিয়া ইজিচেয়ারে গম্ভীরভাবে বসিয়া আছেন। সেবক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল তাঁহার জন্য হাত মুখ ধুইবার জল বা তামাক সাজিয়া আনিবে কিনা, কিন্তু মহারাজ কোন উত্তর না দিয়া সেই ভাবেই বসিয়া রহিলেন। তাঁহার ভাব দেখিয়া সেবক আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে সাহসী হইল না। রাত্রি প্রভাত হইলে মহারাজ অন্যদিনের মত বেড়াইতে না গিয়া সম্মুখের বারাণ্ডায় পায়চারি করিতে লাগিলেন। পরে তারে সংবাদ আসিল পূর্ব্ব রাত্রি ১টা ৩০মিঃ সময়ে শ্রীশ্রীমা মহাপ্রয়াণ করিয়াছেন। মহারাজের স্নিগ্ধ মুখমণ্ডল শোকাচ্ছন্ন

হইল। তিন দিন তিনি কাহারও সহিত কথা বলেন নাই এবং যথারীতি দ্বাদশদিন নগ্নপদে বিচরণ ও হবিষ্যান্ন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজ হইতে প্রত্যাগত হইয়া মহারাজ ভুবনেশ্বরে অধিককাল বাস করিতে পারিলেন না। স্বামী সারদানন্দ ভুবনেশ্বরে আসিয়া কার্য্যবশতঃ তাঁহাকে কাশীধামে যাইবার জন্য বারংবার অনুরোধ করিতে লাগিলেন। অগত্যা ১৯২২খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসের প্রথম ভাগেই তিনি বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসিলেন।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

বেলুড় মঠে

মহারাজ যখন অন্যান্য স্থান হইতে বেলুড় মঠে প্রত্যাগত হইতেন, তখন যেন নিত্য উৎসব লাগিয়া থাকিত। কত বিভিন্ন প্রদেশের নরনারী, কলিকাতা হইতে ভক্তমণ্ডলী, বিশিষ্ট ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিগণ ও স্কুল-কলেজের ছাত্রের দল প্রায়ই তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিত। মহারাজও ইহাদের দেখিয়া কত আনন্দ করিতেন। মহারাজ আগমন করিলে চতুর্দ্দিকে একটা আনন্দের সাড়া পড়িত।

বেলুড় মঠের প্রত্যেক স্থানেই তাঁহার পুণ্যস্মৃতি নানাভাবে বিজড়িত হইয়া রহিয়াছে। বৃক্ষলতা, ফলফুল, বাগান এবং মঠের ঠাকুরঘর, গৃহদ্বার সর্ব্বত্র তাঁহার পূতস্পর্শের স্মৃতি জাগরূক রহিয়াছে। মহারাজ মঠে আসিয়া প্রত্যেক স্থানে গিয়া প্রত্যেক দ্রব্যের, প্রত্যেক ফলফুল-তরকারির এবং বৃক্ষলতার সংবাদ লইতেন ও তত্ত্বাবধান করিতেন; গৃহাদির অবস্থা তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতেন, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ত্রুটী দেখিলে তাহার দিকে সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিতেন এবং মঠের সাধু-ব্রহ্মচারীদের কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্বন্ধে জ্ঞাত হইতেন। তাঁহার আগমনে এবং অবস্থানে মঠ যেন আধ্যাত্মিক রসে প্রাণবন্ত হইয়া উঠিত, সর্ব্বত্র যেন সজীবতার চাঞ্চল্য প্রকাশ পাইত।

মহারাজকে দর্শন করিলে তাঁহাকে এক প্রবল আধ্যাত্মিক শক্তির আধার এবং অতীন্দ্রিয় অনুভূতির রাজ্যে সতত বিচরণশীল বলিয়া বোধ হইত। কোন্ সময়ে কোন্ ভাবের স্ফুরণ হইবে তাহা বাহিরে দেখিয়া কেহ অনুমান করিতে পারিত না। অনুভূতির বিশালরাজ্য যেন তাঁহার করতলগত, অথচ তাহা যেন স্বাভাবিকভাবেই তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। কথাপ্রসঙ্গে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন, "মন এখন লীলা হইতে নিত্যে এবং নিত্য হইতে লীলায় আসে।" তাঁহাকে দেখিলে মনে হইত তাঁহার দেহ মন যেন কোন অপার্থিব বস্তুতে গঠিত। প্রেম, পবিত্রতা, সরলতা ও সাধু প্রবৃত্তির তিনি ছিলেন মূর্ত্তিমান বিগ্রহ। মহারাজের মুখমণ্ডল প্রায়ই ভাবজ্যোতিতে পরিপূর্ণ থাকিত, সর্ব্বদাই আনন্দময়, কখনও বালকের মত হাস্যকৌতুক ও ক্রীড়ারঙ্গে মত্ত আবার কখনও নৃত্যবাদ্যে উৎফুল্ল। তাঁহার একদিকে সহজ বালস্বভাব, অপরদিকে অপূর্ব্ব গম্ভীরভাব। তিনি যখন নিজের ভাবে মত্ত থাকিয়া ভাবগম্ভীর অবস্থায় বসিয়া থাকিতেন, তখন তাঁহার নিকট কেহ অগ্রসর হইতে সাহস পাইত না এবং কেহ কোন প্রশ্ন করিতে আসিলেও নীরব হইয়া থাকিত; আবার কেহ কিছু বলিতে আসিয়া তাঁহাকে দেখিয়া কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধভাবে বসিয়া বা দাঁড়াইয়া বিনা বাক্যব্যয়ে চলিয়া যাইত। যখন তিনি একাকী মঠের প্রাঙ্গণে বা কোন উন্মুক্ত দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরে গম্ভীরভাবে পাদচারণা করিতেন তখন তাঁহাকে দেখিলে তেজোদীপ্ত নরসিংহের ন্যায় বোধ হইত।

মহারাজ যখন অন্য স্থান হইতে বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসিতেন

তখন পূজাদি বিশেষ কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে শ্রীশ্রীমাকে মঠে আমন্ত্রণ করিয়া যথোচিত ভক্তিসহকারে তাঁহার অর্চনা করিতেন। তখন চারিদিকে আনন্দোৎসব চলিত ও ঠাকুরের ভোগের জন্য বিবিধ আয়োজন হইত। মহারাজ ভাবে তন্ময় হইয়া থাকিতেন। এতদুপলক্ষে কখনও তিনি কালীকীর্ত্তনের সঙ্গে দাঁড়াইয়া মধুর নৃত্য করিতেন, কখনও চামর হাতে আরতির সময় বীজন করিতে করিতে ভাবোন্মত্ত হইয়া পড়িতেন, আবার তিনি বালকের মত সকলের সহিত স্ফূর্ত্তি ও আমোদ করিয়া বেড়াইতেন। মার দর্শনে বা মার আগমনে মহারাজ সহজ ভাবে থাকিতেন না, তখন তিনি ভাবমুখে বালকের ন্যায় হইয়া যাইতেন।

মঠে দুর্গোৎসব বা শ্যামাপূজা প্রভৃতি যতকিছু আনুষ্ঠানিক পূজা সকলই মার নামে সঙ্কল্প হইয়া থাকে। পূজার পূর্ব্বে প্রত্যেক বারে তিনি শ্রীশ্রীমার অনুমতি গ্রহণ করিতেন। একবার ঠাকুরের জন্মতিথি দিবসে মা বেলুড় মঠে আসিবেন বলিয়া ফটক পত্রপুষ্পে সাজান হইয়াছিল এবং তোরণের উপর বাংলা অক্ষরে লেখা ছিল "স্বাগতম্"। ফটক হইতে মঠের প্রাঙ্গণে শ্রীশ্রীমার গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল। প্রাঙ্গণ কিছু কর্দ্দমযুক্ত ছিল বলিয়া মহারাজ সাধু-ব্রহ্মচারীদিগকে উক্ত স্থানে রাঙ্গা সালু বিছাইয়া দিতে বলিলেন। মা তাহার উপর দিয়া চলিয়া আসিয়া মঠে প্রবেশ করিয়া ভিতর প্রাঙ্গণের প্রবেশদ্বারে পৌঁছিলে মহারাজ তথায় গিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন এবং তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া ভিতরে লইয়া আসিলেন। সেবকেরা সেইদিন মহারাজকে রেশমী কাপড় পরাইয়া দিয়াছিল। সেই সময় মহারাজের মুখ চোখ

দেখিয়া বোধ হইতেছিল যেন বালক তাহার মাকে পাইয়া পরম আনন্দে ভাসিতেছে। মা যখন ঠাকুরঘরে যাইবার জন্য সিঁড়ির উপরে উঠিতেছিলেন, তখন তাহার চাতালে ঠাকুরের পূজক আত্মানন্দ (শুকুল মহারাজ) মাকে কর্পূর আরতি করিলেন। ঠাকুরঘরের ভিতরে গিয়া মা ঠাকুরকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া নিস্তব্ধভাবে কিয়ৎক্ষণ বসিয়া রহিলেন। পরে শয়ন-ঘরে ধ্যানস্তিমিতভাবে কিছুক্ষণ থাকিয়া মা ঠাকুরঘরের সম্মুখস্থ ছাদের উপর দিয়া মঠগৃহের দ্বিতলে পশ্চিম দিকের ঘরে গিয়া আসন পরিগ্রহ করিলেন।

সেদিন বেলা সাড়ে এগারটার সময় মঠপ্রাঙ্গণে আন্দুলের কালীকীর্ত্তন আরম্ভ হইল। মা দোতলার উপর হইতে ঘরের খড়খড়ি তুলিয়া কীর্ত্তন গান শুনিতেছিলেন এবং উৎসবের দৃশ্য সব দেখিতেছিলেন। কিছুক্ষণ কীর্ত্তন চলিলে প্রেমানন্দ মহারাজকে আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ করিয়া ধীরে ধীরে কীর্ত্তনের আসরে লইয়া গেলেন। গান শুনিয়াই মহারাজ ভাবাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। যখন প্রেমানন্দ তাঁহাকে আসরে লইয়া যান তখন তিনি কোন ওজর আপত্তি করেন নাই, বালকের মত আলিঙ্গন-পাশে আবদ্ধ হইয়াই গেলেন। তথায় আসিয়াই তিনি গানের সঙ্গে মধুর ভাবে অনুপম নৃত্য করিতে আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি গভীর ভাবে এত মগ্ন হইলেন যে, নাচিতে গিয়া ঢলিয়া পড়িতে লাগিলেন। জনৈক শিষ্য তৎক্ষণাৎ ভয়ে পশ্চাৎ হইতে বাহুর আবেষ্টনের মধ্যে মহারাজকে ধরিয়া রাখিলেন, যাহাতে পড়িয়া গিয়া তাঁহার শরীরে আঘাত

না লাগে। কিছু সময় অতীত হইলেও মহারাজের ভাবের কোনও উপশম হইল না। ক্রমশঃ যেন বাহ্যসংজ্ঞা হারাইয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ তালে তালে অপূর্ব্ব নৃত্যের ভঙ্গিমায় দুলিতে লাগিল। মহারাজের ঐরূপ অবস্থা দেখিয়া সারদানন্দ তাঁহাকে আর তথায় না রাখিয়া কীর্ত্তনের আসর হইতে বাহির করিয়া আনিবার ইঙ্গিত করিলেন।

ধীরে ধীরে গানের আসর হইতে মঠের নিম্নতলের দক্ষিণ-পশ্চিমের ঘরে আনিয়া মহারাজকে একটি খাটের উপর বসাইয়া দেওয়া হইল। সেইরূপ ভাবাবস্থায় মহারাজ বহুক্ষণ বসিয়া আছেন শুনিয়া সারদানন্দ সেবকদিগকে তাঁহার সম্মুখে গড়গড়ায় তামাক দিতে বলিলেন। তামাক দেওয়া হইলে সেবকেরা বলিল, "মহারাজ, তামাক দেওয়া হয়েছে।" কিন্তু তিনি পূর্ব্বের মত জড়বৎ বসিয়া আছেন, একটুও নড়িলেন না। তাঁহার চক্ষু তখন অর্দ্ধ-নিমীলিত এবং বদনমণ্ডল দিব্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত। দেখিতে দেখিতে আরও কিছু সময় কাটিয়া গেল, কিন্তু মহারাজের ভাবের উপশম হইল না। প্রেমানন্দ সেবকদের নিকট ইহা শুনিয়া এবং তাঁহাকে দেখিয়া অত্যন্ত চিন্তিত ও ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। বিশেষ মা আসিবেন বলিয়া সেদিন প্রাতঃকাল হইতে মহারাজ বিন্দুমাত্র জল গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার জন্য জলখাবার আনা হইল। উহা সম্মুখে রাখিয়া তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ বলা হইল, কিন্তু তাঁহার কোন হুঁশ নাই। কে যেন কাহাকে বলিতেছে! তাঁহার এইরূপ দীর্ঘকালব্যাপী গভীর ভাবসমাধি দেখিয়া গুরুভ্রাতাগণ সকলেই চিন্তিত হইলেন।

অবশেষে মাকে সমুদায় সংবাদ জানান হইল। মা এই কথা শুনিয়া পরমানন্দে বলিয়া উঠিলেন, "ওজন্য কোন চিন্তা নাই।" কিছুপরে মা নিজে কিছু মিষ্টান্নাদি প্রসাদ করিয়া মহারাজের জন্য পাঠাইয়া দিলেন। মহারাজের সম্মুখে সেই প্রসাদ রাখা হইল। গুরুভ্রাতারা উচ্চৈঃস্বরে তাঁহাকে জানাইলেন, "মা তোমার জন্য প্রসাদ পাঠিয়ে দিয়েছেন, মহারাজ!" কিন্তু মহারাজ পূর্ব্ববৎ নিশ্চল জড়ের ন্যায় বসিয়া আছেন। কে কি বলিতেছে, কে বা কাহারা তাঁহাকে ডাকিতেছে সে বিষয়ে তাঁহার কোনও সংজ্ঞা নাই। মহারাজের এইরূপ অবস্থা দেখিয়া মঠের সকলেই অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া মাকে পুনরায় জানাইলেন।

মা স্থিরভাবে সব শুনিলেন। পরে তিনি ধীরে ধীরে ঘর হইতে বাহির হইয়া মঠের ভিতরকার সিঁড়ি দিয়া নীচে যে ঘরে মহারাজ বসিয়াছিলেন তথায় উপস্থিত হইলেন। পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ধীরে ধীরে মা তাঁহার ডান হাতটী প্রসারিত করিয়া মহারাজের দক্ষিণ বাহুমূল স্পর্শ করত স্নেহ ভরে ডাকিয়া বলিলেন, "ও রাখাল, প্রসাদ দিয়েছি, খাও।" সুপ্তোত্থিতের মত মহারাজের যেন হঠাৎ চমক ভাঙ্গিল। তিনি চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেন —মা স্বয়ং তাঁহার হস্ত স্পর্শ করিয়া অতি স্নেহকোমল কণ্ঠে ডাকিতেছেন। আনন্দে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইল। তিনি উঠিয়া অমনি মার পাদবন্দনা করিলেন। মা চলিয়া গেলে পর সেই প্রসাদ ধারণ করিয়া তিনি সহজভাবে পরমানন্দে ভাসিতে লাগিলেন।

গিরিশবাবু মহারাজের আধ্যাত্মিক শক্তিপ্রসঙ্গে বলিতেন,

"রাখাল-টাখাল আমার কাছে ছেলেমানুষ, কালকের ছোকরা। ঠাকুরের কাছে আমি যখন যেতাম, তখন আর ওদের বয়স কত? এই রাখালকে আমি ঠাকুরের মানস পুত্র বলে মানি। তা কি শুধু শুধুই মানি? যখন আমার প্রথম হাঁপানী আরম্ভ হল, তখন খুব জ্বর, খুব দুর্ব্বল হয়ে পড়লুম। এখানে তো শান্তি-স্বস্ত্যয়ন, চণ্ডীপাঠ, গীতাপাঠ হচ্ছে। এদিকে আমার মনে এক সর্ব্বনেশে ভাবের উদয় হল—ঠাকুর একজন মানুষ, একজন সাধুপুরুষ ছিলেন। তখনি মনে হল—গুরুতে মানুষজ্ঞান, মানুষবুদ্ধি, আমি বেটা তো গেছি। মনে দারুণ অশান্তি, কিছুতেই ঠাকুরের উপর ভগবদ্‌বুদ্ধি এল না। অনেককে বললাম, যেসব ত্যাগী গুরু-ভাইরা আমাকে দেখতে আসত, সবাইকে বলতাম। কিন্তু সবাই শুনে চুপ করে থাকত। আমার মনে দিন দিন দারুণ অশান্তি বৃদ্ধি পেতে লাগল। মনের সঙ্গে সর্ব্বদা লড়াই করছি, তবু ঠাকুরের উপর মানুষ-বুদ্ধি যায় না। এই সময় হঠাৎ একদিন রাখাল দেখতে এল। সামনে বসে জিজ্ঞেস করলে, 'কেমন আছেন, মশায়?' নানা কথার পর আমি তাঁকে কাতরভাবে বললাম, 'ভাই, আমার সর্ব্বনাশ উপস্থিত। এত গীতাপাঠ, চণ্ডীপাঠ শুনছি, ভগবানকে দিনরাত ডাকচি অথচ ঠাকুরের উপর মানুষবুদ্ধি হল। কিছুতেই এটা যাচ্ছে না, আমার নরকযন্ত্রণা উপস্থিত হয়েছে। এ কি হল? উপায় কি?' রাখাল আমার কথা শুনে হো হো করে হেসে উঠল। হেসে বললে, 'ও আর কি? ঢেউ যেমন হুস করে উঁচু হয় আবার তখনি নীচু হয়ে নেমে যায়,' মনটাও তেমনি।

ওর জন্য কিছু ভাববেন না। শীঘ্রই আধ্যাত্মিক অনুভূতির একটা উচ্চস্তরে আপনাকে নিয়ে যাবে, তাই মন এমনি হচ্চে। কিছু চিন্তা করবেন না।' রাখালের কথা শেষ হতে না হতে ন'দিদি তাঁকে খাবার এনে দিলে। রাখাল খেয়ে উঠে গেল। যাবার সময় হেসে বল্লে, 'ব্যস্ত হবেন না, কোন ভয় নেই, মন আবার তড়াক করে লাফ দিয়ে কোথায় চলে যাবে।' এই বলে যেই রাখাল বাড়ীর সামনের গলি পার হয়ে অন্য গলিতে মোড় ফিরলে, অমনি আমার কাঁধের উপর থেকে ভূতটা যেন চলে গেল—ঠাকুরের উপর আগেকার মত ভগবদ্‌বুদ্ধি এল। সাধ করে কি ওকে মানি? রাখাল পেছন ফিরলে অনেক সময় ঠাকুর বলে আমারই ভুল হয়। ঠিক সেই রকম হাব-ভাব কথাবার্ত্তা কতক কতক পেয়েছে।"

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ২৬শে নভেম্বর মহারাজ যখন বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসেন তখন সাধুব্রহ্মচারীদের দেখিয়া প্রেমানন্দকে তিনি বলিলেন, "ছেলেদের ধ্যান তপস্যা সাধন ভজন কোথায়? আর এদের স্বাস্থ্যও তো ভাল দেখছি না!" পরে মহারাজ নিয়ম করিয়া দিলেন যে, মঠের সকল সাধু ও ব্রহ্মচারী রাত্রি চারিটার সময় শয্যা ত্যাগ করিয়া সাড়ে চারিটার মধ্যে জপধ্যানে বসিবে। চারিটা বাজিবার দশ মিনিট পূর্ব্বে মঠে ঘণ্টাধ্বনি হইবে। এই নিয়মানুসারে সকলে তাঁহার নিকট বসিয়া ভোর সাড়ে ছয়টা পর্য্যন্ত জপধ্যান করিত এবং পরে সেখানে সমবেতভাবে প্রতিদিন ভজন ও স্তোত্রাদি আবৃত্তি হইত। তিনি এইসব শুনিতে শুনিতে প্রায়ই ভাবে একেবারে তন্ময় হইয়া

যাইতেন। তাঁহার সমগ্র মুখমণ্ডল সেই সময়ে দিব্যভাবকান্তিতে উদ্ভাসিত হইত। সাধন ও অধ্যাত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে নানা নিগূঢ় উপদেশ-বাণী তৎকালে তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইত। সেই প্রাণস্পর্শী মহাশক্তি-সমন্বিত কথা শুনিয়া সকলের অন্তরে সাধন-ভজনের জন্য একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিত। তাঁহার সেই তত্ত্বকথা শুনিয়া অনেকেই অনুভব করিতেন যে, তাহাদের দেহ ও মন যেন এক অভিনব শক্তির সঞ্চারে সতেজ ও বলীয়ান হইয়া উঠিতেছে, মনের সব সংশয় যেন ছিন্ন হইতেছে এবং এক অপূর্ব্ব ভাবের প্রেরণায় তাঁহাদের হৃদয়ে একটা আনন্দের প্রবাহ বহিতেছে। বিশেষতঃ কাহারও কোন ব্যক্তিগত প্রশ্ন বা সংশয় থাকিলে তাহার উত্তরও সেই তত্ত্বোপদেশের মধ্যেই তাহারা পাইত। যাহারা সেই সৌভাগ্য লাভ করিয়াছে, তাহারা নিজেকে ধন্য ও কৃতার্থ বোধ করিয়া থাকে।

মহারাজ মাঝে মাঝে উপদেশচ্ছলে মঠের সাধুদিগকে বলিতেন, "যে যতই ছোট হোক, কাউকে অবজ্ঞা করতে নেই।" এই বলিয়া তিনি শ্রীরামকৃষ্ণের কথিত একটী উপমা দিতেন। "কোনও গভীর অরণ্যে এক দাবানল জ্বলে উঠেছিল। সেই জঙ্গলের ধারে একটা বড় গাছের শাখায় অনেকগুলি পিঁপড়ে বাসা করেছিল। তারা দেখলে, তাদের বাঁচবার আর উপায় নেই, কারণ তলায় চারিদিকে আগুনে ঘিরেছে। এমন সময়ে একটী হাতী দাবানল থেকে বেরিয়ে সেই গাছটীর নিকট দিয়ে যাচ্ছে দেখে তাকে পিঁপড়েরা বল্লে,—ভাই তুমি তো নিরাপদে দাবানল থেকে বেরিয়ে নিজের জীবন বাঁচিয়েছ। আমরাও

সবংশে বাঁচি যদি তুমি শুঁড়দিয়ে এই ডালটা ভেঙ্গে দাবানলের বাইরে ফেলে দাও। হাতীটা এসে দাঁড়াল এবং তাই করলে। কিছুকাল কেটে গেল। পরে পিঁপড়েরা একদিন জঙ্গলের ভিতর থেকে একটা কাতরধ্বনি শুনতে পেলে। স্বরটা যেন তাদের চেনা চেনা ঠেকলো। সারবন্দী হয়ে এগিয়ে তারা দেখলে সেই হাতীটা যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ করছে। কিছু বুঝতে না পেরে তারা তার শুঁড়ের ভিতরে গিয়ে দেখে যে হাতীর মাথায় একটা কীট আছে যার দংশনে সে অস্থির হয়েছে। এই দেখে তারা সকলে মিলে কীটকে টুকরা টুকরা করে কেটে বের কল্লে। হাতীও যন্ত্রণা থেকে উদ্ধার পেলে। কার দ্বারা কি উপকার হয়, তা কে বলতে পারে?

"ঠাকুর বলতেন, 'প্রাণরোধে মনের রোধ হয়, আর মন রোধ হলে প্রাণের রোধ হয়—একটা হঠযোগ আর একটা রাজযোগ।'

"জোর করে সংসার ত্যাগ হয় না। ভোগের বাসনা থাকতে ত্যাগ করলে কষ্ট পেতে হয়। ঠাকুর বলতেন, 'ঘায়ের কাঁচা ছাল তুললে রক্ত পড়ে, আর ছাল শুকিয়ে আপনি খসে পড়লে কোন কষ্ট থাকে না।'

"তাঁকে সব দিয়েছি, তিনি যেমন ইচ্ছে রাখুন, যেখানে ইচ্ছে কাটুন। আমি তোমার—একবার ঠিক ঠিক বললেই সব হয়ে যাবে। তোমার যা ইচ্ছে কর।

"হীরে কিনতে এসে হীরে পেলাম না বলে কি জীরে কিনে নিয়ে যেতে হবে?

মোহরকে মোহর বলি বলে তাই এত দাম, নইলে এক কড়া কাণা কড়ির দাম নেই।

"জগতের দিক দিয়ে দেখতে গেলে সব দিকে সামঞ্জস্য পাওয়া যায় না, ভগবানের দিক দিয়ে দেখলে তবে সব দিকে সামঞ্জস্য পাওয়া যায়।

"ভোগ ভোগ লোকে বলে, সবাই ভোগ করতে জানে কি যে ভোগ করবে? দেবতা না হলে ভোগ করতে পারে না। দেবতা হবার আগে যে ভোগ সে সব পশুর ভোগ। আগে দেবতা হও তারপর ভোগ করবে।

"শুদ্ধভাব আশ্রয় করলে মন্দ কিছু স্পর্শও করতে পারে না। মন্দটা শুদ্ধভাবের কাছে আসবার আগেই শুদ্ধ হয়ে যায়।

"সাধন কর, সাধন করতে করতে কত কি দেখতে পাবে, সুন্দর সুন্দর দৃশ্য, কত দেবদেবী, কখনও রজত-সাগর, আবার কখনও জ্যোতির্দর্শন—স্থির জ্যোতি-দর্শন। সচ্চিদানন্দের ইতি নাই—তার চেয়ে, তার চেয়ে, তার চেয়ে আছে। লাগ, লেগে যাও—খুব রোক করে তাঁর নাম নিয়ে লেগে যাও।"

একদিন প্রাতঃকালে মহারাজের নিকট হইতে সাধুব্রহ্মচারীদের নির্দ্দিষ্ট কাজে আসিতে দেরি হওয়ায় প্রেমানন্দ উপরে গিয়া দেখেন, সকলেই স্থির ও শান্তভাবে মহারাজের ঘরে বসিয়া আছে। মহারাজ তাঁহাকে উঁকি মারিতে দেখিয়া "বাবুরামদা কি খবর?" এই প্রশ্ন করিলে তিনি যুক্তকরে বলিলেন, "মহারাজ, ঠাকুর-সেবা আছে যে।" এই কথা শুনিবামাত্র মহারাজ ত্রস্তভাবে বলিয়া উঠিলেন, "যা যা তোরা যা, ঠাকুরের কাজ রয়েছে।"

আর একদিন প্রেমানন্দ স্বামী একটু উত্তেজিত ভাবে তাঁহার ঘরে আসিয়া দুই ভাইয়ের (দুইজন মঠের সাধু) পরস্পর ঝগড়া বিষয়ে অত্যন্ত বিরক্তি প্রকাশ করিয়া মহারাজকে বলিলেন। মহারাজ স্থিরভাবে সব শুনিয়া বলিলেন, "বাবুরাম দা, এরা ঠাকুরের আশ্রয় নিয়েছে, তোমাদের কাছে রয়েছে, এদের সুবুদ্ধি দাও।" প্রেমানন্দ অবিলম্বে আগ্রহস্বরে বলিলেন, "তোমাকে, রাজা, তাই দিতে হবে।" তিনি উচ্চৈঃস্বরে মঠের সকলকে ডাকিয়া বলিতে লাগিলেন, "ওরে, কে কোথায় আছিস, এখানে আয়, মহারাজের আশীর্ব্বাদ নে।" একে একে সকলে আসিয়া মহারাজের পাদবন্দনা করিতে লাগিলেন। প্রত্যেকের মাথায় হাত দিয়া তিনি আশীর্ব্বাদ করিলেন। সকলের মন তৎক্ষণাৎ শান্ত হইল।

একবার কোন প্রসিদ্ধ ধনী ব্যবসায়ী তাঁহার একমাত্র পুত্র-বিয়োগে কাতর হইয়া মঠের সন্নিকটে বেলুড়ে বাস করেন। সাধুসঙ্গ লাভ করিবার জন্য তিনি সর্ব্বদা মঠে যাতায়াত করিতেন। সাধুসঙ্গের ফলে তিনি কতকটা শান্তিলাভ করেন।

রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের উদার মতে ও তাঁহাদের নিঃস্বার্থভাবে জনকল্যাণকর কার্য্য দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হন। তাঁহার লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসা মিশনের কার্য্যে দান করিতে চাহিলেন। তাঁহার সরল আবেদন ও অনুরোধে কোমলহৃদয় প্রেমানন্দ উহা গ্রহণ করিবার জন্য মহারাজের নিকট প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। মহারাজ দূরদৃষ্টি সহায়ে বুঝিতে পারিলেন যে শোকে তাঁহার সাময়িক বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছে। তিনি জোড়হাত করিয়া

মৃদুস্বরে প্রেমানন্দকে বলিলেন, "বাবুরাম দা, সাধুসঙ্গ করে লোকটীর মনে বৈরাগ্যের উদয় হল, আর তার সঙ্গ করে আমাদের বিষয়বুদ্ধি হবে?" মহারাজের এই কথা শুনিয়া প্রেমানন্দ উক্ত প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিলেন।

অন্য সময়ে কোন ভক্ত মঠের নামে চাউলের জন্য আবাদী জমি দান করিতে চাহিয়াছিলেন। মহারাজ ইহা শুনিবামাত্র যুক্তকরে প্রেমানন্দকে বলিয়াছিলেন, "তোমরা সিদ্ধসংকল্প পুরুষ, তোমরা যা মনে করবে তা ফলবে। ঐরূপ সংকল্প ছেড়ে দাও।" এইরূপ আধ্যাত্মিক দৃষ্টিসহায়ে মঠ ও মিশনের কার্য্য পরিচালনার সম্বন্ধে তিনি নানাবিধ উপদেশ দিতেন। কোন স্থায়ী প্রতিষ্ঠান বা কাজকর্ম্ম সম্বন্ধে তিনি বলিতেন, "তিন পুরুষ পরে কিরূপ দাঁড়াবে ভেবে, তবে এ সব কাজ করতে হয়।"

মহারাজের দীক্ষাদান বিষয়ে অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য দেখা যাইত। দীক্ষা দিবার সময়ে তাঁহার অপূর্ব্ব ভাবের আবেশ হইত। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে প্রথমবার মান্দ্রাজ হইতে ফিরিয়া আসিবার পর তিনি দুইজন ভক্তকে দীক্ষা ও অভিষিক্ত করিবেন বলিয়া আয়োজন করিতে বলিলেন। সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত হইয়াছে সংবাদ পাইয়া তিনি মূল কর্ম্ম করিতে ধ্যানঘরে আসিয়া আসনে উপবিষ্ট হইলেন। কোনও পূর্ণাভিষিক্ত শিষ্যকে তিনি মন্ত্রপাঠ করিতে বলিলেন। মন্ত্রোচ্চারণ করিবামাত্র তিনি "আহা! আহা! মা, মা দয়াময়ী ব্রহ্মময়ী" বলিতে বলিতে যেন চমকাইয়া উঠিতে লাগিলেন। মন্ত্র উচ্চারণ করিতে গিয়া তাঁহার জিহ্বা আড়ষ্ট হইয়া যাইতে লাগিল। অর্দ্ধেক

হয়ত উচ্চারিত হইল আবার যেন গভীর সুপ্তিঘোরে মগ্ন হইয়া পড়িলেন। এরূপ অবস্থা দেখিয়া মন্ত্রপাঠক শিষ্যটী কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইল। অভিষেক-ক্রিয়া আরম্ভ হইয়াছে এবং মন্ত্রপাঠ সম্পূর্ণ হইতে অন্ততঃ আরও কিছু সময় লাগিবে, অথচ তাঁহার ঐরূপ অবস্থায় কার্য্যটী কি করিয়া সম্পূর্ণ হইবে ইহাই শিষ্যটী ভাবিতে লাগিল। কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি রক্তবর্ণ চক্ষু মেলিয়া মাতালের ন্যায় আড়ষ্টভাবে শিষ্যকে বলিলেন, "আবার বল্।" মন্ত্রোচ্চারণ করিলে পুনর্ব্বার তিনি পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। এইভাবে প্রত্যেক মন্ত্রই অত্যন্ত ধীরে ধীরে চলিতে লাগিল। যাহাদিগকে অভিষিক্ত করিতেছিলেন তাহাদের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া শিষ্য দেখিল যে, তাহাদের মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়াছে এবং অবিরল ধারে তাহারা অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছে। এইভাবে অভিষেক ক্রিয়ানুষ্ঠান শেষ হইল। কার্য্যশেষে তিনি আসন ত্যাগ করিয়া স্বস্থানে চলিয়া গেলেন।

পূর্ব্বে পূর্ব্বে মহারাজের নিকট দীক্ষা লওয়া অতি দুরূহ ব্যাপার ছিল। তিনি বলিতেন, "শিষ্যের স্বভাব ভালরূপে পরীক্ষা করে নেওয়াই গুরুর কর্ত্তব্য।" যখন কেশববাবুর দলের অনেকে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করিয়া তাহাতে যোগদান করিতে লাগিল এবং তাঁহার কতিপয় অনুগামী শিষ্যও উক্ত দলভুক্ত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন, তখন ঠাকুর কেশববাবুকে বলেন, "যাকে তাকে দলে নিয়েছিলে কেন? বেছে বেছে লোক নিতে পার নি?"

মহারাজ ইহা শুনিয়াছিলেন এবং ঠাকুরের এই সাবধানবাণী স্মরণ রাখিয়াই দীক্ষাদান করিতেন। দীক্ষার্থী কেহ আসিলে তাহার যথার্থ আগ্রহ, চরিত্রবল, কার্য্যশক্তি ও আচরণ প্রভৃতি তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে লক্ষ্য করিতেন এবং অন্যভাবেও পরীক্ষা করিয়া লইতেন। মহারাজ বলিতেন, "প্রথমতঃ আমি সাধারণ ভাবে নিত্য কিছু করবার জন্য বলে দিয়ে থাকি। যদি দেখি সে তা ঠিক করেছে, তবে তাকে দীক্ষা দেই।" এইরূপ পরীক্ষা করিয়া কাহাকেও দুই তিন বৎসর পরে দীক্ষা দিয়াছেন। এমন কি মাঝে কয়েক বৎসর তিনি কাহাকেও দীক্ষা দেন নাই। ইহা শুনিয়া একদিন শ্রীশ্রীমা বলিয়াছিলেন, "রাখাল কি কচ্ছে? সে দীক্ষা দেয় না?"

১৯১৬ খৃষ্টাব্দে মহারাজ মিনার্ভায় 'রামানুজ' প্রথম অভিনয় দেখিতে যান। রামানুজ আচণ্ডালে নাম বিলাইতেছেন এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে তিনি অবিরত ধারে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছিলেন। এই 'রামানুজ' নাটক দেখিবার পর হইতেই তিনি কৃপার ভাণ্ডার খুলিয়া দিলেন। দলে দলে ভক্তগণ দীক্ষা লইতে লাগিল। একদিন মঠে বহু ভক্ত দীক্ষা লইতেছিল। দীক্ষাকর্ম্মাদি শেষ হইলে জনৈক শিষ্যকে তিনি সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "যে আসবে তাকেই তাঁর নাম দিয়ে যাব। এতে মঙ্গল হবেই।" শিষ্য বলিল, "সে আপনার কৃপা।"

মহারাজ যে পর্য্যন্ত দীক্ষার্থীর প্রকৃত ইষ্ট দর্শন না করিতেন সে পর্য্যন্ত তিনি কাহাকেও দীক্ষা দিতেন না। দীক্ষা দিতে বসিয়াও উঠিয়া আসিয়াছেন এবং বলিয়াছেন তোমার গুরু

অন্যত্র আছেন। দীক্ষা বিষয়ে তিনি শ্রীশ্রীঠাকুরের ইঙ্গিত বুঝিয়া কার্য্য করিতেন। তিনি এক দিন বলিয়াছিলেন, "ঠাকুরের আদেশে আমি নাম দিচ্ছি।" শ্রীরামকৃষ্ণের আদেশে বা ইঙ্গিতে পরিচালিত হইয়া যে তিনি দীক্ষাদান করিতেন নিম্নলিখিত ঘটনায় ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে।

একদিন বলরাম মন্দিরে মহারাজ আহারান্তে বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করিলে একটী সম্ভ্রান্ত ঘরের বালবিধবা তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে সঙ্গে করিয়া দ্বিতলে বারান্দায় উপস্থিত হইলেন। তথায় মহারাজের একটী সন্ন্যাসী সেবক বসিয়াছিল। তাঁহাকে দেখিয়া মহিলাটী ব্যাকুলভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ কোথায় আছেন? আমরা তাঁকে দর্শন কর্ত্তে এসেছি। শরৎ মহারাজ আমাদের এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন।" সেবক বিশ্রামকক্ষে গিয়া মহারাজকে তাহার কথা নিবেদন করিলে তিনি বলিলেন, "খাওয়া দাওয়ার পর এই বুড়োবয়সে আর কথা বলতে পারি না, বাবা!" দর্শনার্থিনী মহিলাটীকে উহা জানাইলে সে অবিরল ধারে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিল। কাঁদিতে কাঁদিতে সেবকটীকে বলিল, "শুধু একবার দর্শন আর প্রণাম করে চলে যাব।" মহিলাটীর অশ্রুধারা ও ব্যাকুলতা দেখিয়া সন্ন্যাসীর হৃদয় ব্যথিত হইল। সেবক সহানুভূতিপূর্ণ হৃদয়ে উক্ত বিশ্রামকক্ষে পুনরায় প্রবেশ করিয়া মেয়েটীর প্রার্থনা মহারাজকে জানাইলেন। সেবকের কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, "যদি শুধু প্রণাম করে চলে যায়

তবে আসতে বল।” ইহা শুনিয়া উক্ত বিধবা মহিলা ভ্রাতার সঙ্গে ধীর পদক্ষেপে মহারাজের কক্ষে প্রবেশ করিয়া প্রণাম করিলেন।

প্রণতাবস্থায় ভাবোচ্ছ্বাসে মহিলাটি কাঁদিতে লাগিলেন। মহারাজ নির্ব্বাক নিস্পন্দ ভাবে বসিয়া রহিলেন। সেবকটী এক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া দেখিলেন যে মহারাজের বাহ্য সংজ্ঞা নাই, যেন কোন ভাবরাজ্যে তিনি চলিয়া গিয়াছেন। কিয়ৎক্ষণ পরে উক্ত ভাব প্রশমিত হইল। মহিলাটী তখনও প্রণতাবস্থায় কাঁদিতেছিল। করুণার্দ্র হৃদয়ে স্নেহকণ্ঠে মহারাজ তাঁহাকে বলিলেন, “ওঠ মা ওঠ—কি হয়েছে বল। তাঁহার শান্ত অভয়-বাণী শুনিয়া মহিলাটী উঠিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু আনন্দোচ্ছ্বাসে ও ভাবাবেগে প্রথমে তাঁহার বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না। পরে ধীরে ধীরে সে মহারাজের বাম পার্শ্বে দেওয়ালে ঝুলানো শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতিকৃতির দিকে অঙ্গুলী নির্দ্দেশ করিয়া বলিল—“এঁরই আদেশে আমি আপনাকে দর্শন কর্ত্তে এসেছি।” বিধবা প্রায় চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকা। বৎসরাধিক পূর্ব্বে তাহার স্বামীর মৃত্যু হইয়াছে। শোকে দুঃখে এবং ভবিষ্য জীবনের দারুণ নৈরাশ্যান্ধকারের কথা ভাবিয়া হতাশহৃদয়ে সে রাত্রিতে অশ্রুপাত করিত। কয়েক দিন পূর্ব্বে শেষ রাত্রে সে দেখিল তাঁহার সম্মুখে শ্রীরামকৃষ্ণ দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। তিনি তাহাকে বলিলেন, “আমার ছেলে রাখাল বাগবাজারে আছে—তার কাছে যা।”

উক্ত মহিলা শ্বশুরালয়ে বাস করিত। শাশুড়ীকে বলিয়া সে

পিতৃগৃহে আসিয়াছে। আজ তাহার কনিষ্ঠ ভাইকে সঙ্গে লইয়া প্রথমে সে উদ্বোধন কার্য্যালয়ে শরৎ মহারাজের নিকট যায়। তিনি সব কথা শুনিয়া তাহাকে বলরাম মন্দিরে যাইতে বলিলেন। মহারাজ সেই দিন সেই শুভ মুহূর্ত্তে তাহাকে দীক্ষা দান করিলেন। তাহারা উপবাসী রহিয়াছেন জানিতে পারিয়া মহারাজ বলরাম মন্দিরে রামবাবুর মার নিকট প্রসাদ গ্রহণ করিতে তাহাদিগকে পাঠাইলেন। সেই বালবিধবা শান্ত ও আনন্দিত চিত্তে হাস্যোজ্জ্বল মুখে গৃহে প্রত্যাগমন করিল। মহারাজের কৃপায় মহিলাটী পরে গৃহসংসার পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসিনী হইয়াছিল।

মহারাজকে দর্শন করিয়া ও তাঁহার অভয়বাণী শুনিয়া কত লোকের জীবন ও মন পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, কত তাপদগ্ধ অশান্ত নর-নারীর হৃদয় শান্তি লাভ করিয়াছে এবং ঘোর নৈরাশ্যে অপূর্ব্ব আশার আলোকে চিত্ত সমুদ্ভাসিত হইয়াছে!

অক্সফোর্ডের কোন অধ্যাপক-দুহিতা মহারাজকে দর্শন করিবার জন্য অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়াছিল। বেলুড় মঠে গিয়া সে শুনিল মহারাজ বলরাম মন্দিরে আছেন। মহারাজকে দর্শন করিবার মেয়েটীর একান্ত আগ্রহ ও অনুরাগ দেখিয়া স্বামী শিবানন্দ কৃপাবিষ্ট হইলেন। তিনি তাহাকে সঙ্গে করিয়া নৌকাযোগে বাগবাজারে বলরাম মন্দিরে লইয়া গেলেন।

মহারাজকে দর্শন করিয়া তাঁহার স্পর্শে এক অভিনব ভাবে সে আবিষ্ট হইল। পরে সে ভগিনী দেবমাতাকে এই সম্বন্ধে লিখিয়াছিল, "Oh sister, it was far more wonderful than

I had hoped. Only five minutes but he said something so wonderful to me and so encouraging and he took my hand in his two hands and something definite happened. I went out of that room feeling twenty years younger, full of hope to struggle on and with a new faith that it was all true. It was a wonderful day for me. I have felt so much more content and peaceful ever since and so full of gratitude to him and to them all for helping it to happen."

অর্থাৎ ভগিনি, আমি যা আশা করেছিলাম তার চেয়েও অনেক বিস্ময়কর ব্যাপার। মাত্র পাঁচ মিনিট কাল দর্শন পেয়েছি, কিন্তু তাঁর দুটী হাতের ভিতর আমার হাতটী নিয়ে এমন কিছু উৎসাহপূর্ণ আশ্চর্য্যজনক কথা বলেছিলেন যাতে নিশ্চিত কিছু ঘটেছিল। যখন তাঁর ঘর থেকে বাইরে এলাম—আমার অনুভব হল সাধনায় পূর্ণ আশান্বিত হয়ে সত্যিকারের নূতন বিশ্বাস-বলে আমার বয়স যেন আরও কুড়ি বছর কমে গিয়েছে। এই দিনটী আমার কাছে অপূর্ব্ব—সেই দিন থেকে কত তৃপ্তি আর শান্তি বোধ করছি। এর জন্য আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ—আর যাঁরা আমাকে এই দর্শনলাভে সাহায্য করেছিলেন তাঁদের নিকটেও আমি কৃতজ্ঞ।

মহারাজের নিকট সকলেরই অবারিত দ্বার ছিল। কত

পাপী তাপী পতিত পতিতা তাঁহার কৃপাবিন্দুলাভ করিয়া জীবনে শান্তিলাভ করিয়াছে এবং কাহারও কাহারও জীবন আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধা অভিনেত্রী তারাসুন্দরী তাঁহার দর্শন ও কৃপা পাইয়াই রঙ্গমঞ্চ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট কাল ৺ভুবনেশ্বরে একটী গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া কালাতিপাত করিয়াছে। উক্ত গৃহসংলগ্ন ঘরে সে মহারাজের প্রতিকৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়া নিত্য সেবাপূজার ব্যবস্থা করিয়াছিল এবং উক্ত ঘরটি ব্রহ্মানন্দ মন্দির বলিয়া তথায় পরিচিত। তাহার রচিত আত্মকাহিনীতে মহারাজের দর্শন ও কৃপার প্রভাবের কথা মর্ম্মস্পর্শী ভাষায় সে বর্ণনা করিয়াছে।

একদিন বলরাম মন্দিরে কোন স্ত্রীলোক একটী বড় চেঙ্গারীতে নানা প্রকার মিষ্টদ্রব্য লইয়া মহারাজকে দর্শন করিতে আসিয়াছিল। চেঙ্গারিটি সেবকের হাতে দিয়া সে মহারাজের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দূর হইতে বলিল, "আপনি দয়া করে পা দুটি নামিয়ে একবার মেজেতে রাখুন, তার পর পা তুলে যেমন বসেছেন তেমনি বসুন।" মহারাজ তৎকালে তক্তাপোষে উপবিষ্ট ছিলেন, স্ত্রীলোকটীর কাতর প্রার্থনায় সেইরূপ করিলেন। যে স্থানে মহারাজ পদযুগল স্থাপন করিয়াছিলেন সেই স্থানটীতে সে তাহার মুখ ঘর্ষণ করিয়া কাঁদিতে লাগিল। মহারাজের সদুপদেশে সে শান্ত হইয়া পরমানন্দে চলিয়া গেল। মহারাজ বাহিরে আসিয়া বলিলেন, "স্ত্রীলোকটী ভক্তিমতী কিন্তু এক কালে সে ভ্রষ্টা ছিল। ইচ্ছা হইলে তোমরা তাহার প্রদত্ত মিষ্টি খাইতে পার।"

মেয়ে ভক্তদের সম্বন্ধে মহারাজ বলিতেন—"মেয়েদের অতি সহজেই দর্শনাদি হয়। একটু সাধন-ভজন করলেই তাদের ভাবভক্তি খুলে যায়। তাদের ভাবভক্তির জোর বেশী।" অন্য একদিন তিনি বলেন, "কোন কোন মেয়েরা তাদের দর্শনাদির কথা বলে, আমি শুনে অবাক হয়ে যাই। ঠিক ঠিক সাধন-ভজন করলে তবে এরূপ দর্শনাদি হয়। আসলে হচ্ছে ব্যাকুলতা। ব্যাকুলতার জোরে সব মনটা তাঁতে যায়, বাকি যত কিছু পুঁছে যায়, এমন কি নিজের অস্তিত্বও ভুল হয়ে যায়। এই অবস্থায় দর্শনাদি সহজ হয়। সাধারণ লোকেরা ভাবভক্তি ব্যাকুলতার অভাবে বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারে না। ঠাকুর যেমন বল্‌তেন, 'লাল তপ্ত লোহায় এক ফোঁটা জল পড়তে না পড়তে উবে যায়'।"

ভক্ত ও শিষ্যদের প্রতি তাঁহার অসাধারণ ভালবাসা ছিল। তিনি তাহাদের শুধু পারলৌকিক মঙ্গল সাধন করিতেন না, তাহাদের ইহলৌকিক, কায়িক, বাচিক ও মানসিক উন্নতিরও সম্যক বিধান করিতেন। তিনি তাহাদের সংসারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘটনার খুঁটিনাটি সব জানিয়া লইয়া পরামর্শ দিতেন। গৃহী ভক্তদের মধ্যে কাহারও আর্থিক ক্লেশ ঘুচাইবার জন্য কাহাকেও বলিয়া চাকরি বা কাজ জুটাইয়া দিতেন, এমন কি নিজেও কখন কখন অর্থ সাহায্য করিতেন। প্রত্যেকেই মনে করিত, "মহারাজ আমাকেই সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসেন।" ইহাদের মধ্যে যাহারা দূরে থাকিত তাহাদের প্রত্যেকের তত্ত্ব লইতেন। একদিন তিনি তাঁহার সেবকদের কথাপ্রসঙ্গে বলিলেন—"তোরা সব সময় আমার

কাছে থাকিস্ আর তুই এক ছিলিম তামাক সাজিস বলে যারা দূরে আছে তাদের চেয়ে তোদের বেশী ভালবাসি মনে করিস্ ?”

শিষ্য-সেবকদের একদিন তিনি বলেন, “দেখ্, আমি যখন রাগ করব, তোরা যেন রাগ করিস্ নি। তোরা যখন রাগ করবি আমি তখন খুব ঠাণ্ডা হয়ে থাকব, দুইজনে একসঙ্গে রাগ করলে মুশকিল হয়ে যায়।”

তিনি বলিতেন, “কে কি রকম, সব বুঝতে পারি, কাহাকেও কিছু বলি না পাছে মনে কষ্ট পায়। উপায় হচ্ছে love and sympathy for all (সকলের জন্য প্রেম ও সহানুভূতি), আর ছোট ছোট দোষ overlook (উপেক্ষা) করা। মন্দকে যদি ভাল করতে না পারা গেল তাহলে আর কি হল ?”

একবার জনৈক সেবকের বিরুদ্ধে অন্য দুই তিন জন সেবক তাঁহার নিকট নানাবিধ অভিযোগ জানাইলে তিনি স্থিরভাবে সমুদায় শুনিয়া বলিলেন, “দেখ, আমার চেয়ে অনেক বড় বড় সাধু আছেন, তোমাদের ইচ্ছা হয় তাঁদের কাছে যেতে পার, আমায় সকলকে নিয়ে থাকতে হবে।

“খুব সহ্যগুণ রাখবে। সহ্য করলে ক্রোধ পালিয়ে যায়। সহ্য করার চেয়ে সংসারে আর কিছু নেই। ঠাকুর বলতেন, ‘যে সয় সে রয়, যে না সয় সে নাশ হয়।’ সমস্ত প্রাণ দিয়ে সহ্য করবে। বিনীত ভাব জীবনগঠনের পরম সহায়। ‘নীচু জায়গায় জল জমে, উঁচু থেকে গড়িয়ে যায়।’ যে বিনয়ী তার মিষ্ট ব্যবহার প্রভৃতি সদ্‌গুণ আপনি ফুটে ওঠে।”

১৯১৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীমা যখন জয়রামবাটীতে ছিলেন তখন

মহারাজ রুগ্ন তুরীয়ানন্দ স্বামীকে পুরী হইতে সঙ্গে লইয়া উদ্বোধন কার্য্যালয়ে উঠিয়াছিলেন। এই সময় প্রেমানন্দ স্বামীও পূর্ব্ববঙ্গ হইতে ফিরিয়া বলরাম মন্দিরে কালাজ্বরে মৃত্যু শয্যায় শায়িত। ভক্তেরা দলে দলে মহারাজকে দর্শন করিতে আসিত। তিনি প্রতিদিন সন্ধ্যার পর ভগবদ্‌প্রসঙ্গ তুলিয়া কত উচ্চ অনুভূতির কথা বলিয়া যাইতেন। সারদানন্দ স্বামীজি কখনও কখনও একপার্শ্বে দাঁড়াইয়া মহারাজের এই অতুলনীয় প্রসঙ্গ ও আলোচনা শুনিতেন। কোন কোন দিন তিনি আত্মহারা হইয়া ঠাকুরের জীবনের ঘটনা ও বিভিন্ন অনুভূতির কথা বলিতেন। হঠাৎ সে সময়ে যদি সারদানন্দের দিকে তাঁহার দৃষ্টি পড়িত অমনি বালকের মত হাসিয়া তিনি বলিতেন, "না, আর বলা হবে না। শরৎ মহারাজ বইতে ছাপিয়ে দেবে।"

পূজ্যপাদ প্রেমানন্দকে বায়ু-পরিবর্ত্তনের জন্য দেওঘরে পাঠাইতে ডাক্তারেরা পরামর্শ দিলেন। তিনি তথায় চলিয়া যাইবার কয়েকদিন পরে মহারাজ বলরাম মন্দিরে গিয়া রহিলেন। এখানে শ্রীশ্রীজগন্নাথের নিত্যসেবা ও ভোগের ব্যবস্থা ছিল। তাই কলিকাতায় একমাত্র বলরাম-গৃহেই ঠাকুর অন্ন গ্রহণ করিতেন। তিনি বলিতেন, "বলরামের অন্ন শুদ্ধ অন্ন।"

শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

"যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তাস্তে মে ভক্ততমা মতাঃ॥"

অর্থাৎ পার্থ! যারা কেবল আমাকেই ভক্তি করে তারাই আমার ভক্ত নয়—যারা আমার ভক্তদের ভক্ত তারাই শ্রেষ্ঠ

ভক্ত। বলরাম-চরিত্রে এই উক্তিটি পূর্ণরূপে প্রতিফলিত হইয়াছিল। ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানেরা ইহাকে অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু এবং পরমাত্মীয় জ্ঞানে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় শ্রদ্ধা করিতেন। স্বামিজী, মহারাজ প্রভৃতি ঠাকুরের ত্যাগী সন্ন্যাসী সন্তানগণ ইহার নিকট পত্রাদিতে "শ্রদ্ধাস্পদেষু" ও "দাস" শব্দ ব্যবহার করিতেন। বলরামবাবু ইঁহাদিগকে কিরূপ চক্ষে দেখিতেন এবং কতটা আপনার ন্যায় জ্ঞান করিতেন নিম্নলিখিত ঘটনায় তাহা বুঝিতে পারা যায়। একদিন বলরামবাবু বরাহনগর মঠে গিয়া দেখিলেন যে ঠাকুরের সন্তানেরা শুধু শাকান্ন খাইতেছেন। এই দৃশ্য তিনি সহ্য করিতে না পারিয়া গৃহে ফিরিয়া তাঁহার স্ত্রীকে বলিলেন, "আজ আমি শুধু শাকান্ন খাব।" তিনি যখন আহার করিতে বসিলেন তখন তাঁহার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ শুধু শাকান্ন খাচ্ছ—আজ কি ব্যাথাটা হয়েছে?" বলরামবাবু মাঝে মাঝে অম্বলে পিত্তশূল বেদনায় ভুগিতেন। সজলনেত্রে তিনি তখন বল্লেন—"মঠে গিয়ে দেখলাম যে ঠাকুরের ছেলেরা শুধু শাকান্ন খাচ্ছে, আমি কোন্ মুখে নানা ব্যঞ্জন দিয়ে অন্ন গ্রহণ করবো?" স্ত্রী বিস্মিত ভাবে বলিলেন, "তুমি এর কোন বন্দোবস্ত করনি?" বলরামবাবু বলিলেন মঠ হইতে ফিরিবার পথে তিনি তথাকার ভাণ্ডারের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার জন্য একটী লোককে আসিতে বলিয়াছেন। মাসাধিক কাল চলিয়া যায় এইরূপ পরিমাণ চাউল ডাল প্রভৃতি তিনি তাঁহার উড়িয়া পাচকের সঙ্গে মঠে পাঠাইয়া দিলেন। এই পাচকটী বরাহনগরের মঠে মাঝে মাঝে বলরাম বাবুদের

প্রদত্ত জিনিষপত্র লইয়া যাতায়াত করিত এবং সাধুদের নিকট সে পরিচিত ছিল। বলরাম মন্দিরের বহির্বাটীকে একটি মঠ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। শ্রীরামকৃষ্ণের ত্যাগী সন্তানগণ এবং সঙ্ঘের সাধু-ব্রহ্মচারীরা কার্য্যগতিকে কলিকাতায় আসিলে প্রায় তথায় অবস্থান করিতেন। দক্ষিণেশ্বরে মহারাজ যখন ঠাকুরের নিকট বাস করিতেন তখন তিনি মাঝে মাঝে কলিকাতায় আসিয়া বলরাম মন্দিরে থাকিতেন। শ্রীশ্রীঠাকুর, শ্রীশ্রীমা, স্বামিজী, মহারাজ প্রভৃতি ঠাকুরের অন্তরঙ্গ পার্ষদদের পদধূলি ও পুণ্যস্মৃতিতে বাড়ীটির মন্দির নাম সার্থক হইয়াছে। শ্রীরামকৃষ্ণ-ভক্তমণ্ডলীর নিকট ইহাও একটী পবিত্র তীর্থ।

দেওঘরে প্রেমানন্দের স্বাস্থ্যের অবস্থা দিন দিন অবনতির দিকেই চলিতে লাগিল। কোনও উপকার বা উন্নতি না দেখিয়া তাঁহাকে পুনরায় কলিকাতায় বলরাম মন্দিরে আনা হইল। তাঁহার জীবনের আর আশা রহিল না। প্রেমানন্দের মুমূর্ষু অবস্থা দেখিয়া মহারাজ অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "বাবুরাম দা, বাবুরাম দা, ঠাকুরকে মনে আছে তো ?" তিনি মহারাজের দিকে তাকাইয়া শুধু ঈষৎ হাসিলেন। ঠাকুর যে তাঁহার শিরায় শিরায় ধমনীতে ধমনীতে প্রতি রক্তবিন্দুর সহিত মিশিয়া আছেন। রামকৃষ্ণ নাম শুনিতে শুনিতেই তিনি ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে ২০শে জুলাই মহাসমাধিতে লীন হইলেন। মহারাজ বালকের মত ফোঁফাইয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। একে একে ঠাকুরের ঈশ্বরকোটী লীলাসঙ্গীরা অন্তর্হিত হইলেন !

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে যে মহারাজের সঙ্কলিত

ঠাকুরের কতকগুলি উপদেশ উদ্বোধন পত্রিকায় প্রকাশিত হইত। উক্ত উপদেশ সঙ্কলনকালে একবার মহারাজ কাশীধামে অবস্থান করিতেছিলেন। একদিন তথায় ঠাকুরের কয়েকটী উপদেশ মহারাজ সেবককে দিয়া খাতায় লিখাইয়া রাখেন। সেইদিন গভীর নিশীথে তিনি হঠাৎ শয্যা ত্যাগ করিয়া সেবককে ডাকিলেন। সেবক আসিলে পর উক্ত খাতাটা তাহাকে আনিতে বলিলেন এবং উহা হইতে একটী উপদেশ বাদ দিতে আদেশ করিলেন। অতঃপর তিনি সেবককে বলিয়াছিলেন, "ঠাকুর এসে বলে গেলেন, 'এটা আমার কথা নয়'।" এই ভাবেই ভগবদ্বাণী আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। সাধারণের কল্যাণার্থে এই উপদেশগুলি পরে পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। বইখানি আকারে ক্ষুদ্র হইলেও তত্ত্বে অতুলনীয়। সমগ্র উপনিষদের সার যেমন গীতায়, তেমনি শ্রীরামকৃষ্ণের সার উপদেশ এই পুস্তকে নিবদ্ধ রহিয়াছে।

এই গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদের ভূমিকায় সারদানন্দ গ্রন্থকার ও তাঁহার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে একস্থানে লিখিয়াছেন—"অনেকে ঠাকুরের অমূল্য উপদেশগুলিকে অযত্নে যথেচ্ছাকৃত বিকৃত ও কদর্থ করিতেছে দেখিয়া ইহা যথাযথভাবে সাধারণের নিকট উপস্থিত করিবার জন্যই কৃতার্থম্মন্য ও স্নেহধন্য শিষ্যের প্রকৃত প্রয়াস। ইঁহার মত গুরুদেবের নিয়ত সঙ্গ অপর কেহ করেন নাই।"

রামনাম-সংকীর্ত্তন মহারাজ দক্ষিণদেশ হইতে সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন, এবং তাহা বেলুড় মঠে শত শত নরনারী মুগ্ধ

হইয়া শুনিয়াছিলেন—ইহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। সেই রামনাম-সংকীর্ত্তনে মহাত্মা তুলসীদাসের রচিত স্তোত্রাদি সন্নিবিষ্ট হইয়া ১৯১১ খৃষ্টাব্দে পুস্তিকাকারে প্রকাশিত ও বিনামূল্যে বিতরিত হইতে লাগিল। সেই পুস্তিকার ভূমিকায় মহারাজ লিখিয়াছিলেন, "পূজ্যপাদ শ্রীমৎ স্বামী বিবেকানন্দজীর বড় সাধ ছিল, বঙ্গে ব্রহ্মচর্য্য-মূর্ত্তি শ্রীশ্রীমহাবীরের উপাসনা প্রবর্ত্তিত হয়। সেই জন্য আমরা মঠে এই নামসঙ্কীর্ত্তনের পূর্ব্বে শ্রীশ্রীমহাবীরের আরাধনার নিয়ম করিয়াছি। অনুরোধ, অপর সকলেও ইহার অনুবর্ত্তন করেন। অখণ্ড ব্রহ্মচর্য্য পালনপূর্ব্বক ভগবৎ-প্রীতির অধিকারী হইয়া জন্মভূমি ধন্য ও পবিত্র করুন, ইহাই হৃদয়ের অকপট প্রার্থনা।" আজ শুধু বাংলাদেশে নয় ভারতের সর্ব্বত্র এই সঙ্কীর্ত্তন এবং তৎসঙ্গে শ্রীশ্রীমহাবীরের পূজা প্রচলিত হইয়াছে। ভারতের নরনারী ইহা শ্রবণ করিয়া ভক্তিরসে আর্দ্র হইতেছে।

মহারাজ ১৯২০ খৃষ্টাব্দে ২৪শে ডিসেম্বর মঠের সাধু, ব্রহ্মচারী ও ভক্তবৃন্দকে সঙ্গে লইয়া জানবাজারস্থ কলিকাতা ছাত্রনিবাসে (Calcutta Students' Home) গমন করেন। তাঁহার শুভাগমনে সারাদিবসব্যাপী আনন্দোৎসবের মধ্য দিয়া তথায় যেন আধ্যাত্মিক প্রেরণার এক স্রোত বহিয়া গিয়াছিল। সকলের ভিতর এক অপূর্ব্ব ভাব ও উৎসাহের সঞ্চার হইল। তাঁহারা অনেকে অনুভব করিলেন যেন মহারাজ ছাত্রনিবাসের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়া গেলেন। এই পুণ্যস্মৃতির স্মরণোদ্দেশে প্রতি বৎসর ২৪শে ডিসেম্বর মহারাজের শুভাগমনোৎসব তথায়

অত্যাপি অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে। এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানে জনকল্যাণকর প্রকৃত শিক্ষার বীজ নিহিত রহিয়াছে,—ইহা তিনি বুঝিতে পারিলেন।

এই ছাত্রনিবাসের ব্যপদেশে যাহাতে স্বামিজীর শিক্ষা-পরিকল্পনা উত্তরকালে রূপায়িত হইতে পারে তজ্জন্য মহারাজ মাঝে মাঝে কর্ম্মিবৃন্দকে নানা সদুপদেশদানে ও উৎসাহবাক্যে উক্ত আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতেন। একদিন কথাপ্রসঙ্গে তিনি তাহাদিগকে বলিয়াছিলেন, "এ খুব ভাল কাজ, জেলায় জেলায় এ রকম কর্ত্তে হবে। আর এখানে খুব বড় করে একটা করতে হবে নিজেদের জমি বাড়ীতে—আর তার সঙ্গে একটা Vocational College রাখতে হবে।"

এই ছাত্রনিবাস কিরূপ উদ্দেশ্যে পরিচালিত হওয়া কর্ত্তব্য এবং ইহার কার্য্যপদ্ধতি কি ভাবে গঠন করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে তিনি স্বল্প কথায় সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন। চরিত্রগঠন ও স্বাবলম্বনই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। সুখের বিষয়, ইতিমধ্যে এই প্রতিষ্ঠান হইতে বহু শিক্ষিত যুবক মহোচ্চ আদর্শে উদ্বুদ্ধ ও প্রদীপ্ত হইয়া ত্যাগমন্ত্রে স্ব স্ব জীবন আহুতি প্রদান করিয়াছেন।

এখানে বলিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতির সহযোগে যাহাতে ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ ছাত্র-জীবন গড়িয়া উঠে এবং প্রকৃত মনুষ্যত্বের বিকাশ পায় —এই আদর্শে ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে এই প্রতিষ্ঠানের সূচনা হইয়াছিল। পরে ১৯১৯ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে এই ক্ষুদ্র প্রতিষ্ঠানটী রামকৃষ্ণ মিশনের অন্তর্ভুক্ত হয়। তৎকালে জানবাজারে একটী

ছোট বাড়ীতে আটটী কলেজের ছাত্র লইয়া বিনা আড়ম্বরে এই ছাত্রনিবাসের কার্য্য পরিচালিত হইতেছিল। বর্ত্তমানকালে ছাত্র-সমাজে ইহা একটি প্রভাবশালী প্রতিষ্ঠান।

মহারাজের হৃদয়ের অগাধ প্রেম এবং অসীম উদারতা নানা কার্য্যে, হাবভাবে ও লোকব্যবহারে কখন কখন জ্বলন্তভাবে প্রকাশ পাইত। কাশী সেবাশ্রমের প্রারম্ভে জনৈক কর্ম্মী হঠাৎ কোন প্রলোভনে পড়িয়া পথভ্রষ্ট হওয়াতে রামকৃষ্ণ মিশনের সহিত তাঁহার সকল সংস্রব ছিন্ন হইয়াছিল। কিছুদিন পড়ে মিশনের কর্ত্তৃপক্ষ শুনিতে পাইলেন যে, কাশী রামকৃষ্ণ মিশন সেবাশ্রমের নাম করিয়া সে অনেক সহৃদয় ব্যক্তির নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিতেছে। এইভাবে প্রবঞ্চনা করিতে করিতে একদিন সে বগুড়ায় ধরা পড়িল। আদালতে মঠ ও মিশনের নামে প্রবঞ্চনা করার কথা সে একেবারে অস্বীকার করিল। সুতরাং মঠ ও মিশনের সভাপতি ব্রহ্মানন্দ স্বামীকে সাক্ষ্য দিতে বগুড়ায় যাইতে হইল। কিন্তু সাক্ষীর কাঠগড়ায় মহারাজকে দেখিয়াই আসামী কাঁদিতে কাঁদিতে নিজের সমুদয় অপরাধ স্বীকার করিল। অনুতপ্ত অশ্রুধারা দেখিয়া মহারাজ ব্যথিত হইলেন এবং দণ্ড-হ্রাসের চেষ্টা করিলেন। তরুণ বয়সে প্রথম অপরাধ বিবেচনায় হাকিম তাহাকে বিনাশ্রমে তিন মাস কারাদণ্ড দিলেন। কারামুক্তির পর মহারাজের সহিত অকস্মাৎ তাহার সাক্ষাৎ হয়। মহারাজ স্নেহভরে তাহাকে আবার মঠে যাইতে বলিলেন এবং ভবিষ্যতে যাহাতে সে সদ্ভাবে জীবন পরিচালিত করিতে পারে তজ্জন্য অনেক সদুপদেশ দিলেন। ভাগ্যদোষে বা লজ্জাবশতঃই

হউক সে আর মঠে ফিরিয়া গেল না। মহারাজ অনেক সেবক বা কর্ম্মীকে গুরুতর অপরাধেও ক্ষমা করিতেন। তিনি বলিতেন, "তাঁহার কৃপাকটাক্ষে কোটী জন্মার্জ্জিত পাপ মুহূর্ত্তে নষ্ট হইয়া যায়।"

মহারাজ যখন যে আশ্রমে অবস্থান করিতেন তথায় ঠাকুরের সেবাপূজার প্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি থাকিত। কখনও কখনও ঠাকুরের ভোগে কোন্ তরকারি কি ভাবে রাঁধিতে হইবে এবং কোন্ তরকারির কি গুণ তাহাও মঠের সাধু-ব্রহ্মচারীদিগকে বুঝাইয়া দিতেন। সেবায় খুঁটিনাটি বিষয়ের ব্যতিক্রম দেখিলেও তিনি কঠোর শাসন করিতেন। সেবাপরাধ ভক্তি-সাধনপথে বিশেষ অন্তরায়। সেবাপূজার সেই অপরাধ সাধু-ব্রহ্মচারীদের যাহাতে স্পর্শ না করিতে পারে তজ্জন্যই মহারাজ এই বিষয়ে সাবধান করিয়া দিতেন।

মহারাজ যখন যেখানে থাকিতেন সেইখানে গাছপালার বিশেষ যত্ন করিতেন। এমন কি শশীনিকেতনে অবস্থানকালে পুরীর সৈকতভূমিতে তিনি নানাবিধ ফুল ও তরকারী উৎপন্ন করিয়াছিলেন। রাম বাবু তাহা দেখিয়া পরম বিস্মিতভাবে তাঁহার ডায়েরীতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, "মহারাজ যেন যোগ-বলে ইহা করিয়াছেন।" বাস্তবিকই ফলফুল শাকসব্জী সম্বন্ধে মহারাজ এত বেশী জানিতেন, তাহা ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। বৃক্ষ-লতা সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল এবং তাঁহার ভূয়োদর্শন ও অভিজ্ঞতার ফলেই তিনি ঐ বিষয়ে প্রগাঢ় জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছিলেন। একবার কোন একজন প্রবাসী যুবক

তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিলে কথাপ্রসঙ্গে মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যেখানে আছ সেখানে খাবার-দাবার তরি-তরকারি কেমন পাওয়া যায়?" যুবকটী প্রত্যুত্তরে বলিল, "মহারাজ! স্থানটীর চারিদিকে পাহাড়-জঙ্গল, হাট-বাজার অনেক দূরে—আর হাটেও তরিতরকারি কিছু মেলে না।" মহারাজ গম্ভীরভাবে আবার তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি যে বাড়ীতে থাক সেখানে উঠান বা খালি জায়গা পড়িয়া নাই?" সে বলিল, "বাড়ীটী প্রায় দু-তিন বিঘে জমির উপর—মাঠের মত খালি জায়গা পড়ে রয়েছে।" মহারাজ তাহাকে ভৎর্সনার সুরে বলিলেন, "তোমার মত আহাম্মক দুনিয়ায় নেই। এত জায়গা, সেখানে দুটো তরকারির গাছ লাগাতে পার না? কেবল কুঁড়েমি করে কষ্ট পাবে তা আর কি বলবো? বেগুন, কুমড়ো, শাক, কফি, সিম, বরবটী আর কত রকম তরকারির বীজ এনে লাগাতে পার। শুধু দুবেলা একটু জল দেওয়া আর দেখা, এইটুকু কষ্ট করলে তরকারি এত হতে পারে যে পাঁচজনকে বিলিয়ে নিজেও যথেষ্ট খেতে পার। অপর লোকও তা দেখে শেখে। এতে নিজের আর পরের উপকার দুই-ই হতে পারে। গাছপালা ফলফুল তরকারির বাগান করলে মনও ভাল থাকে, আর টাট্‌কা জিনিষ খেয়ে শরীরও সুস্থ থাকে।"

মহারাজ প্রায়ই বলিতেন, "গাছপালার যত্ন ও সেবা করলে তারা মানুষের মত নেমকহারামি করে না। তারা ফল, ফুল, ছায়া দিয়ে মনকেও আনন্দে রাখে।"

যে মঠে বা আশ্রমে তিনি বাস করিতেন সেই স্থানকেই ফল

ফুল বৃক্ষলতায় শোভিত করিতেন। স্বহস্তে কথন কথন বৃক্ষমূলে জলসেচন করিতে করিতে বলিতেন, "বৃক্ষসেবা"। নানাজাতীয় ফুল ফুটিয়া রহিয়াছে দেখিয়া তিনি কথনও কথনও বলিতেন, "আহা, যেন দেবকন্যারা হাসছেন।" ফল ফুল বৃক্ষলতাকে তিনি চৈতন্যময় দেখিতেন এবং তাহাদের অযত্ন দেখিলে তিনি দুঃখিত হইতেন। এমন কি পূজার জন্য গাছ হইতে কেহ ডাল ভাঙ্গিয়া ফুল যথেচ্ছভাবে ছিঁড়িয়া লইলে তিনি তিরস্কার করিতেন। যাহাতে গাছের শোভা নষ্ট হয় কিম্বা গাছের ডাল ভাঙ্গিয়া যায় তাহা করিতে নিষেধ করিতেন। বৃক্ষে বৃক্ষে কুসুমস্তবক ফুটিয়া আছে দেখিয়া তিনি তন্ময় হইয়া বলিতেন, "বিরাটের পূজা হচ্চে"।

বিংশ পরিচ্ছেদ

স্ব-স্বরূপে স্থিতি

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, রাখালের দক্ষিণেশ্বরে আসিবার প্রাক্কালে শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবচক্ষে দেখিলেন যে, গঙ্গাবক্ষে সহসা একটী শতদল কমল ফুটিয়া উঠিল, তদুপরি রাখালরাজ শ্রীকৃষ্ণ এবং তাঁহার হাত ধরিয়া ঠিক তাঁহারই অনুরূপ আকৃতিবিশিষ্ট একটী কিশোর বালক নূপুর পায়ে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিতেছে। এই দর্শনের অনতিবিলম্বে রাখাল দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপনীত হইলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তদের নিকটে আরও বলিয়াছিলেন, "রাখাল নিজের স্বরূপ জানতে পারলে আর তার শরীর থাকবে না।" পাছে তাঁহার এই লীলাসহচর ব্রজের বালক তাহার ব্রজের স্বরূপ সত্তা উপলব্ধি করিলে লীলা সাঙ্গ করে, তজ্জন্য তিনি নিজেও এই অপূর্ব্ব দর্শনের কথা তাঁহার এই আদরের পুত্রটীর নিকট কখনও প্রকাশ করেন নাই এবং ঘুণাক্ষরেও রাখালের ইহা যেন কর্ণগোচর না হয় তজ্জন্য তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদ ভক্তদের বিশেষভাবে সাবধান করিয়া দিয়াছিলেন। রাখাল যখন প্রথম শ্রীবৃন্দাবনে চলিয়া যান, তখন ঠাকুর শ্রীশ্রীজগন্মাতার কাছে কাতর আবেদন ও প্রার্থনা করিয়াছিলেন, যেন ব্রজের রাখাল ব্রজধাম হইতে তাঁহার নিকট ফিরিয়া আসে।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ

শ্রীশ্রীঠাকুরের মুখে এই আশঙ্কার বাণী শুনিয়া তাঁহার গুরুভ্রাতারাও সর্ব্বদা ইহা সঙ্গোপনে রাখিতেন। এমন কি কোন দিন কথাপ্রসঙ্গে, ভাবভঙ্গীতে বা আকারইঙ্গিতেও ঠাকুরের এই অপূর্ব্ব দর্শনের কথা মহারাজের নিকট তাঁহারা প্রকাশ করেন নাই। শ্রীশ্রীঠাকুরের আশঙ্কার বাণীই তাঁহাদের এই সতর্কতার মূল কারণ।

'শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণলীলাপ্রসঙ্গ' রচনাকালে স্বামী সারদানন্দ দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুরের নিকট মহারাজের প্রথম আগমনের কথা বর্ণনা করিতে করিতে ভাবের আবেগবশতঃ অন্যমনস্কভাবে এই ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং মুদ্রিত হইবার জন্য উক্ত পাণ্ডুলিপি ছাপাখানায় প্রেরিত হইয়াছিল। দৈবক্রমে ঠিক এই সময়ে প্রেমানন্দ স্বামী শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে (বর্ত্তমান উদ্বোধন কার্য্যালয়ে) তাঁহার গুরুভ্রাতা সারদানন্দের নিকট আসিয়াছিলেন। তিনি মাঝে মাঝে প্রেমানন্দকে লীলাপ্রসঙ্গের পাণ্ডুলিপি পড়িয়া শুনাইতেন এবং তাঁহার পরামর্শ মত কখনও কিছু পরিবর্ত্তন বা পরিবর্দ্ধন করিতেন। ছাপাখানায় পাণ্ডুলিপি চলিয়া গেলেও উহার নকল বা প্রুফ তাঁহার নিকট থাকিত। সেদিন যখন সারদানন্দ রাখাল সম্বন্ধে শ্রীরামকৃষ্ণের কমলদলে শ্রীকৃষ্ণ ও নৃত্যরত কিশোর বালক দর্শনের বর্ণনা পড়িয়া শুনাইতেছেন তখন প্রেমানন্দ চমকিত হইয়া তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "শরৎ, একি করেছ? ঠাকুরের কথা কি মনে নেই? মহারাজ এখনও যে দেহে বর্ত্তমান! ঠাকুর বলিতেন, 'রাখাল যখন তার নিজের স্বরূপ জানতে পারবে তখন তার আর দেহ থাকবে

না !' সেকথা কি তোমার মনে নেই ?" সারদানন্দ নিজেও শ্রীশ্রীঠাকুরের এই সতর্কবাণী শুনিয়াছিলেন—তাহা স্মরণ করিয়া তিনিও আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিলেন। তৎক্ষণাৎ সারদানন্দ প্রেস হইতে মুদ্রিত প্রুফ ও পাণ্ডুলিপি আনাইয়া উক্ত অংশ অনলে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিলেন এবং তৎসঙ্গে উক্ত পাণ্ডুলিপির সজ্জিত অক্ষরগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলিতে আদেশ করিলেন। শুধু আদেশ করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হন নাই, লোক প্রেরণ করিয়া উহা সত্বর কার্য্যে পরিণত করাইতেও যত্নবান হইলেন। বাস্তবিকই মহারাজ যাহাতে তাঁহার স্ব-স্বরূপ জানিতে না পারেন তদ্বিষয়ে তাঁহার অন্তরঙ্গ গুরুভ্রাতাদের প্রখর দৃষ্টি ছিল ; কারণ, মহারাজ তাঁহাদের প্রিয়তম 'রাজা'—ঠাকুরের জীবন্ত প্রতিনিধি, তাঁহার মানসসন্তান, এবং সর্ব্বোপরি তাঁহার স্বরূপতত্ত্ব সম্বন্ধে ঠাকুরের সতর্কবাণী।

মহারাজ মাঝে মাঝে কলিকাতায় আসিয়া বলরাম মন্দিরে থাকিতেন। বলরাম মন্দিরের বহির্বাটীর উপরে সিঁড়ির পার্শ্বে দ্বিতলে দক্ষিণদিকে পশ্চিম পার্শ্বে যে ঘরটী রহিয়াছে তথায় তিনি শয়ন ও উঠা-বসা করিতেন। তাঁহার শুইবার খাটটীর সম্মুখে একটী ছোট খাট ছিল। ঐ ছোট খাটে বসিয়া তিনি ভক্তদের সহিত কখন কখন আলাপ-আলোচনা করিতেন। একদিন গভীর রাত্রিতে মহারাজ দেখিলেন যেন শ্রীরামকৃষ্ণ সহসা উক্ত ছোট খাটটীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন এবং কিছুক্ষণ পরে নির্ব্বাকভাবেই অন্তর্দ্ধান হইলেন। এইরূপ অকস্মাৎ ঠাকুরের অপ্রত্যাশিত নির্ব্বাকভাবে দর্শন দান করায় তিনি

বিস্মিত হইয়া ইহার কারণ সম্বন্ধে মনে মনে আন্দোলন করিতে লাগিলেন। তিনি ভাবিলেন, "হঠাৎ ঠাকুরের এইরূপ নির্ব্বাক আবির্ভাবের কারণ কি? আকার-ইঙ্গিতেও তিনি ত কোন ভাব প্রকাশ করিলেন না। নিবিড় নিস্তব্ধ গভীর রাত্রিতে ঠাকুরের এই আকস্মিক আবির্ভাব ও তিরোধান কি কোন ভাবী ঘটনার ইঙ্গিত?" মহারাজ খাটের উপর বসিয়া একান্তভাবে চিন্তামগ্ন হইয়া রহিলেন। এমন সময়ে তাঁহার কোন সেবক ঘরে প্রবেশ করিয়া মহারাজকে তদবস্থায় বসিয়া থাকিতে দেখিলেন। তাঁহার অন্তরের অভ্যন্তরে তুমুল আলোড়ন চলিলেও বাহিরে শান্ত সমাহিত ভাব। কিছুক্ষণ মৌনভাবে উদাস নেত্রে বসিয়া থাকিবার পর তিনি উক্ত সেবকটীকে দেখিয়া অত্যন্ত চিন্তিত ভাবে বলিলেন, "হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল, তাকিয়ে দেখি ছোট খাটটীর সামনে ঠাকুর দাঁড়িয়ে আছেন। কোন কথা বল্লেন না, কিছুই বুঝতে পারছিনে কেন তিনি চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে অন্তর্দ্ধান হলেন!" কিছুক্ষণ পরে প্রশান্ত গম্ভীর স্বরে তিনি বলিলেন, "এখন আমার মনে কোন বাসনা নেই। এমন কি তাঁর নাম করবারও আর বাসনা নেই—শুধু শরণাগত, শরণাগত।" মহারাজের আর কোন বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল না।

এই সময়ে একদিন প্রাতঃকালে রামলাল দাদা (শ্রীরামকৃষ্ণের ভ্রাতুষ্পুত্র স্বর্গীয় রামলাল চট্টোপাধ্যায় মহাশয়) বলরাম মন্দিরে মহারাজকে দর্শন করিতে উপনীত হইলেন। সরলচিত্ত রামলাল দাদাকে দেখিলেই ঠাকুরের কথা স্মরণ করিয়া তিনি আনন্দে বিভোর হইয়া পড়িতেন এবং তাঁহার সঙ্গে রঙ্গ-রসিকতার

তরঙ্গে ভাসিয়া যাইতেন। শ্রীরামকৃষ্ণের সরস কথাগুলি উভয়েরই স্মৃতিপটে উদিত হইত এবং দুইজনেই ঠাকুরের হাবভাব ও গানগুলিকে মূলভিত্তি করিয়া রসালাপে মগ্ন হইয়া পড়িতেন। সে দৃশ্য যাঁহারা দেখিয়াছেন তাঁহারা জীবনে কখনও উহা বিস্মৃত হইতে পারিবেন না। তাঁহাদের আলাপ-আলোচনায় হাসির তুমুল লহর বহিয়া যাইত এবং আনন্দের ফোয়ারা ছুটিত। সেইদিন মহারাজ রামলাল দাদাকে বলিলেন, "দাদা! আজ সন্ধ্যার পর ঢপওয়ালী সেজো, ঠাকুরের সময়কার গান সকলকে শুনাতে হবে!" রামলাল দাদা লজ্জিতভাবে বলিলেন, "মহারাজ, এ তো মঠ নয়, গৃহস্থের বাড়ী—সবাই কি মনে করবে? বিশেষ বাড়ীতে মেয়েরা আছেন।" মহারাজ তদুত্তরে বলিলেন, "তা হোক, কি আর মনে করবে।" মহারাজের কথায় রামলাল দাদা আপত্তি জানাইয়া বলিলেন, "না, না, মহারাজ, বাড়ীর লোকে আমাকে কি মনে করবে বলুন দেখি?" কিন্তু তাঁহার কোনও আপত্তি টিকিল না। অগত্যা রামলাল দাদা বলিলেন, "মহারাজের যো হুকুম।" মহারাজের কথায় এমনি তেজ ও ভঙ্গী ছিল যে গভীর শ্রদ্ধাসম্পন্ন রামলাল দাদা ঠিক তাঁহার হস্তে যেন যন্ত্রবৎ চালিত হইতেন, তাঁহার নিজের নিজত্ব থাকিত না। শুধু রামলাল দাদা নহেন, অনেকেই ঠিক পুতুল-নাচের পুতুলের মত হইয়া যাইত। সন্ধ্যাকালে সেবক-শিষ্যদের ডাকিয়া মহারাজ বলিলেন, "যাও, রামলাল দাদাকে সঙ্গে নিয়ে সাজিয়ে দাও।" সেবকেরাও সরল রামলাল দাদাকে লইয়া আনন্দ করিতেন এবং তিনিও সেবকদের সঙ্গে মিশিয়া বালকের

মত রঙ্গ-তামাসা করিয়া অঙ্গভঙ্গী সহকারে গান ও নৃত্য করিতেন। ঠাকুর যে সকল প্রাচীন গীত গাহিতেন, রামলাল দাদাও সেই গানগুলি অনুরূপ ভাব-ভঙ্গীসহ গাহিতে ভালবাসিতেন। তাঁহারা বলরাম মন্দিরের অন্তঃপুর হইতে সাড়ী ও অলঙ্কারাদি চাহিয়া তাঁহাকে সাজাইলেন, কিন্তু অলঙ্কারগুলি পরাইতে তাঁহাদের বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হইল। মেয়েদের গহনা কিছুতেই সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কঠিন অঙ্গে পরাইতে পারা গেল না। অবশেষে অন্তঃপুরবাসিনীরা তাহা শুনিয়া তাঁহাদের প্রাচীন খিলদেওয়া গহনাগুলি তথায় পাঠাইয়া দিলেন। সেগুলি দিয়া সহজে রামলাল দাদার সর্ব্বাঙ্গ সাজান হইল। রামলাল দাদা স্ত্রী-বেশে অলঙ্কার পরিয়া ভূষিত হইলে সেবকেরা যথাসময়ে মহারাজকে তাহা জানাইলে মহারাজ মৃদুহাস্যে বলরাম মন্দিরের বৃহৎ হলঘরে তাঁহার নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইলেন, চারিদিকে সমাগত ভক্ত ও শিষ্যসেবকেরা দর্শকরূপে বসিল। রামলাল দাদা হলঘরে প্রবেশ করিলে সকলেই উৎফুল্ল হইয়া সে দৃশ্য দেখিল। রামলাল দাদা মহারাজের সম্মুখে ঢপ কীর্ত্তনের সুরে হাত নাড়িয়া নাচিতে নাচিতে গাহিলেন—

"একবার ব্রজে চল ব্রজেশ্বর দিনেক দুয়ের মত
(ও তোর) মন মানে তো থাক্‌বি সেথা নইলে আস্‌বি দ্রুত।
আগে ছিল এক হেঁটো জল,
এখন যমুনা অতল—
সাঁতার দিতে হবে।
নৈলে যমুনার তীরে বসে ব্রজ নিরখিবে।

যদি বল ব্রজে যেতে চরণেতে ধূলা লাগিবে।
(বল্‌লেও বল্‌তে পার আগে রাখাল ছিলে এখন রাজা হয়েছ)
না হয় ব্রজগোপীর নয়ননীরে চরণ পাখালিবে॥”

“আগে রাখাল ছিলে এখন রাজা হয়েছ” এই আখর দিয়া যখন মহারাজের প্রতি ভঙ্গী করিয়া রামলাল দাদা ভাবভরে গাহিলেন, তখন মহারাজের সহাস্য মুখ সহসা গম্ভীর হইল। তিনি যেন কোন্ অতীন্দ্রিয় ভাব-রাজ্যে চলিয়া গেলেন। তাঁহার ভাবদর্শনে দর্শকেরাও নির্ব্বাক নিস্তব্ধভাবে অবস্থান করিলেন। চারিদিকে সহসা কেমন যেন এক অপূর্ব্ব ভাবতরঙ্গের সৃষ্টি হইল।

মেয়েরা অন্তঃপুর হইতে পার্শ্ববর্ত্তী ঘর দিয়া বারান্দায় গোপনে অন্তরালে দাঁড়াইয়া রামলাল দাদার স্ত্রীবেশে নৃত্যগীত দেখিতে আসিয়াছিলেন। তাঁহারাও সেই গাম্ভীর্য্যপূর্ণ আধ্যাত্মিক আব-হাওয়ায় নিস্পন্দ নির্ব্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। হাস্যকৌতুক, আমোদ-প্রমোদের লেশমাত্র নাই, শুধু একটা নিস্তব্ধ গাম্ভীর্য্যে হলঘরটী পরিপূর্ণ। কেবল গায়ক রামলাল দাদা আত্মহারা হইয়া বিহ্বলভাবে নাচিয়া নাচিয়া আখর দিয়া গাহিতেছেন—“আগে রাখাল ছিলে এখন রাজা হয়েছ!” আবার তিনি হাত নাড়িয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া গাহিলেন,

“এখন ব্রজে চল ব্রজেশ্বর দিনেক দুয়ের মত।”

মহারাজ মৌন, নিস্পন্দ ও গম্ভীর। সহসা তাঁহার একি অদ্ভুত পরিবর্ত্তন! ব্রজধামের রাখাল কি তাঁহার স্বরূপসত্তার আভাস পাইয়া অতীন্দ্রিয় ভাবরাজ্যে চলিয়া গিয়াছেন? ব্রজের রাখাল কি এখন “রাজা” হইয়া ব্রজধাম ভুলিয়াছেন? ‘এখন

ব্রজে চল ব্রজেশ্বর' কি সেই ব্রজধামে আহ্বান? ঠাকুর কি এই জন্যই নীরবে দর্শন দিয়া অদৃশ্য হইয়াছিলেন? আজ কোন্ অদৃশ্য মহাশক্তির বলে রামলাল দাদার কণ্ঠে সেই দিব্য আহ্বানের স্বর উত্থিত হইয়াছে? রাখালের কি ব্রজধামে ব্রজের খেলা মনে পড়িতেছে? ইহাই কি হাস্যমুখরিত রঙ্গ-তামাসার পরিবর্ত্তে এই গম্ভীর মৌনভাবের কারণ? ব্রজপুর—কতদূর? অনন্তের কোন্ অজানিত প্রদেশে? কোন্ অপ্রাকৃত অতীন্দ্রিয় ভাবরাজ্যে? ব্রজের খেলা—নিত্যলীলা, লীলাকমলে কৃষ্ণরূপে কি তাহার বিকাশ? কৃষ্ণসত্তায় কৃষ্ণসহচরেরা কি সেই লীলারস সম্ভোগ করিয়া—আনন্দে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নৃত্য করিয়া বেড়ান? নিত্য-লীলার স্বরূপ-সত্তা জাগাইতে ইহা কি সেই ব্রজের অস্ফুট আহ্বান?

কয়েক দিন পরে জনৈক গৃহস্থ ভক্তের অনুরোধে মহারাজ ঠাকুর-স্থাপনা ও উৎসবোপলক্ষে ভক্ত ও শিষ্য সেবকাদি লইয়া তাঁহার গৃহে তিন দিন বাস করিয়াছিলেন। তিন দিন পরে বলরাম মন্দিরে আসিয়া আঁটপুরে স্কুলের ভিত্তিস্থাপনা ও তথায় শিবরাত্রি উদ্‌যাপন করিয়া বেলুড় মঠে ফিরিয়া আসিলেন। বেলুড় মঠে আনন্দে দিনগুলি কাটিতে লাগিল। মহাসমারোহে শ্রীশ্রীঠাকুরের তিথিপূজা ও সাধারণ মহোৎসব হইয়া গেল। অতঃপর তাঁহার কলিকাতায় বলরাম মন্দিরে যাইবার প্রস্তাব উঠিল। যেদিন কলিকাতায় গমন করিবেন সেই দিন প্রাতঃকালে তিনি মঠের সাধু-ব্রহ্মচারীদিগকে ডাকিয়া বলিলেন, "স্বামিজীর সংকল্প ছিল এখানে ঠাকুরের শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হয়। মহাপুরুষের

সেই সংকল্প কার্য্যে পরিণত হওয়া প্রয়োজন।” এই বলিয়া তিনি তাঁহার জনৈক শিষ্যকে স্বামিজীর সংকল্পানুযায়ী মন্দিরের যে নক্সাটী (plan) প্রস্তুত হইয়া মঠে রক্ষিত আছে তাহা আনিতে বলিলেন। প্ল্যানটী আনা হইলে মহারাজ তাহা মঠের সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী প্রভৃতির সম্মুখে কিছুক্ষণ ধরিয়া নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। মহারাজের তৎকালীন ভাব দেখিয়া বোধ হইল যেন এই একটী মহৎ কার্য্য অসমাপ্ত রহিয়াছে। তাঁহার কথায় ও ভাবভঙ্গীতে উপস্থিত সকলের হৃদয়ে একটা দৃঢ় ধারণা জন্মিল যে স্বামিজীর সংকল্পিত মন্দির-নির্ম্মাণ যেন রামকৃষ্ণ-সঙ্ঘের বিশেষ দায়স্বরূপ, ইহার নির্ম্মাণ-বিষয়ে সঙ্ঘের বিশেষ লক্ষ্য থাকা কর্ত্তব্য।

মহারাজ মঠ হইতে বিদায়ের দিনে তাই সর্ব্বপ্রথমে মঠস্থ সকলের নিকট মন্দির-নির্ম্মাণের প্রসঙ্গ তুলিলেন। ইহা যেন অলক্ষ্যে তাঁহার কার্য্যসমাপ্তির ইঙ্গিত। সেইদিন প্রাতঃকালেই তিনি বেলুড়মঠ হইতে বলরাম মন্দিরে গমন করিলেন।

নিয়তিচক্রের বিধান অপূর্ব্ব—লীলাময়ের লীলা অবোধ্য। ভক্তদের লইয়া মহারাজ বলরাম মন্দিরে আনন্দ করিতে লাগিলেন। কিন্তু দুই দিন পরে অর্থাৎ ১০ই চৈত্র, ২৪শে মার্চ্চ প্রাতঃকালে অকস্মাৎ তিনি উদরাময় রোগে আক্রান্ত হইলেন। শিষ্য-সেবকেরা অমনি ব্যস্ত হইয়া ডাক্তার ডাকিয়া আনিলেন। সংবাদ পাইবামাত্র ডাক্তার কাঞ্জিলাল, বিপিন বিহারী ঘোষ ও দুর্গাপদ ঘোষ চলিয়া আসিলেন। লক্ষণাদি দেখিয়া তিন জনেই বিসূচিকা বলিয়া নির্ণয় করিলেন এবং তাঁহাদের

পরামর্শমত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হইল। ডাঃ কাঞ্জিলালের ঔষধে বিশেষ কোন ফল না হওয়ায় সুপ্রসিদ্ধ হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ডাক্তার চন্দ্রশেখর কালীকে আনা হইল। তাঁহার চিকিৎসাধীনে ক্রমশঃ রোগের উপশম হওয়ায় সকলেই আনন্দিত হইলেন এবং সকলেরই হৃদয় আশায় ভরিয়া উঠিল। এইভাবে আট দিন অতিবাহিত হইলে ডাক্তারগণের উপদেশানুযায়ী অন্নপথ্যের ব্যবস্থা হইল। অন্নপথ্য গ্রহণ করিবার পরদিন মহারাজ ছোট ঘর হইতে বড় হলঘরে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। এতদিন সিঁড়ি দিয়া দোতালায় উঠিবার দক্ষিণ দিকের ছোট ঘরে মহারাজ বাস করিতেছিলেন। অসহ্য রোগযন্ত্রণার মধ্যে তিনি কখন আধ্যাত্মিক তত্ত্বের চরম উপলব্ধির কথা বলিয়া আবার কখনও সদানন্দ বালকের মত হাস্য-কৌতুক করিয়া সর্ব্বদাই আনন্দসাগরে মগ্ন থাকিতেন। রোগযন্ত্রণা যেন তাঁহার অন্তস্তল স্পর্শ করিতে পারিত না।

বড় হলঘরে তাঁহাকে বহিয়া লইয়া যাইবার কালে তিনি হাসিতে হাসিতে শিষ্যসেবকদের বলিলেন, "ওরে! মরা হাতী লাখ টাকা।" তাঁহার সেই রহস্যপূর্ণ উক্তি শুনিয়া উপস্থিত সকলেই আনন্দে উচ্চরোলে হাসিয়া উঠিলেন। এইভাবে অন্নপথ্য করিবার পর দুইদিন কাটিয়া গেল। সাধুভক্ত সকলেরই মন হইতে উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা দূরীভূত হইয়া গেল এবং সকলেরই হৃদয় তাঁহার আরোগ্য-আশায় উৎফুল্ল হইল। কিন্তু যেমন ক্ষণপ্রভার চকিত দীপ্তি নিমেষের জন্য চক্ষু ঝলসিত করিয়া পুনরায় ঘন তমসায় বিলীন হয়, তেমনি সাধু-ভক্ত সকলেরই আশা, ভরসা

ও আনন্দ অচিরে গভীর উৎকণ্ঠায় পরিণত হইল। অকস্মাৎ বহুমূত্রের উপসর্গ দেখা দিল। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে অতি সামান্য আকারে বহুমূত্রের সূচনা দেখা গিয়াছিল বটে, কিন্তু পরে উহার চিহ্নমাত্রও ছিল না। রোগ ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া ভীষণ আকার ধারণ করিল। দিন দিন শরীর ক্ষয় হইতে লাগিল এবং তৎসঙ্গে অসহ্য শারীরিক যন্ত্রণা ও বিবিধ উপদ্রব আসিয়া উপস্থিত হইল। একে বিসূচিকা রোগের আক্রমণে শরীর অত্যন্ত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল, তাহার উপর নিদারুণ রোগযন্ত্রণা দেখিয়া ডাক্তারেরা প্রমাদ গণিলেন। ইতিমধ্যে শ্রীযুত বিজয় সিংহ এবং ডাক্তার নীলরতন সরকার মহাশয় আসিয়া দেখিয়া গেলেন। মহারাজ বালকের ন্যায় ডাক্তার সরকারকে বলিয়াছিলেন, "আমায় ভাল করে দিন—আমি ভাল হব।" আবার কখন তিনি বলিতেন, "আমাকে ভুবনেশ্বরে নিয়ে চল—সেখানকার কুয়োর জল খেলে ভাল হয়ে যাব।" সকলেই অবশেষে তাঁহার আরোগ্য সম্বন্ধে হতাশ হইয়া পড়িলেন। সাধু-ভক্ত ও শিষ্যদের হৃদয়েও দারুণ নৈরাশ্য আসিয়া উপস্থিত হইল। অশ্রুপূর্ণ নয়নে ও বিষণ্ণ চিত্তে তাঁহাদের দিন কাটিতে লাগিল। নিরাশার কালিমায় তাঁহাদের মুখমণ্ডল মলিন হইয়া গেল। গুরুভ্রাতা সারদানন্দ হতাশ হৃদয়ে বুক বাঁধিয়া বর্ত্তমান চিকিৎসার পরিবর্ত্তন করাইয়া কবিরাজী চিকিৎসার প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন। মহারাজ তাহা শুনিয়া রসপূর্ণ বাক্যে বলিলেন, "হাকিমীটা আর বাকী থাকে কেন?" যাহা হউক সারদানন্দের প্রস্তাব উপস্থিত সকলেই অনুমোদন করিলেন। কলিকাতার সুবিখ্যাত কবিরাজ শ্যামাদাস বাচস্পতি

মহাশয় চিকিৎসা করিবার জন্য আসিলেন। তিনি পুনরায় আসিয়া মহারাজের হাত দেখিবার জন্য তাঁহাকে ডাকিলেন। মহারাজ তখন নিমীলিত নয়নে ছিলেন। কবিরাজ মহাশয়ের ডাক শুনিয়া তিনি তাঁহার দিকে তাকাইলেন এবং শ্যামাদাস কবিরাজ মহাশয়ের বিভূতিলিপ্ত ললাট দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন, "কবিরাজ মশায়, কপালে যাঁর চিহ্ন ধারণ করেছেন, সেই শিবই সত্য— আর সব মিথ্যা।" ইহা বলিয়া মহারাজ একেবারে নীরব হইয়া রহিলেন। তাঁহার সেই তেজোপূর্ণ মধুর গম্ভীর বাণী কবিরাজ মহাশয়ের অন্তর স্পর্শ করিল তিনি আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় তিনি নীরবে স্থিরচিত্তে বসিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ অতীত হইলে কবিরাজ মহাশয় নাড়ী পরীক্ষা করিয়া উঠিয়া আসিলেন এবং ঔষধাদির ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। দারুণ উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, অশান্তি ও আতঙ্কের মধ্যে ভক্ত ও শিষ্যসেবকদের কাল কাটিয়া যাইতেছিল। এইদিন গাত্রদাহ ও জলতৃষ্ণা প্রাতঃকাল হইতে খুব বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

২৫শে চৈত্র শনিবার বেলা দ্বিপ্রহরে বলরাম বাবুর বাড়ীর মেয়েদের কাঁদিতে দেখিয়া মহারাজ অভয় দিয়া বলিলেন, "তোমাদের ভয় কি? আমি আশীর্ব্বাদ করছি।" সন্ধ্যার পর ডাক্তার দুর্গাপদবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "মহারাজ, আপনার কি কষ্ট হচ্ছে?" মহারাজ উত্তরে বলিলেন, "সহনং সর্ব্বদুঃখানামপ্রতীকার-পূর্ব্বকম্, আমার অবস্থা এখন এইরূপ, তোমরা এইটী ধারণা কর।" অকস্মাৎ তাঁহার সমগ্র মুখমণ্ডল যেন এক দিব্য জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। তাঁহার অসহ্য রোগযন্ত্রণা কোথায় যেন

বিলীন হইয়া গেল। দেখিতে দেখিতে সহসা বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া তিনি নিস্তব্ধভাবে ধ্যানমগ্ন হইয়া পড়িলেন। পরে রাত্রি প্রায় নয়টার সময়ে তিনি দক্ষিণপার্শ্বস্থিত জনৈক সেবকের গায়ে হাত দিয়া ত্রস্তে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে রে?" রুদ্ধকণ্ঠে সেবক বলিলেন, "আমি"। উত্তর শুনিয়া আদরে ও স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে তিনি সেবককে ডাকিয়া বলিলেন, "গণেশ, আমার সিদ্ধিদাতা গণেশ। গণেশের পূজা করবি। ভয় কি বাবা? আমার সেবা করছিস—আমি আশীর্ব্বাদ করছি ভগবানে ডুবে যা। তোর ব্রহ্মজ্ঞান হবে, আমি বলছি—তোর ব্রহ্মজ্ঞান হবে।" এই কথা বলিতে বলিতে সেই প্রেমপূর্ণ মহাপুরুষের কণ্ঠস্বর যেন ক্রমশঃই রুদ্ধ হইয়া আসিল। "বাবা, আর পাচ্ছি না", বলিয়াও তিনি সাধু, ভক্ত ও শিষ্যদিগকে নিকটে ডাকিয়া অতি স্নেহ-কোমলকণ্ঠে তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ করিলেন। সকলের শুষ্ক ও মলিন মুখ দেখিয়া মহারাজ তাঁহাদিগকে অভয় দিয়া বলিলেন, "ভয় কি বাবা, তোমাদের?" স্নেহবিগলিত কণ্ঠে আবার তাঁহাদের কখনও কাহাকে ডাকিয়া তিনি বলিলেন, "আমার বাবারা।" পুনরায় কাহাকেও ডাকিয়া তিনি সুধাকণ্ঠে বলিলেন, "তুই যাবি কোথায়? আমি তোকে ধরে রাখবো।" এইরূপে শিষ্য-সন্তানদের মহারাজ সস্নেহে বলিলেন, "তোরা ভগবানকে ভুলিস নি, তোদের কল্যাণ হবে।" আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে তিনি নীরব হইয়া রহিলেন। তাঁহার অর্দ্ধনিমীলিত নয়নদ্বয় যেন কোন্ অন্তরতম দিব্যালোকে নিপতিত হইল। কিয়ৎকাল এইভাবে অতিবাহিত হইলে আবার তিনি অতি কোমল ও মধুরস্বরে ধীরে ধীরে বলিয়া উঠিলেন,—"ব্রহ্মসমুদ্রে—বিশ্বাসের

বটপত্রে—ভেসে ভেসে যাচ্ছি। বিবেক—আমার বিবেক! বিবেকানন্দ! বাবুরামদা, বাবুরামদা! যোগেন—যোগেন!" একে একে রামকৃষ্ণলোকে গত গুরু-ভ্রাতাগণের দিব্যদর্শন সহ তাঁহার মন কোন্ এক অপরূপ অজ্ঞাতরাজ্যে চলিয়া গেল।

ক্রমশঃ তাঁহার মন যেন কোন্ যাদুদণ্ডস্পর্শে অতীন্দ্রিয় রাজ্যের উচ্চ হইতে উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতে লাগিল। যে রাজ্যে তিনি প্রতিনিয়ত আত্মস্থ হইয়া সদানন্দে গোপনে বিচরণ করিতেন—সে গুপ্ত আবরণ যেন খুলিয়া পড়িল। আত্মানুভূতি যেন নানা ভাবের ইঙ্গিতে ও বাণীর আকারে আত্মপ্রকাশ করিতে প্রয়াস পাইল। তিনি আত্মহারা হইয়া অন্তরের নিভৃত কোণে যাহা দর্শন করিতেছিলেন, বিমুগ্ধচিত্তে আপন ভাষায় ব্যক্ত করিয়া বলিলেন, "আহা-হা! ব্রহ্মসমুদ্র! ওঁ পরব্রহ্মণে নমঃ; পরমাত্মনে নমঃ।" সেই আত্মার মহিমায় পরিব্যাপ্ত হইয়া গূঢ় অনুভূতির কথা তিনি অনর্গলভাবে বলিয়া যাইতেছেন। ইহা দেখিয়া জনৈক সেবক ভাবিলেন বুঝি এতগুলি কথা অবিশ্রাম বলাতে মহারাজের গলা শুষ্ক হইয়াছে, সুতরাং একটু লেমনেড খাওয়াইলে ভাল হইবে। ইহা মনে করিয়া তিনি লেমনেড পান করাইতে প্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন, "একটু লেমনেড দিই?" মহারাজ ধীরে ধীরে তাঁহাকে বলিলেন, "রোস, আগেই বস্তু ঠিক করে নি, মন যে ব্রহ্মলোক থেকে নামতে চায় না। দে, ব্রহ্মে লেমনেড ঢেলে দে।" উপস্থিত ভক্ত ও সাধুবৃন্দ মহারাজের এই অলৌকিক বাণী উৎকর্ণ হইয়া শুনিতেছিলেন, পূজ্যপাদ শিবানন্দ ও অভেদানন্দ শোকার্ত্ত, মৌনভাবে তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে

সারদানন্দকে তথায় আসিবার জন্য সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল— তিনি শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ী হইতে এই সময়ে আসিয়া উপনীত হইলেন। তিনি প্রাতঃকাল হইতে সর্ব্বক্ষণ বলরাম মন্দিরে থাকিতেন, শুধু শয়ন করিতে শ্রীশ্রীমায়ের বাড়ীতে যাইতেন। তাঁহাকে দেখিয়া মহারাজ বলিলেন, "ভাই শরৎ, আমার যে ব্রহ্মবেদান্ত গুলিয়ে যাচ্ছে। ঠাকুর সত্য, তাঁর লীলাও সত্য।" মহারাজের কথা শুনিয়া সারদানন্দ বলিলেন, "তোমার আবার গোল কি মহারাজ? ঠাকুর ত তোমায় সব করে দিয়েছেন।"

অনন্তর মহারাজ কিছুক্ষণ স্থিরভাব ধারণ করিলেন। তাঁহার আনন্দোদ্ভাসিত উজ্জ্বল বদনমণ্ডল এবং অপলক নয়নযুগল দেখিয়া মনে হইতেছিল তিনি যেন সুগভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইয়া বিভোরভাবে ব্রহ্মানন্দরস আস্বাদন করিতেছেন। তাঁহার সেই শান্ত সমাহিত নিস্পন্দ আনন্দঘন জ্যোতিপ্রভায় এবং সেই ধ্যানমগ্ন অলৌকিক ঘনীভূত ভাবপ্রবাহে, চতুর্দ্দিকে সমুপস্থিত সকলের প্রাণ মন যেন স্থির, গম্ভীর ও শান্তভাব ধারণ করিল, সকলেই নির্ব্বাক্‌ভাবে স্থির দৃষ্টিতে অবস্থিত, প্রকৃতির কোলাহলও যেন প্রশান্ত ও মৌন। মুখর চপল পৃথিবী যেন মূক ও গম্ভীর। মহারাজের ধ্যান যেন গভীর হইতে গভীরতর হইল। সেই অপূর্ব্ব ধ্যানাবস্থা এমন একটি ভাবতরঙ্গের সৃষ্টি করিল যে, তাহার প্রবাহে উপস্থিত সকলেরই মন যেন অতীন্দ্রিয় ভাবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। সকলেই যেন সমুদায় জাগতিক জ্ঞান হারাইয়া এক অপূর্ব্ব দিব্য আনন্দময় ভাবলোকে বিচরণ করিতে লাগিল। কাহারও আর বাহ্য চেতনার সাড়া নাই। সেই শান্ত

স্নিগ্ধ গভীর নিস্তব্ধতার মধ্যে সহসা মহারাজের সুমধুর কণ্ঠে অলৌকিক দিব্যবাণী ফুটিয়া উঠিল,—"এই যে পূর্ণচন্দ্র! রামকৃষ্ণ!—রামকৃষ্ণের কৃষ্ণটী চাই। আমি ব্রজের রাখাল,—দে দে, আমায় ঘুঙুর পরিয়ে দে,—আমি কৃষ্ণের হাত ধরে নাচ্‌ব। ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্ ঝুম্। কৃষ্ণ এসেছ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণ। তোরা দেখতে পাচ্ছিস নি? তোদের চোখ নেই! আহা-হা, কি সুন্দর! আমার কৃষ্ণ—কমলে কৃষ্ণ, ব্রজের কৃষ্ণ, এ কষ্টের কৃষ্ণ নয়। এবারে খেলা শেষ হল। দেখ দেখ—একটী কচি ছেলে আমার গায়ে হাত বুলুচ্ছে আর বলছে আয়, চলে আয়।"

মহারাজ নীরব হইলেন। ইহা কি স্ব-স্বরূপের স্মৃতি, না স্ব-স্বরূপে স্থিতি? কে বলিবে? শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবচক্ষে রাখালের এই স্বরূপসত্তাই দর্শন করিয়াছিলেন। কমলে কৃষ্ণ, কৃষ্ণের হাত ধরিয়া নূপুরপায়ে নৃত্যরত রাখাল! ব্রজলীলাও নিত্য, ব্রজের রাখালও নিত্য।

তৎপরদিন রবিবারও কাটিয়া গেল। সোমবার ১০ই এপ্রিল, ২৭শে চৈত্র মদন ত্রয়োদশীর দিন চতুর্দ্দশী তিথির প্রারম্ভে রাত্রি আটটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে শ্রীরামকৃষ্ণের "রাখালরাজ" নিত্য-লীলায় প্রবেশ করিলেন। পরদিন সেই শিবময় দেহ বেলুড় মঠে আনিয়া স্রক্‌চন্দনসহ প্রজ্বলিত পবিত্র হোমাগ্নিতে আহুতি দেওয়া হইল।

ওঁ শান্তি—শান্তিঃ—শান্তিঃ!

STATE